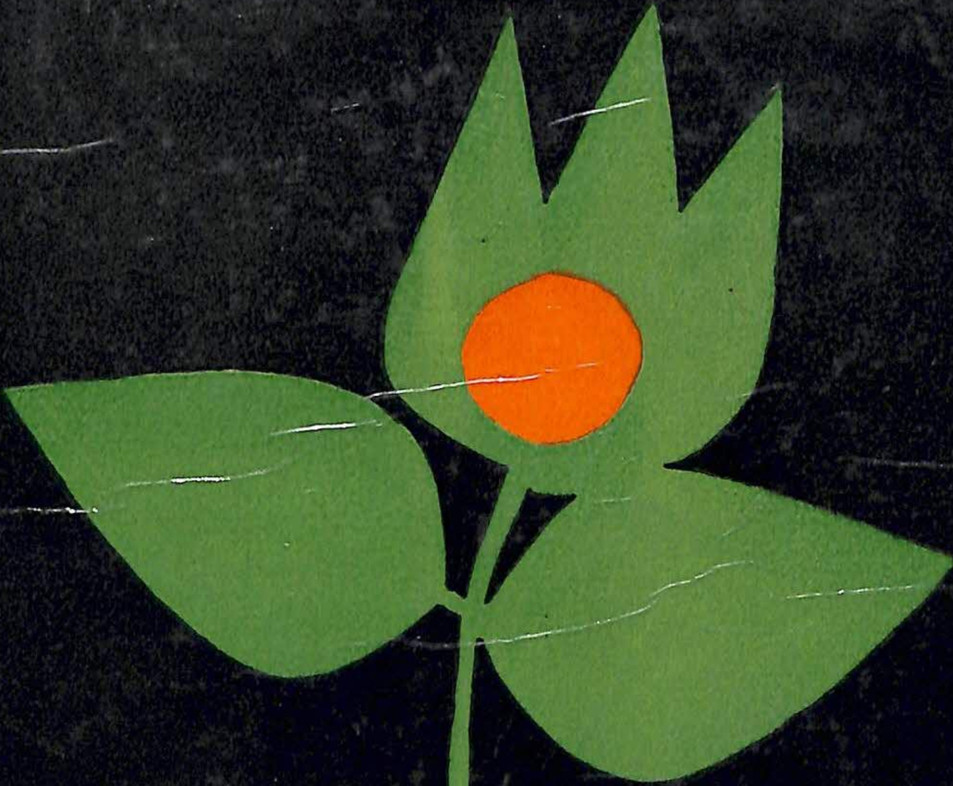
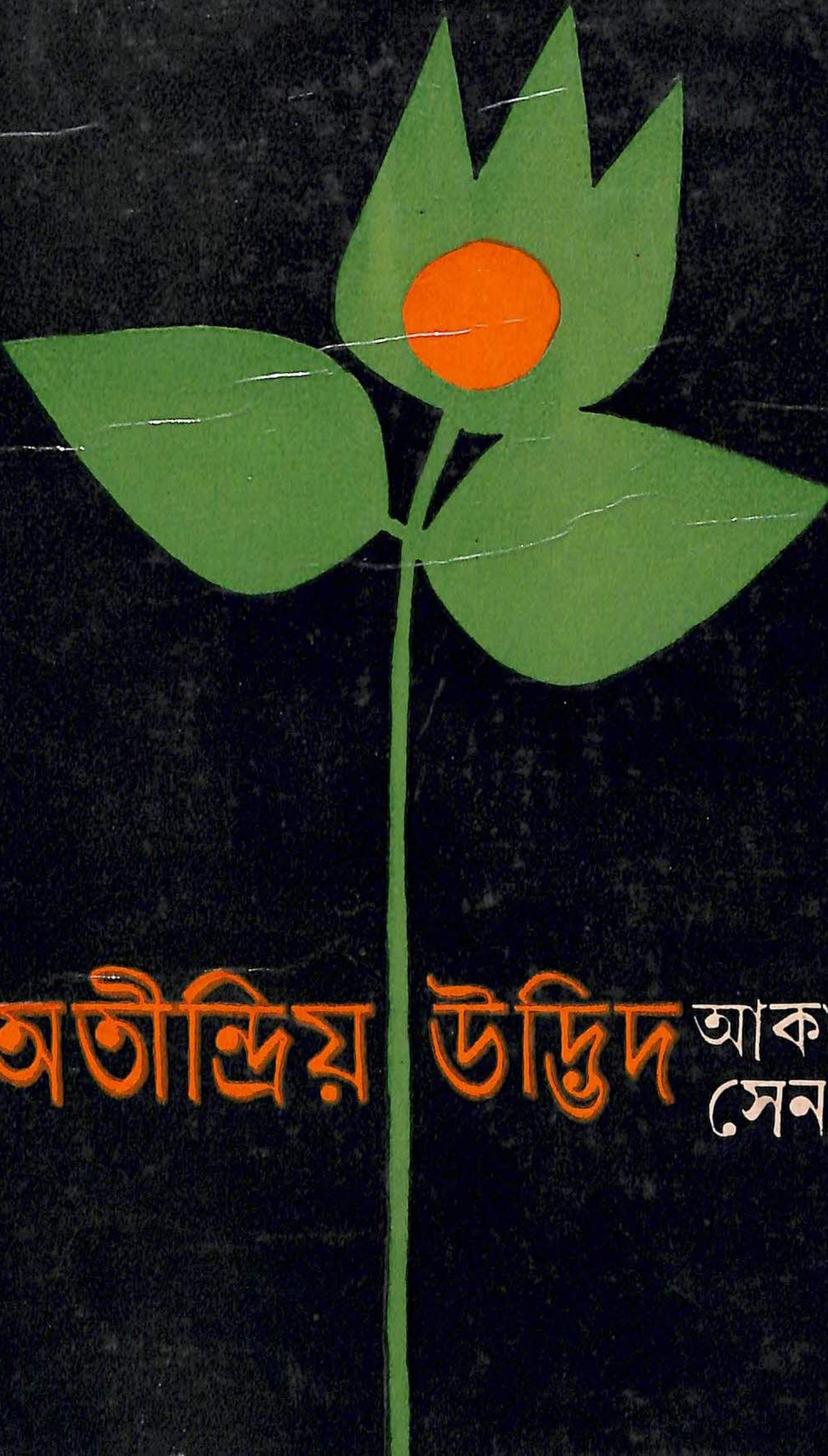


অতীন্দ্রিয় উদ্ভিদ

আকাশ সেন



অতীন্দ্রিয় উদ্ভিদ

আকাশ সেন

আকাশ সেন

অতীন্দ্রিয় উদ্ভিদ



গ্রন্থ প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

প্রকাশক ঃ শ্রীময়ূখ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ অদ্রীশ বর্ধন, দীপ্তি প্রিণ্টার্স, ৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি

দাম ঃ আঠারো টাকা

সূচীপত্র

গাছেরা কি কথা কইতে পারে? মানুষের কথা বুঝতে পারে? মানুষের মনের ভাব টের পায়? মহাকাশের সংকেত অদ্ভুত ছন্দোবদ্ধ শিস ধ্বনির মাধ্যমে মানুষের কানে পৌঁছে দিতে পারে? সেই শিস শুনে মনে হয় কি ধীমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলছে? জীবন্ত যে কোনো কোষের মৃত্যুতে, বিশেষ করে মানুষের কোষের মৃত্যুতে, গাছেরা কি শিউরে ওঠে? কষ্ট পায়? মানুষের কষ্টে গাছেরা কি দুঃখ পায়? বকলে গাছেরা কি মুষড়ে পড়ে? আদর করলে আহ্লাদে গলে যায়? অনেক দূরে থাকলেও বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে গাছেদের কি যোগাযোগ থাকে? দূর থেকে গাছেদের দিয়ে ঘরের আলো নেভানো, জ্বালানো, মোটর গাড়ী স্টার্ট দেওয়া, গ্যারেজ বন্ধ করা, এরোপ্লেন ওড়ানো এবং নামানো কি সম্ভব? মহাজাগতিক শক্তি গাছেরা কি সঞ্চয় করে? সেই শক্তি দিয়ে মানুষদের শক্তিমান করে তোলে? পাঁচটা মাত্র অনুভূতি-ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ যা জানতে পারে না, যাদের খবর রাখে না—গাছেরা কি সে সব খবরই রাখে? সব জানে? যে শব্দ মানুষ কান দিয়ে শুনতে পায় না, গাছেরা কি সেই সব শব্দের তফাৎ ধরতে পারে? নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক কেন বলেছিলেন সিকি শতাব্দীর মধ্যে সিলিকন সোলার ব্যাটারীর চাইতেও একশ গুণ সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে গাছেদের কৃপায়? গাছেরা কি প্রকৃত অপরাধী সনাক্ত করতে পারে? কোথায় কোন্ খনিজ আছে, জানিয়ে দিতে পারে? গাছেরা কি গান বাজনা নাচ ভালবাসে? উগ্র সঙ্গীতে মারা যায়? ধ্রুপদী সংগীতে তাড়াতাড়ি বাড়ে? শুধু ভালবাসা দিয়ে মরু অঞ্চলেও স্বর্গোদ্যান কি সম্ভব? ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আর উদ্ভিদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কী? কোন্ ফোর্স ফিল্ড মানুষ আর উদ্ভিদকে এক তারে বেঁধে রেখে দিয়েছে? উদ্ভিদ আর মানবদেহের জ্যোতির্বলয় রহস্যটার সমাধান আজও হয়েছে কী? গাছেদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ব্যাখ্যা পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে এই ত্রিমাত্রিক জগতে সম্ভব নয়—আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দিয়ে চারমাত্রিক জগতেই সম্ভব—এ কথা বলেছিলেন কোন জাপানী বৈজ্ঞানিক? ক্যাকটাসের সঙ্গে কথা বলতেন কে? ক্যাকটাসকে গুণতে এবং যোগ করতে শিখিয়েছিলেন কে? গাছকে দিয়ে চিন্তা-পঠন কি সম্ভব? গাছেরা কি বিশ্বের প্রাচীনতম অ্যালকেমিস্ট? উদ্ভিদের প্রাণঃজ্যোতি কি দেখা যায়?

এমনি বহু অব্যাখ্যাত রহস্য নিয়ে, উদ্ভিদের বিচিত্র গুপ্ত জীবন নিয়ে, যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে—কল্পবিজ্ঞানের চাইতেও বিস্ময়কর অজস্র তথ্য ও তত্ত্ব, ঘটনা ও গবেষণার রোমাঞ্চকর, শ্বাসরোধী, অথচ কৌতূ-

হলোদ্দীপক এবং জ্ঞানগর্ভ সেইসব কাহিনী সমৃদ্ধ এই রচনাটি পাঠ করা প্রয়োজন ছোট বড় প্রত্যেকেরই। কারণ গাছেরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, আমাদের আরো ভাল চায় তারা—কিন্তু তাদের অনেক খবরই আমরা রাখি না।

অত্যাশ্চর্য এই রচনার মূল উৎস এবং প্রেরণা কিন্তু একটি বিশ্ববিখ্যাত এবং বহুবিক্রীত গ্রন্থ—'সিক্রেট অফ লাইফ'।

●

এই গ্রহে ফুলের চাইতে সুন্দর বস্তু আর নেই, যেমন নেই উদ্ভিদের চাইতে অত্যাবশ্যক কোনো জিনিস। মানব জীবনের প্রকৃত জরায়ু এই সবুজ তৃণাচ্ছাদিত বনভূমি যা আবৃত করে রেখেছে জননী ধরণীকে। সবুজ উদ্ভিদ না থাকলে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারব না, আহারও পাব না। প্রত্যেকটা বৃক্ষপত্রের তলদেশে দশলক্ষ ঠোঁট নিযুক্ত রয়েছে গোগ্রাসে কার্বনডায়অক্সাইড গিলে নিয়ে অক্সিজেন বার করে দেওয়ার কাজে। সব মিলিয়ে বৃক্ষপত্রের আড়াইকোটি বর্গমাইল উপরিভাগ প্রতিদিন এই অত্যাশ্চর্য ফোটোসিনথেসিস ক্রিয়ায় নিযুক্ত রয়েছে, মানুষ আর পশুর জন্যে অক্সিজেন আর আহার্য উৎপাদন করে চলেছে।

প্রতি বছর আমরা ৩৭৫ বীলিয়ন* টন খাদ্য গ্রহণ করছি। এর বেশীর ভাগটাই দিচ্ছে উদ্ভিদ, রোদ্দুরের সহায়তায় বাতাস আর মাটি থেকে বানিয়ে নিয়ে। বাকীটা আসছে পশুপাখীর উপাদান থেকে—যে উপাদান আবার সংগৃহীত হচ্ছে এই উদ্ভিদ থেকেই খাদ্য, পানীয়, মাদক দ্রব্য, ওষুধপত্র-ভেষজ—যা কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, যথাযোগ্য ব্যবহারে মানুষকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখে—তার সবই আসছে ফোটোসিনথেসিস-য়ের সুমিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে।

আমাদের যাবতীয় স্টার্চ,[১] ফ্যাট[২] তৈল, মোম আর সেলুলোজ[৩] উৎপাদন

*বীলিয়ন—ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে মহাপদ্ম (১,০০০,০০০,০০০,০০০), ফ্রান্সে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকোটি (১,০০০,০০০,০০০)

১। স্টার্চ—উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার পদার্থ; রাসায়নিক হিসেবে বিশেষ এক শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট। সাদা, স্বাদগন্ধহীন পদার্থ।

২। ফ্যাট—জান্তব চর্বি; বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের (জৈব অ্যাসিড) বিভিন্ন শ্রেণীর গ্লিসারাইড যৌগিকে গঠিত এক শ্রেণীর নমনীয় কঠিন জৈব পদার্থ।

৩। সেলুলোজ—যে জৈব পদার্থে উদ্ভিদের দেহ-কোষ গঠিত; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তুর রাসায়নিক উপাদান। কাগজ, প্লাস্টিক, রেয়ন, বিস্ফোরক পদার্থ, প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের প্রধান উপাদান।

করে চলেছে চিনি। দোলনা থেকে চিতা পর্যন্ত জীবনযাত্রায় মানুষ সেলুলোজের ওপর নির্ভর করেছে তার বাসস্থান, পরিচ্ছদ, জ্বালানি, তন্তু, ঝুড়ি, দড়িদড়া, বাদ্য যন্ত্র এবং দার্শনিক তত্ত্ব লেখার কাগজ পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর মূল উপাদান হিসেবে। uphof লিখিত 'ডিক্সনারী অফ ইকনমিক প্লান্টস্' গ্রন্থখানির ছ-শ পৃষ্ঠায় বহু উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়া আছে যাদের লাভজনক ব্যবহার করে আসছে মানুষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ভারতের বনৌষধি' আর একটি মূল্যবান সংকলন।

কৃষিচাষ যে জাতীয় সম্পদের ভিত—এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন অর্থনীতি-বিদরা।

উদ্ভিদের সৌন্দর্যবিজ্ঞান বিষয়ক কম্পনতরঙ্গ (যা কিনা আত্মিক তৃপ্তিদানে বিকল্পহীন) সম্বন্ধে সহজাত সচেনতা নিয়ে মানুষ সবচেয়ে সুখী হয়, আরাম বোধ করে উদ্ভিদের সঙ্গে সহাবস্থান করে। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু—ফুল ছাড়া চলে না। উৎসবে সাজসজ্জায়ও চাই ফুল। ভালবাসার নিদর্শনে ফুল আর উদ্ভিদ উপহার দিই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে, দিই সম্মানীয় অতিথি মান্যগণ্য ব্যক্তিকে, বাগান দিয়ে সাজাই বাড়ী, শহরের শোভা বাড়ায় উদ্যান, জাতির গৌরব বৃদ্ধি করে অরণ্য সম্পদ। ঘর সাজাতে গিয়েই রুচিবতী মহিলার প্রথম চাহিদাই থাকে ফুলদানি আর তাজা ফুল অথবা সুদৃশ্য উদ্ভিদ। স্বর্গ কি রকম দেখতে হয়, এ প্রশ্ন করলে বেশীর ভাগ মানুষই যে বর্ণনা দেবে, তার মধ্যে ফুলবাগানের স্থান থাকবেই, ফুলপরী আর পুষ্পকানন ছাড়া বাচ্ছাদের রূপকথা আজ পর্যন্ত কি লেখা হয়েছে ?

অ্যারিস্টটলের বদ্ধমূল ধারণা ছিল উদ্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু অনুভূতি নেই। মতবাদটা টিকে ছিল পুরো মধ্যযুগ পর্যন্ত, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গড়িয়েছিল তার রেশ। তারপরেই আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের Carl Von Linne ঘোষণা করলেন, মানুষ আর পশুর থেকে উদ্ভিদের পার্থক্য কেবল এক জায়গাতেই—উদ্ভিদ নড়াচড়া করতে পারে না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন নস্যাৎ করলেন এই মতবাদকেও। তিনি প্রমাণ করে দিলেন, প্রতিটি শুঁয়ো নিজে থেকেই নড়াচড়ার ক্ষমতা রাখে। ডারউইনের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যাক—'উদ্ভিদরা এই ক্ষমতা তখনই দেখায় যখন বোঝে ক্ষমতা দেখিয়ে তাদের নিজেদের লাভ আছে'।

আরও চাঞ্চল্যকর অনুমিতি হাজির করলেন ভিয়েনার প্রতিভাধর বায়োলজিস্ট র‍্যাওল ফ্র্যান্সি। এ ঘটনা ঘটল বিংশ শতাব্দীতে। সমসাময়িক প্রকৃতি প্রেমিক দার্শনিকদের চক্ষুস্থির হয়ে গেল বিচিত্র সেই মতবাদ শুনে। উদ্ভিদরা যেভাবে খুশী তাদের দেহ ঘোরাতে পারে। অধিকাংশ পশু আর মানুষ যেমন নয়নসুন্দর

ভঙ্গিমায় অঙ্গসঞ্চালন করে—প্রায় সেইরকম ভাবেই। কিন্তু আমরা তা টের পাই না শুধু একটা কারণে—মানুষের চাইতে অনেক শ্লথগতিতে উদ্ভিদরা দেহ এবং অঙ্গ সঞ্চালন করে বলে।

ফ্র্যান্সি বললেন, উদ্ভিদের শেকড় সন্ধানী গোয়েন্দার মতই মাটির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়, কুঁড়ি আর ছোট ছোট ডাল নির্দিষ্ট চক্রাকার পথে ঘুরে যায়, কোনো রকম পরিবর্তনের মধ্যে পড়লেই থির থির করে কেঁপে উঠে হেঁট হয় পাতা আর ফুল, জিজ্ঞাসুভাবে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে লতা-তন্তু বা শুঁয়োরা—ভৌতিক ভঙ্গিমায় বাহুবিস্তার করে চারপাশ অনুভব করার অভিলাষে। মানুষের এত কাণ্ড দেখার সময় নেই বলেই মনে করে উদ্ভিদ নিশ্চল আর অনুভূতিহীন।

জোহান উল্‌ফ্‌গ্যাং ফন গ্যেটে আর রুডল্‌ফ্‌ স্টাইনারের মত কবি আর দার্শনিকরাও উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণে সময় দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন বলেই আবিষ্কার করেছিলেন বিস্ময়কর সেই তথ্য—উদ্ভিদরা বিপরীত দিকে বাড়ে ; মাধ্যাকর্ষণের টানে যেন কিছুটা ঢুকে যায় মাটির মধ্যে, আর যেন লেভিটি অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত শক্তির আকর্ষণে ঠেলে ওঠে ওপর দিকে।

মূল শেকড় থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছোট পোকার মত শেকড়গুলোর সঙ্গে মস্তিষ্কের তুলনা করেছিলেন ডারউইন। মিহি সরু সুতো সহ এরা বিরামবিহীন-ভাবে নামতে থাকে মাটির মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে, নিবিড়ভাবে নিজেরাই ভিড় করে মাটির মধ্যে, মাটির আস্বাদ নিতে থাকে যাওয়ার পথে। শেকড়ের ডগায় ছোট্ট ফোঁপরা কক্ষের (যার মধ্যে খটাখাট করে কাঁপতে পারে স্টার্চের ছোট্ট গোলক) গতিপথ দেখেই মালুম হয় মাধ্যাকর্ষণের টান কোনদিকে।

ধরিত্রী যখন শুষ্ক, তখন ভিজে মাটির দিকে মোড় নেয় শেকড়, মাটির মধ্যে পোঁতা জলের পাইপের হদিশ বার করে নেয়, আল্‌ফাল্‌ফা উদ্ভিদের মত চল্লিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে গিয়ে এমন এনার্জি সঞ্চিত করে নিজেদের মধ্যে যে কংক্রিট ছেঁদা করেও পথ করে নিতে পারে। আজ পর্যন্ত কেউ একটা গাছের শেকড় কতগুলো হতে পারে, তা গুণে দেখেনি ; কিন্তু ছোট্ট একটা রাই গাছের (গম ও যব জাতীয় গাছ) সমস্ত শেকড় আর শাখা-শেকড় গুণে দেখা গেছে মোট সংখ্যা এককোটি তিরিশ লক্ষ—সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৩৮০ মাইল! এই একটিমাত্র রাই গাছের শাখা-শেকড়ে যত চুলের মত কেশ-শেকড় আছে, আন্দাজি অনুমান মতে তারা সংখ্যায় প্রায় চোদ্দ বীলিয়ন—মোট দৈর্ঘ্য ৬,৬০০ মাইল, যা কিনা সুমেরু থেকে কুমেরুর দৈর্ঘ্যের সমান বললেই চলে!

বিস্ময়ের শেষ এইখানেই নয়। বিশেষ ধরনের ছেঁদা করে মাটির ভেতরে ঢুকে যাওয়ার সময়ে কোষগুলো পাথরে, নুড়িতে আর বড়-দানা বালিতে ঘষটে ঘষটে যখন ক্ষয়ে যায়, তখন ঝটপট তাদের জায়গায় চলে আসে নতুন কোষ।

কিন্তু পুষ্টি আছে যেখানে, সেরকম জায়গায় পে'ছোলেই মারা যায় কোষগুলো। তাদের জায়গা নেয় এমন সব কোষ যাদের বিশেষ কায়দায় গঠন করা হয়েছে, খনিজ লবণকে জলে গুলে নিয়ে তা থেকে যে সব মৌলিক পদার্থ বেরোয়, তা সংগ্রহ করার জন্যে। মূল পুষ্টি কোষ থেকে কোষে পরিবাহিত হয়ে উঠে আসে উদ্ভিদের ওপর দিকে—যা কিনা প্রোটোপ্লাজমের একটাই একক (ইউনিট); প্রোটোপ্লাজম হল সেই জিনিস যাকে দেহ-জীবনের মূল উপাদান বলে গণ্য করা হয়; জিনিসটা জলের মত অথবা জিলেটিনের মত একরকম উপাদান।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, শেকড়টা এক ধরনের জলের পাম্প। জল এক্ষেত্রে কাজ করছে সার্বজনীন দ্রাবক হিসাবে; মৌলিক পদার্থদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে শেকড় থেকে পাতায়; সেখানে পে'ছে উবে গিয়ে ফের এসে পড়ছে ধরণীর বুকে মাটিতে—জীবন-ধারার সব কটা পর্যায়ের মাধ্যম হিসেবে তৎপর থাকার জন্যে। সারাদিনে একজন মানুষ যতটা জল ঘামের আকারে বার করে দেয় শরীর থেকে, একটা সাধারণ সূর্যমুখী ফুলগাছের পাতারা ঠিক ততখানি জল বার করে দেয় বাতাসে। তপ্ত দিবসে একটি মাত্র বার্চবৃক্ষ প্রায় চারশ কোয়ার্ট (আটশ পাঁইট বোতল) জল টেনে নিয়ে পাতার মধ্যে দিয়ে শীতল রাখে আবহাওয়া।

ফ্র্যান্সি বলেছেন, নড়াচড়া করতে পারে না এমন উদ্ভিদই নেই পৃথিবীতে; সবরকম বৃদ্ধিই হল ধারাবাহিক নড়াচড়া। সব সময়েই হে'ট হচ্ছে, ঘুরছে, থির থির করে কাঁপছে উদ্ভিদরা।

পলিপ একশ্রেণীর ক্ষুদ্রতম প্রাণী যার দেহযন্ত্র অতি নিম্নস্তরের। ফ্র্যান্সি বলেছেন, গ্রীষ্মের একটি তপ্ত দিবসে হাজার হাজার এই রকম পলিপ-সদৃশ বাহু শান্তিপূর্ণ নিকুঞ্জ থেকে কাঁপতে কাঁপতে সাগ্রহে এগিয়ে যায় নতুন অবলম্বনের প্রত্যাশায় যাতে ঠিক পেছনকার ভারী বোঁটা একটু আশ্রয় পায়। সাতষট্টি মিনিটে পুরো চক্কর ঘুরে আসতে পারে একটা শুঁয়ো। ঘুরতে ঘুরতে মনের মত অবলম্বন পেলেই বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে শুরু করে তাকে এবং একঘণ্টার মধ্যে এমন পাক খেয়ে যায় যে টেনে ছি'ড়ে আনতে বেগ পেতে হয়। এক পাক দিয়েই কর্ক-স্ক্রুর মত পাকে পাকে অবলম্বনটাকে জড়িয়ে ধরতে থাকে শুঁয়োটা এবং লতাগাছটাকে উঠে আসতে সাহায্য করে।

যে লতানে উদ্ভিদের খুঁটির দরকার হয়, সে সবচেয়ে কাছের অবলম্বনের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় একটু একটু করে। অবলম্বনটাকে সরিয়ে রাখলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লতানে উদ্ভিদটাও মোড় ঘুরে দিক পরিবর্তন করে এগিয়ে যায় সেইদিকেই। খুঁটিটাকে কি তাহলে দেখতে পায় উদ্ভিদ? নিতল কোনো পন্থায় কি অনুভব করে খুঁটির স্থানান্তকরণ? অনেক বাধার মধ্যে যে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, উপযুক্ত খুঁটি দেখতে না পেলেও নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে যায়

লুকিয়ে রাখা খুঁটির দিকে—খুঁটির অস্তিত্ব যেখানে যেখানে, নেই, সে সব তল্লাটের ধার কাছ দিয়েও যায় না—বরং এড়িয়েই যায় বলা চলে।

ফ্র্যান্সি আরো বলেছেন, উদ্ভিদরা 'ইচ্ছে' করতে সমর্থ ; যা চায়, তা খুঁজে বার করতে অথবা সেইদিকে এদিকে এগিয়ে যেতে তারা পারে এমন সব রহস্যজনক পন্থায় যা প্রেম ভালবাসার সবচেয়ে ফ্যানট্যাসটিক সৃষ্টিরাই করতে পারে।

উদ্ভিদ ধীরগামী হতে পারে, কিন্তু জড় নয়, নিষ্ক্রিয় নয়, অক্ষম নয় ; পরিপার্শ্বকে অনুভব করা এবং সাড়া দেওয়ার কুশলতায় তারা মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সানডিউ উদ্ভিদ নির্ভুল লক্ষ্যে মাছি খামচে ধরতে পারে। পরাশ্রয়ী কিছু উদ্ভিদ শিকারের সামান্যতম গন্ধ টের পেয়ে সব রকম বাধা অতিক্রম করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় সেইদিকে।

কোন পিঁপড়ে মধু খাবার ফিকিরে আছে, উদ্ভিদ তা ঠিক টের পায় এবং নিজেদের তখন মুড়ে রাখে। খুলে ধরে তখনি যখন বোঁটায় এত শিশির লেগে থাকে যে পিঁপড়ের পক্ষে বেয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। উন্নত ধরনের কিছু বাবলা জাতীয় গাছ আবার এই পিঁপড়েদের দিয়েই সর্বভুক স্তন্যপায়ী জীব এবং অন্যান্য পোকামাকড় থেকে নিজেদের রক্ষে করে—বিনিময়ে পিঁপড়েদের দেয় মধু।

বর্ণ আর গন্ধের লোভ দেখিয়ে, মধু খাইয়ে পোকাদের টেনে এনে পরাগরেণু এক ফুল হতে অন্য ফুলে পাচার করে উদ্ভিদ, মধুর লোভ দেখিয়ে মধুমক্ষিকাকে দিয়েও খাটিয়ে নেয় বংশবৃদ্ধির তাগিদে। এ সবই কি কাকতালীয় ? পুষ্পরেণু বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ফুলের এই যান্ত্রিক কৌশল কি নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা ?

Tricho ceros parviflorus নামে একরকমের অর্কিড বিশেষ জাতের একটা মেয়ে মাছির আকারে পাপড়ি মেলে এমন ছদ্মবেশ ধরে যে পুরুষ মাছি ছুটে আসে জোড়া বাঁধার আকর্ষণে—অর্কিডের পরাগরেণুর মিলনও ঘটে যায় এই ছলনার ফলে। এ-ও কি কাকতালীয়, না, নেহাৎই প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex) ? যে ফুল রাতে ফোটে, তারা রাতের প্রজাপতি আর মথকে আকর্ষণ করার জন্যে বেশী সাদা হয়ে ওঠে, গোধূলী লগ্নে আরও ঘন সৌরভ বিতরণ করে। মাছি যেখানে ভন্‌ভন্‌ করছে, সেখানে পচা মাংসের গন্ধ ছড়ায় কিছু ফুল। আবার যেখানে হাওয়ার জোরে পরাগরেণু উড়ে যায় এক ফুল থেকে আরেক ফুলে, সেখানকার গন্ধ, বর্ণ, রূপ দেখিয়ে পোকামাকড়দের আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করে না। এ সবই কি কাকতালীয়, না, দৈবাৎ ঘটনা ?

কাঁটা, তেঁতো স্বাদ বা আঠালো রস ক্ষরণ করেও উদ্ভিদরা বৈরী পোকামাকড়দের পাকড়াও করে ফেলে এবং নিজেদের রক্ষে করে। Mimosa Pudico

একটা ভীরু উদ্ভিদ। গুবরে পোকা, পিঁপড়ে বা পোকারা তার মিহি পাতার দিকে অগ্রসর হলেই বোঁটা খাড়া করে নিয়ে পাতা মুড়ে ফেলে। আগন্তুক হয় ডাল থেকে গড়িয়ে পড়ে অকস্মাৎ নড়াচড়ার ফলে অথবা ভয় পেয়ে চম্পট দেয়।

জলা জায়গায় নাইট্রোজেন পাওয়া দুর্ঘট বলে কিছু উদ্ভিদ জীবন্ত প্রাণীদের গিলে নিয়ে নাইট্রোজেনের অভাব মিটোয়। সংখ্যায় মাংসাশী উদ্ভিদরা পাঁচশ'রও বেশী। পোকা থেকে আরম্ভ করে গোমাংস পর্যন্ত কিছুতেই অরুচি নেই তাদের। শিকার পাকড়াও করার ছলাকলারও সীমা নেই। শুঁড়, আঠালো শুঁয়ো থেকে আরম্ভ করে ফানেলের মত ফাঁদ—কোনো কায়দাই বাদ দেয় না। মাংসাশী উদ্ভিদের শুঁড়গুলো কিন্তু শুধু যে তাদের মুখ, তা নয়—উদরও বটে। খুঁটির ওপর এই মুখ আর পেট খাড়া করে তুলে শিকার পাকড়াও করছে, খাচ্ছে, রক্ত মাংস সমস্ত হজম করে কংকাল ছাড়া আর কিছু ফেলছে না।

পোকাখেকো সানডিউ উদ্ভিদ নুড়িপাথর নিয়ে মাথা ঘামায় না; পাতার ওপর ধাতু বা অন্যান্য পদার্থ ফেলে দিলে সাড়া দেয় না। কিন্তু মাংস রাখলেই সঙ্গে সঙ্গে চনমনে হয়ে ওঠে পোষ্টাই খাবারের সান্নিধ্যে। ডারউইন দেখেছেন, এক গ্রেণের ৭৮ হাজার ভাগের একভাগ ওজনের এক টুকরো সুতোও যদি রাখা হয় সানডিউয়ের পাতায়, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা দেখা যায় তার মধ্যে। একটা উদ্ভিদের শাখা শেকড়দের পরেই সবচেয়ে অনুভূতি সচেতন প্রত্যঙ্গ বলা যায় তার শুঁড়কে; এক গ্রামের ০.০০০২৫ ওজনের এক টুকরো সিল্কের সুতোও এই শুঁড়ের ওপর রাখলে সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে পড়ে।

উদ্ভিদের গঠন প্রকৃতিও মানব-ইঞ্জিনীয়ারদের টেক্কা দিতে পারে। দারুণ ঝড়ের সময়ে উদ্ভিদের ফাঁপা নল যে দাপট ও ফ্যানট্যাসটিক ওজন সয়, মানুষের তৈরী কোনো কিছুই তার সমকক্ষ নয়। উদ্ভিদের তন্তু ঘোরানো সিঁড়ির মত পাক দিয়ে দিয়ে এমন মজবুত হয়ে ওঠে যে ছিঁড়তে গেলে রীতিমত বেগ পেতে হয়—মানুষ মাথা খাটিয়েও আজও সমতুল্য কিছু বানাতে পারে নি। কোষগুলো লম্বাটে হয়ে সসেজ বা চ্যাপ্টা ফিতের আকৃতি নেয় এবং পরস্পরের সঙ্গে এমন গাঁটছড়া বেঁধে থাকে যে অটুট দড়ি হয়ে দাঁড়ায়—এমন দড়ি যা টেনে ছেঁড়া যায় না। ওপর দিকে বাড়তে বাড়তে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিপুল ওজন সইবার মত নিজেকে গড়ে নেয় প্রতিটা উদ্ভিদ।

ছিপছিপে কাণ্ডর ওপর মাটি থেকে ৪৮০ ফুট ওপরে মাথা তুলে নিয়ে যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ান ইউক্যালিপটাস—Cheops-য়ের গ্রেট পিরামিডের সমান উচ্চতায়। কিছু ওয়ালনাট এক লক্ষ বাদাম চাষ করতে পারে একটি মাত্র বৃক্ষে। ভার্জিনিয়া নটউইড উদ্ভিদ এমন জাহাজি গিঁট বাঁধতে পারে যা শুকিয়ে গেলে দারুণ চাপে ছিঁড়ে গিয়ে বীজগুলোকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় যাতে

নিজে থেকে তারা অঙ্কুরিত হতে পারে মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে।

ভবিষ্যৎ এবং পূর্বাভিমুখীনতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন হয় উদ্ভিদরা। মিসিসিপির উপত্যকার তৃণভূমিতে সীমান্ত-মানুষ আর শিকারীরা Silphium laciniatum নামে একটা সূর্যমুখী উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছে। এ-গাছের পাতা নির্ভুলভাবে কম্পাসের কাঁটা যেদিকে ঘুরে থাকে, সেদিক নির্দেশ করতে পারে। ইণ্ডিয়ান যষ্টিমধু Arbrus precatorius যাবতীয় বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক প্রভাবে এমন তীক্ষ্ণভাবে সাড়া দেয় যে এ গাছকে আবহাওয়া উদ্ভিদ হিসেবে কাজে লাগানো হয়। লণ্ডনের Kew gardens-য়ের যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই উদ্ভিদটি নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা দেখেন সাইক্লোন, হারিকেন, টর্ণাডো, ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত—এই সবকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা রাখে বিস্ময়কর এই যষ্টিমধু।

ঋতু সম্বন্ধে অ্যালপাইন ফুলরা এত বেশী নির্ভুল যে তারা ঠিক বুঝতে পারে বসন্ত ঋতু কখন আসছে ; সময় পার করে দিয়ে যদিও বা তখন বরফের চাদর তাদের ঢেকে রেখে দেয়, বরফের মধ্যে একটু একটু করে পথ করে নিয়ে এগোতে থাকে নিজেদের দেহে উত্তাপ সৃষ্টি করে—যে উত্তাপে গলে যায় বরফ।

ফ্যান্সি বলেছেন, এত বিভিন্ন পন্থায়, এত দ্রুত, এত নিশ্চিতভাবে বহির্জগতের ক্রিয়ায় যে-সব উদ্ভিদ সাড়া দেয়, নিশ্চয় বহির্জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা আছে—যে ব্যবস্থা আমাদের অনুভূতিবোধের সমতুল্য, অথবা তার চাইতেও উঁচু মানের। মানুষ নৃতত্ত্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফাঁদে বন্দী হয়ে, তার পাঁচটি মাত্র অনুভূতি-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিপার্শ্বের যে খবর, কাণ্ডকারখানা সংগ্রহ করে অথবা জানতেও পারে না—উদ্ভিদ ক্রমান্বয়ে সে সব পর্যবেক্ষণ এবং খবর সংগ্রহ করে যাচ্ছে—এ তত্ত্ব বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন ফ্যান্সি।

উদ্ভিদকে সার্বজনীন চোখে অনুভূতিবিহীন যন্ত্রবৎ বলে গণ্য করা হয়েছে এতদিন। এখন কিন্তু দেখা গেছে, মানবকর্ণে যে সব শব্দ ধরা পড়ে না, উদ্ভিদ সেই সব শব্দের তফাৎ ধরতে পারে ; ইনফ্রা-রেড আর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির মত যে সব রশ্মি মানব-চক্ষে অদৃশ্য, উদ্ভিদ সেই সব রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুধাবনে সক্ষম। বিশেষ করে এক্স-রে আর টেলিভিশনের হাই-ফ্রিকোয়েন্সি বিকিরণের প্রতি উদ্ভিদ খুব বেশী সচেতন।

যেহেতু উদ্ভিদের বাহ্যিক আকৃতি একটা একক এবং এর কিছু অংশ ধ্বংস হলেই আবার তা গড়ে নিতে পারে, ফ্যান্সির তাই বিশ্বাস পুরো আকৃতিটার তদারক করছে কোনো সচেতন সত্তা—এমন একটা ধীমান সত্তা যার অস্তিত্ব রয়েছে উদ্ভিদের ভেতরেই—অথবা তদারকি চালাচ্ছে বাইরে থেকে।

প্রায় আধ শতাব্দী আগে ফ্রান্সে এই সব আশ্চর্য ব্যাপার বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন যাবতীয় জীবন্ত প্রাণীর যা কিছু বৈশিষ্ট্য, তার সবই আছে উদ্ভিদের ; 'গালমন্দ দিলে অত্যন্ত প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং অনুগ্রহ দর্শালে কৃতজ্ঞতায় গলে যাওয়া' পর্যন্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সবই সম্ভব। এত বিশ্বাস নিয়ে 'উদ্ভিদের অব্যক্ত জীবন' তিনিই লিখতে পারতেন। কিন্তু যা তিনি লিখেছিলেন, তারই কোনো কদর হয়নি, বরং টিটকিরি খেয়েছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশী স্তম্ভিত হয়েছেন তাঁর একটি বিস্ময়কর অনুমিতি শুনে। উদ্ভিদের এই যে চৈতন্য, তার উৎস নাকি বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে—মহাজাগতিক সত্তাদের মধ্যে—হিন্দুরা যাদের বলেছেন 'দেবগণ'। কেল্ট এবং অন্যান্য অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরী, ভূত, অপদেবতা ইত্যাদিদের সরাসরি দেখতে পেতেন—উদ্ভিদরাও নাকি তার ব্যতিক্রম নয়। তত্ত্বটা 'নিরতিসীম হতাশাব্যঞ্জক এবং মূঢ়ধ্বকর ঊষর' বলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা থ হয়ে গেছিলেন।

১৯৬০-য়ের দশকে বেশ কয়েকটা চাঞ্চল্যকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর থেকেই উদ্ভিদ জগৎ তীব্র ভাবে নাড়া দিয়েছে আধুনিক মানবের চিন্তাধারাকে। অবিশ্বাসীরা আজও অবশ্য আছেন। পদার্থবিদ্যা আর অধিবিদ্যার শুভবিবাহে নিতকনে হিসেবেও উদ্ভিদকে মেনে নিতে তাঁরা রাজী নন।

কবি আর দার্শনিকদের দিব্যদৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে অনেক কিছুই অবশ্য ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ভিদরা যে জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস ও বার্তা বিনিময়ে সক্ষম প্রাণী, তাদেরও ব্যক্তিত্ব আছে, আছে আত্মা নামক রহস্যময় সত্তা—তাঁর প্রমাণ এখন মিলছে। আমরা অন্ধ বলেই তাদের যন্ত্রবৎ গণ্য করে এসেছি এতকাল। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ইকোলজি অর্থাৎ জন্মস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণী ও উদ্ভিদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে এই গ্রহকে আবার রমণীয় করে তোলার সুকঠিন কাজে সাহায্য করতে উদ্ভিদরা কিন্তু সাগ্রহে প্রস্তুত এবং অতিশয় ইচ্ছুক।

●

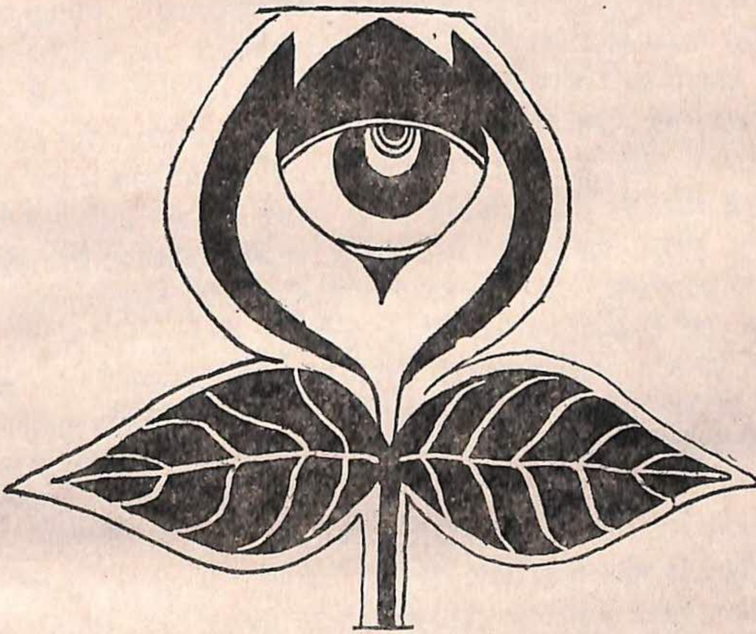
যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি হন আপনি, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সুসংবদ্ধ প্রগতিতে আস্থা যদি থাকে, এই গ্রন্থের একটি শব্দও বিশ্বাস করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। উদ্ভিদ জগতের অজ্ঞাত শক্তি, উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের ভাব বিনিময় এবং যোগাযোগ, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, রেডিওনিক কীটনাশক এবং এই জাতীয় বহুবিধ 'ননসেন্স' বিধৃত হয়েছে এই কেতাবের পাতায় পাতায়।

কিন্তু যদি কঠোর বস্তুবাদ আপনাকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে তুলে থাকে, এ-রকম কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ আর দুটি পাবেন না।

উদ্ভিদ নিয়ে বহু শাস্ত্রবিরোধী পরীক্ষানিরীক্ষার উদ্ভট সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে এই বইতে। উদ্ভিদ নাকি 'রক' মিউজিক শুনলে সরে আসতে চায়, 'বাখ' মিউজিক শুনলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে। মানসিক অথবা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া নাকি যন্ত্রে ধরা পড়েছে।

বিবিধ অসাধারণ এবং চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের তালিকা বলা যায় এই বইটিকে। অধিকাংশই বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার অগম্য, প্রায়শঃই অবিশ্বাস্য, কিন্তু ফ্যানট্যাসটিক ফলাফলগুলোকে যদি কিছুমাত্রও আমল দেওয়া যায়, তাহলে মানতেই হবে বৈপ্লবিক বিজ্ঞান-ধারণার বীজ উপ্ত রয়েছে এই কেতাবে।

প্রথম খণ্ড



আধুনিক গবেষণা

উদ্ভিদ এবং অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ

নিউইয়র্কের টাইমস্কোয়ারে বড় আজব এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে মত্ত হয়েছেন ব্যাকস্টার নামক এক খেয়ালী ব্যক্তি—যাঁর কানের গড়ন বামন-ভূত এলফিনদের মত মজাদার। গ্যালভানোমিটার আর একটা ঘরোয়া উদ্ভিদ—নাম, Dracaena massangeana ; এক্সপেরিমেণ্ট তো নয়, যেন 'আজব দেশে অমলা' কাহিনীর মত উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার। অ্যাডভেঞ্চারের শুরু ১৯৬৬ সালে। আমেরিকার শীর্ষ-স্থানীয় লাই-ডিটেকটর পরীক্ষক ক্লী ব্যাকস্টার পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আগত পুলিশম্যান আর সিকিউরিটি এজেণ্টদের শেখাচ্ছিলেন তাঁর বিদ্যে—শেখাচ্ছিলেন তাঁরই পলিগ্রাফ পরীক্ষক স্কুলে—সারা রাত ধরে। হঠাৎ কি খেয়াল হল, তাঁর একটা লাই-ডিটেকটর মেশিনের ইলেকট্রোডগুলো লাগিয়ে দিলেন ড্রাকেনার পাতায়। ড্রাকেনা উদ্ভিদটা নিরক্ষীয় অঞ্চলে জন্মায়। পাতার সাইজ বেশ বড়, ফুলগুলো আকারে ছোট, কিন্তু গোছা গোছা। সাধারণ লোকপ্রিয় প্রবাদ অনুসারে এর রজন (রেজিন) থেকেই উৎপাদিত হয় ড্রাগন-রক্ত। ব্যাকস্টার দেখতে চেয়েছিলেন, শেকড়ে জল ঢাললে পাতাগুলোয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কিনা ; দেখা যদি যায়, সেটা হয় কিভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি হয়—এই নিয়েই তাঁর কৌতূহল।

আদ্র' উদ্ভিদের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় বলে বৈদ্যুতিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে কম মাত্রায়। শেকড় থেকে জল বোঁটা বেয়ে ওপরে উঠে গেলে ঠিক এই রকমটিই লক্ষ্য করবেন আশা করেছিলেন ব্যাকস্টার। কিন্তু গ্যালভানো-মিটারে সে-রকম কোনো সংকেত না দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। গ্রাফ-পেপারের ওপরে কলমটা ওপর দিকে না উঠে নামতে লাগল নিচের দিকে—এঁকে গেল করাত-দাঁতের প্যাটার্নে রেখাচিত্র। মানুষ যখন সংক্ষিপ্ত ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত হয়, ঠিক এই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় গ্রাফ পেপারে !

গ্যালভানোমিটার পলিগ্রাফ লাই-ডিটেকটরের এমন একটা অংশ যার কাঁটা ঘুরে যাবে অথবা একটা কলম রেখাচিত্র এঁকে যাবে গ্রাফ পেপারের ওপর ; মানসিক ছবি অথবা সামান্যতম ভাবাবেগের প্রকাশকে ধরে রাখবে কাগজের বুকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভিয়েনার পুরুৎঠাকুর ফাদার ম্যাক্সমিলান হিল

আবিষ্কার করেছিলেন যন্ত্রটি। সম্রাজী ম্যারিয়া থেরেসার রাজজ্যোতিষী ছিলেন ইনি। যন্ত্রটার নামকরণ হয়েছিল কিন্তু ইটালীর পদার্থবিজ্ঞানী এবং নরদেহ-বিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভ্যানির নামানুসারে। জান্তব তড়িৎ আবিস্কারের কৃতিত্ব জোটে তাঁর বরাতে—দেরীতে হলেও। গ্যালভ্যানোমিটার এখন ব্যবহৃত হয় হুইটস্টোন ব্রীজ নামক একটা ইলেকট্রিক সার্কিটের সঙ্গে। সার্কিটটার নাম রাখা হয়েছে—ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী এবং অটোমেটিক টেলিগ্রাফ আবিস্কারক স্যার চার্লস হুইটস্টোনের সম্মানে।

সোজা ভাষায়, ব্রীজ জিনিসটা রোধ বা রেসিস্ট্যান্সের ভারসাম্য বজায় রাখে, যাতে চিন্তা বা ভাবাবেগের প্রভাবে মানবদেহের ইলেকট্রিক পোটেনসিয়াল বা বিভব মাপতে পারে। পুলিশী রীতি অনুযায়ী সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কয়েকটা সাজানো প্রশ্ন করা হয়। তারপর দেখা হয় প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাঁটা কিভাবে তুরুক নাচ নাচে। রেখাচিত্রর প্যাটার্ন দেখে অভিজ্ঞ পরীক্ষক ব্যাকস্টারের মত অনেকেই ধরতে পারেন উত্তরের মধ্যে ছলচাতুরী আছে কিনা। গ্যালভ্যানো-মিটারে কাঁটার নৃত্য খুব বেশী জোরদার করার জন্যে সবচেয়ে কর্যকরী পন্থা হল মানবদেহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভীতি এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি করা এবং সেটি সম্ভব হয় কেবল তার দৈহিক ক্ষতির হুমকিতে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করবেন ঠিক করলেন ব্যাকস্টার। এক কাপ গরম কফিতে ড্রাকেনার একটা পাতা ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু মিটারে লক্ষ্য করার মত কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

সমস্যাটা নিয়ে মিনিট কয়েক ভাবনাচিন্তা করার পর ঠিক করলেন চরম হুমকি ছাড়বেন এবার। যে পাতাগুলোয় ইলেকট্রোডগুলো লাগিয়ে রেখেছেন, সেই-গুলোকেই পুড়িয়ে ফেলা মনস্থ করলেন। মতলবটা মাথায় আসতেই এবং দেশলাইয়ের সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার আগেই রেখাচিত্রে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল—ধাঁ করে কলমটা মোড় নিয়ে একনাগাড়ে উঠতে লাগল ওপর দিকে। ব্যাকস্টার কিন্তু উদ্ভিদ অথবা রেকর্ডিং মেশিনের দিকে একটুও এগোন নি—তা সত্ত্বেও একনাগাড়ে কলম উঠতে লাগল ওপর দিকে। তবে কি ওঁর মনের কথা টের পেয়েছে গাছটা ?

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন গ্রাফপেপারে আর একদফা ভাবাবেগের বিস্ফোরণ ধরা পড়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেশলাইটা নিয়ে এগোলেন পাতা পোড়াতে। এবার কিন্তু প্রতিক্রিয়া নিম্নমুখী হল গ্রাফপেপারে। তারপর যখন পাতা পোড়ানোর ভান করলেন, গ্রাফ পেপারে কোনো রকমের প্রতি-ক্রিয়াই ধরা পড়ল না। রহস্যজনকভাবে আসল ইচ্ছে এবং ভান করা ইচ্ছের তফাৎটা ধরে ফেলেছে উদ্ভিদ। বিশদভাবে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলেন

ব্যাকস্টার। তদন্ত করলেন সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে। যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা, আগে জানার চেষ্টা করলেন। গাছটার মধ্যে অসাধারণ ব্যাপার কিছু নেই তো? নিজের মধ্যেও সেরকম কিছু নেই তো? বিশেষ এই পলিগ্রাফ যন্ত্রটার মধ্যে নেই তো? সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে দেশের অন্যান্য জায়গায় নানান রকমের উদ্ভিদ আর অন্যান্য পলিগ্রাফ মেশিন নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চালালেন ব্যাকস্টার। পঁচিশটারও বেশী নানা ধরনের উদ্ভিদ আর ফল বেছে নিয়েছিলেন —লেটুস, পিঁয়াজ, কমলা, কলাও বাদ যায়নি। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেল একই ব্যাপার। ফলে, জীবনের একটা নতুন দিক খুলে গেল চোখের সামনে।

প্রথমে উনি ভেবেছিলেন নিশ্চয় কোনো অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধের দরুন উদ্ভিদরা তাঁর মনের কথা জেনে ফেলেছে; তারপর দ্বন্দ্ব লাগল অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ (ESP) নামটা নিয়ে। স্পর্শ, দর্শন, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ—এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে যে অনুভূতি তারই নাম ESP; কিন্তু গাছের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা,ত্বক নেই—কোনো স্নায়ুতন্ত্রই নেই—ডারউইনের আমল থেকেই কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানী গাছেদের এই সম্মান দেয়নি। তাহলে নিশ্চয় অনুভূতি আরও গভীরে নিহিত। খুব সম্ভব প্রকৃতিব্যাপী একটা প্রাথমিক অনুভূতিবোধ আছে, মানুষের এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সেই অনুভূতি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। গাছেরা হয়তো চোখ ছাড়াই ভাল দেখতে পায়—চোখ নিয়ে মানুষ যা দেখে, তার চেয়ে বেশী দেখতে পায়। মানুষ পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছেমত সব কিছুই অনুভব করতে পারে না, অনেক কিছুই কম মাত্রায় উপলব্ধি করে। ব্যাকস্টার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেছিলেন, সবই যদি সবাই একসাথে জেনে ফেলত, তাহলে তো অনর্থ বেঁধে যেত।

গাছেরা কি-কি উপলব্ধি বা অনুভব করতে পারে আবিষ্কার করার জন্যে অফিস বাড়িয়ে ফেললেন ব্যাকস্টার, বিজ্ঞানসম্মত ল্যাবরেটরী বানিয়ে ফেললেন। পরের কয়েক মাস সব রকম উদ্ভিদের সাড়া আর প্রতিক্রিয়ার নানান ধরনের চার্ট তৈরী করলেন। তিনি দেখলেন, উদ্ভিদ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিলে, পাতাটাকে কেটে ইলেকট্রোডের সাইজে নিয়ে এলে, এমন কি পাতাকে ফালি ফালি করে ফেলে ইলেকট্রোডের ওপর ছড়িয়ে দিলেও একই প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে গ্রাফ পেপারে। এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

শুধু যে মানুষকেই ভয় পায় উদ্ভিদ, তা নয়। ঘরের মধ্যে কুকুর হঠাৎ ঢুকে পড়লেও ঘাবড়ে যায়। অথবা এমন কোনো ব্যক্তি, যে উদ্ভিদের মঙ্গল চায়, তার আবির্ভাবেও ভয় পায় বেচারা উদ্ভিদ। হাতেনাতে ব্যাকস্টার দেখিয়েছেন, মাকড়শার উপস্থিতিতে কিভাবে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে তার উদ্ভিদ গ্রাফ-পেপারে। মাকড়শাকে যে-ব্যক্তি সামলানোর চেষ্টা করছে,তার কাছ থেকে মাকড়শার

চম্পট দেওয়াটাও ঠিক টের পায় উদ্ভিদ। নাটকীয় পরিবর্তন আসে রেখাচিত্রে। মাকড়শা যে পালাতে চাইছে, তার সে পলায়নী ইচ্ছেটা যেন বুঝতে পারে। পাতায় ধরা পড়ে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া।

খুব ভয় পেলে মানুষ যেমন অজ্ঞান হয়ে যায়, 'আত্মরক্ষার তাগিদে' যেন উদ্ভিদও জ্ঞান হারায়। নাটকীয়ভাবে হাতে নাতে ব্যাকস্টার দেখিয়ে ছিলেন এই ঘটনা। কানাডা থেকে একদিন এক শারীরবিজ্ঞানী এসেছিলেন তাঁর গবেষণা মন্দিরে। পর পর পাঁচটা উদ্ভিদে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না—দেখা গেল কেবল ষষ্ঠ উদ্ভিদে এবং বিপুলভাবে।

অবাক হলেন ব্যাকস্টার। জানতে চাইলেন—'আপনার পরীক্ষায় কি গাছ-পালার ক্ষতি করার মত কোনো ব্যাপার আছে?'

'আছে বৈকি,' জবাব দিলেন শারীরবিজ্ঞানী। 'এক্সপেরিমেণ্ট শেষ হলে গাছগুলোকে আমি উনুনে পুড়িয়ে ফেলি—বিশ্লেষণের জন্যে ছাইয়ের ওজন নিই।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এয়ারপোর্ট অভিমুখে রওনা হলেন শারীর-বিজ্ঞানী। আবার প্রতিটা উদ্ভিদ সাড়া জাগলো গ্রাফ পেপারে।

এই ঘটনা থেকেই ব্যাকস্টার এলেন তাঁর বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে। রহস্যজনক কোনো পন্থায় উদ্ভিদরা জানতে পারে তাদের সমূহ বিপদ আসন্ন। তখন স্বেচ্ছায় সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়—যাতে মৃত্যুযন্ত্রণা টের না পায়। র‍্যাবি নামে এক জাতীয় জন্তুদের বধ করবার আগে তারা নিজেদের ঘুম পাড়িয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু ডেকে আনে। যাতে 'রাসায়নিক আতংক' মাংসের মধ্যে থেকে গিয়ে আহার্য হিসেবে মাংসটা অখাদ্য না হয়ে যায়—ঠিক সেইভাবে উদ্ভিদও জ্ঞান হারায়। ব্যাকস্টার বলে-ছিলেন—'দেখে তো মনে হয়, মাটিতে পচে মরার জন্যে আসেনি উদ্ভিদ জগৎ, ঊর্ধ্ব জগতের উন্নত প্রাণের বিকাশকে তারা টের পায়।'

উদ্ভিদরা যে অব্যাখ্যাত কোনো উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে মানুষের মনের সঙ্গে, একটা এক্সপেরিমেণ্ট দিয়ে হাতেনাতে তা দেখিয়েছিলেন ব্যাকস্টার। গ্যালভানোমিটারের ইলেকট্রোড লাগিয়ে রেখেছিলেন একটা ফিলো-ডেনড্রনের পাতার সঙ্গে। তারপর একজন লেখককে তাঁর জন্মতারিখটা জিজ্ঞেস করেছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত সাতটা বছর পর পর বলে গেছিলেন লেখককে, শিখিয়ে দিয়েছিলেন যেন প্রতিবারই একই সুরে 'না' বলে যান। গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে লেখকের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তা সত্ত্বেও সঠিক সালটা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে খুব বেশী চনমনে হয়ে উঠেছিল ফিলো-ডেনড্রন। ঘটনাটা 'বাল্টিমোর সান' পত্রিকায় প্রবন্ধকারে ছাপা হয়, পরে সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশ পায় 'রীডার্স ডাইজেস্ট'।

উদ্ভিদের স্মৃতিশক্তি আছে কিনা এবং এই স্মৃতিশক্তিকে উদ্ভিদ প্রকাশ করতে পারে কিনা, তা নিয়েও এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন ব্যাকস্টার। দুটো উদ্ভিদের একটার গুপ্তঘাতককে সনাক্ত করতে চেয়েছিলেন অপর উদ্ভিদ দিয়ে। পলিগ্রাফ ছাত্রদের মধ্যে ছিল অনেক অভিজ্ঞ পুলিশের লোক। এদের ছ'জন স্বেচ্ছায় রাজী হল এক্সপেরিমেণ্টে তাঁকে সাহায্য করতে। একটা টুপির মধ্যে টুকরো টুকরো অনেকগুলো কাগজে লেখা ছিল দুটো উদ্ভিদের কোনটাকে শেকড়শুদ্ধ তুলে এনে একেবারেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। একই ঘরে ছিল দুটো উদ্ভিদ। ঘাতক কিন্তু অপকর্মটি করবে সবার চোখের আড়ালে। ব্যাকস্টার বা অন্য কোনো ছাত্র দেখতে পাবে না। সাক্ষী উদ্ভিদের সঙ্গে পলিগ্রাফ লাগিয়ে ছাত্র ছ-জনকে তার সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন ব্যাকস্টার। অদ্ভুত কাণ্ডটা দেখা গেল ঠিক তখনি। পাঁচজন ছাত্রের সামনে নিশ্চল রইল মিটারের কাঁটা। কিন্তু অপরাধী ছাত্রটি সামনে দিয়ে যেতেই ক্ষেপে গেল কাঁটা।

এমনও তো হতে পারে, ঘাতকের অপরাধী মনোভাবকে ধরে নিয়ে উদ্ভিদ তা প্রতিফলিত করেছে মিটারের কাঁটায়? কিন্তু বিজ্ঞানের স্বার্থে যে এই কুকর্মটি করেছে, তার মনের মধ্যে অপরাধী মনোভাব থাকার কথা নয়। কাজেই নিশ্চিন্ত হলেন ব্যাকস্টার। উদ্ভিদই মনে রেখেছে সঙ্গী উদ্ভিদের ঘাতককে এবং চিনতেও পেরেছে—নিজের ক্ষতির সম্ভাবনায় তাই আঁৎকে উঠেছে বলা যায়।

আরও একটা আশ্চর্য এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন ব্যাকস্টার। নিউজার্সি'র মস্ত বড় একটা কারখানায় খুন হয়েছিল একটি মেয়ে। সন্দেহভাজনকে সনাক্ত করার জন্যে ডাক পড়ল ব্যাকস্টারের তাঁর লাই-ডিটেকটর মেশিন সমেত। খুনের সময়ে কারখানায় লোক ছিল অনেক। এতজনকে জেরা করা অনেক ঝামেলার ব্যাপার। তাই ব্যাকস্টার শরণ নিলেন এমন দুটি উদ্ভিদের যারা ছিল মৃতদেহ যে ঘরে পাওয়া যায়—সেই একই ঘরে। পলিগ্রাফ লাগিয়ে দেওয়া হল উদ্ভিদ দুটোর সঙ্গে। কারখানার সমস্ত লোককে হাঁটানো হল তাদের সামনে দিয়ে। ব্যাকস্টারের উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ একজনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদরা চঞ্চল হলে তাকে নিয়েই বিধিবদ্ধভাবে পলিগ্রাফ টেস্ট করবেন। কিন্তু কারোর ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখালো না উদ্ভিদরা। ব্যাকস্টারের এক্সপেরিমেণ্ট কিন্তু বিফলে যায়নি। পরে জানা গিয়েছিল, খুনী কারখানার কেউ নয়—বাইরের লোক!

উদ্ভিদ-রক্ষকের সঙ্গে উদ্ভিদদের যে একটা দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাকস্টার। উদ্ভিদ-রক্ষক কাছাকাছি না থাকলেও, পাশের ঘরে, নিচের তলায়, এমন কি কয়েকখানা বাড়ী পরে থাকলেও তার চিন্তাধারায় সাড়া দিয়ে যায় উদ্ভিদ—যেন বিশেষ একটা সহযোগী সূত্র স্থাপিত হয়ে যায় উদ্ভিদ আর উদ্ভিদ-রক্ষকের মধ্যে। একই তালে

চলছে এমন দুটি স্টপওয়াচ নিয়ে অবিশ্বাস্য এই ব্যাপার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ব্যাকস্টার।

পনেরো মাইল দূরের যাত্রাপথ থেকে সহসা নিউইয়র্কে ফিরে আসা মনস্থ করেছিলেন ব্যাকস্টার—পরিষ্কার সাড়া দেখা গিয়েছিল ঘরের উদ্ভিদগুলোয় ঠিক সেই মুহূর্তে। স্বস্তিবোধ না স্বাগতমের সাড়া—তা অবশ্য বলতে পারেননি ব্যাকস্টার। আর একবার লেকচার টুরে বেরিয়ে ঠিক যে মুহূর্তে প্রিয় ড্রাকেনা উদ্ভিদের স্লাইড প্রক্ষেপ করেছিলেন বক্তৃতাঘরে, গবেষণা মন্দিরের ড্রাকেনা সাড়া জাগিয়েছিল গ্রাফ পেপারে।

একবার কোনো বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা হয়ে গেলে উদ্ভিদরা সেই ব্যক্তির সঙ্গে যেন একটা সংযোগস্থাপন করে চলে—তা সে ব্যক্তি যতদূরেই থাকুক না কেন। একবার এই ব্যাপার পরখ করার জন্যে একটা নোট বই আর একটা স্টপওয়াচ নিয়ে টাইম স্কোয়ারের ভিড়ের মধ্যে গিয়েছিলেন ব্যাকস্টার। কখনো ছুটেছেন, কখনো চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন, কখনো খবরের কাগজওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, কখনো পাতালরেল ধরতে ভূগর্ভে নেমেছেন—ভাবাবেগের সময় এবং বৃত্তান্ত নোট বইতে লিখে রেখেছেন। বাড়ী ফিরে এসে দেখেছেন, প্রতিটা উদ্ভিদ পৃথকভাবে তাঁর প্রতিটা ভাবাবাগের সময়ে কাঁটায় কাঁটায় চঞ্চল হয়েছে। অদৃশ্য চোখ দিয়ে তাঁর ভাবাবেগ আর অ্যাডভেঞ্চার প্রত্যক্ষ করেছে প্রতিটা উদ্ভিদ।

কি ধরনের শক্তি-তরঙ্গ মারফৎ মানবচিন্তা উদ্ভিদ টের পায়, ব্যাকস্টার কিন্তু তা আবিষ্কার করতে পারেননি। ফ্যারাডে খাঁচা, এমন কি সিসের আধারের মধ্যে উদ্ভিদকে রেখেও অজ্ঞাত এই শক্তি-তরঙ্গ রোধ করতে পারেন নি—মানব মনের হদিশ রেখেছে উদ্ভিদ। এই থেকেই ব্যাকস্টার সিদ্ধান্তে আসেন, বাহক-তরঙ্গটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের এখতিয়ারে আসে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র তা কার্যকর। অবশ্য এই শক্তি-তরঙ্গটি আদৌ কোনো শক্তি-তরঙ্গ কিনা, তা বলতে পারেন নি ব্যাকস্টার।

ব্যাকস্টারের আঙুল কেটে গেছিল একদিন। আয়োডিন লাগিয়েছিলেন কাটা আঙুলে। অমনি পলিগ্রাফের সঙ্গে লাগানো উদ্ভিদটায় প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ব্যাকস্টারের আঙুলের কোষগুলোর মৃত্যুযন্ত্রণা যেন উদ্ভিদটাকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হল। আঙুল কেটে যাওয়ার দরুন ব্যাকস্টারের মন বিচলিত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় গাছটা চঞ্চল হয়েছে, এমনও হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য জীবন্ত টিশুর মৃত্যুতে সাক্ষী যে সব গাছেরা, তাদের রেখাচিত্রেও প্রায় একই রকম প্যাটার্ন লক্ষ্য করলেন ব্যাকস্টার। তাহলে কি আশপাশের কোষের মৃত্যু ঘটলে উদ্ভিদের অনুভূতিসচেতনতা কোষের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে?

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন ব্যাকস্টার।

আর একবার একবাটি Yogurt খেতে বসেছিলেন ব্যাকস্টার। পলিগ্রাফে একই প্যাটার্ন দেখে বিস্মিত হলেন। ধাঁধায় পড়লেন। তারপর বুঝলেন, বাটিতে যে জ্যাম-টা মিশোচ্ছেন, তার কেমিক্যালটা Yogurt জীবাণুকে মেরে ফেলছে। বেসিনে গরম জল ঢালতেই পাইপের ব্যাকটিরিয়া মারা গেছিল বলে একই প্যাটার্ন দেখেছিলেন পলিগ্রাফ মেশিনে।

কোষের চেতনা আছে, এই ধারণা নিয়ে গবেষণা করলেন ব্যাকস্টার। ইলেকট্রোড ডুবিয়ে রাখলেন বহু এককোষী প্রাণীর কাথে; অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম ঈস্ট, মানুষের মুখ থেকে চেঁচে নেওয়া কোষ, রক্তকোষ, এমন কি শুক্রকীট পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখলেন তরল পদার্থে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে রেখাচিত্র লক্ষ্য করেছেন, একই রেখাচিত্র দেখা গেল প্রতিটি ক্ষেত্রে। সবচেয়ে অবাক করল বীর্যকোষরা। যে পুরুষটির শুক্রকীট, তাকে যেন সনাক্ত করতে পারল কোষগুলো, তার উপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলল পলিগ্রাফে—অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে রইল নির্বিকার। এই থেকেই ব্যাকস্টার অনুমান করলেন, পূর্ণস্মৃতি জাতীয় কিছু একটা একক কোষ পর্যন্ত পেঁছোয়; মস্তিষ্ক নিছক একটা সুইচ ছাড়া কিছু নয়—সংরক্ষক দেহযন্ত্র তো নয়ই।

সচেতনতা শুধু কোষ-পর্যায়েই সীমিত নয়। অণুর স্তরে এমন কি তারও ওপারে বোধক্ষমতা পেঁছোতে পারে। এতদিন যাদের নিষ্প্রাণ বলে ভাবা হয়েছে, এখন তাদের নিয়ে নতুন করে চিন্তা করা দরকার। এই কথাই শেষকালে বলেছিলেন ব্যাকস্টার।

বিজ্ঞানের এতবড় আবিষ্কার পত্রিকায় ছাপবার জন্যে ব্যগ্র হলেন তিনি—নইলে তো কৌতূহল সঞ্চার করা যাবে না বিজ্ঞানীমহলে। কিন্তু তার আগে এক্সপেরিমেণ্ট করা দরকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে—যাতে নিজে জড়িত না থাকেন। আড়াই বছরের চেষ্টায় স্বয়ংক্রিয় পন্থায় উদ্ভিদের কোষ বধ করার পন্থা বার করলেন তিনি—ধারে কাছেও তখন কোনো মানুষ থাকবে না।

নোনা চিংড়িকে গরম জলে ফেলে 'ফিলোডেনড্রন করডেটাম' উদ্ভিদের পাতায় গ্যালভানোমিটারের ইলেকট্রোড লাগিয়ে রেখে ব্যাকস্টার দেখলেন, চিংড়ির মৃত্যুতেও সবকটা উদ্ভিদ একই সঙ্গে প্রবল সাড়া দেয়। এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল প্রবন্ধাকারে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল জার্নাল অফ প্যারাসাইকলজি'তে প্রকাশিত হয় (ভল্যুম ১০, ১৯৬৮)। উদ্ভিদ জীবনের প্রাথমিক অনুভূতির সাক্ষ্য প্রমাণ—এই নামে ছাপা হয়েছিল প্রবন্ধটা।

সাত হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক ব্যাকস্টারের মূল গবেষণার রিপোর্টের রিপ্রিন্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় দু-ডজন আমেরিকান ইউনিভার্সিটি তাঁর

গবেষণা হুবহু নিজেরা করে দেখতে চেয়েছিল। সংবাদপত্রগুলো প্রথমদিকে ব্যাকস্টার-গবেষণাকে আমল না দিলেও তারপর এমন হৈ-চৈ আরম্ভ করে দিলে যে বিশ্বব্যাপী সাড়া পড়ে গিয়েছিল—ঘরে ঘরে বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের ঘরোয়া উদ্ভিদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল। ন্যাশন্যাল ওয়াইল্ডলাইফ ম্যাগাজিনে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯) খবর ছাপা হতেই এই কাণ্ড ঘটেছিল।

কাঠুরের আবির্ভাবে ওক গাছের কাৎরানি অথবা খরগোশকে দেখেই গাজরের থরহরি-কম্প নিয়ে পাঠকরা রোমাঞ্চিত হলেও, ন্যাশন্যাল ওয়াইল্ডলাইফ ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা চেয়েছিলেন ব্যাকস্টারের গবেষণা রোগ নিদানে, অপরাধ-তদন্তে এবং চরবৃত্তিতে নিয়োগ করা হোক। কতকগুলো সম্ভাবনা এমনই ফ্যান-ট্যাসটিক মনে হয়েছিল যে সে সব ছাপার আকারে প্রকাশ করতে তাঁদের সাহস হয়নি। ESP গবেষণা (অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ) যে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক মর্যাদালাভ করেছে, এই সম্পর্কে প্রবন্ধ ছাপা হয়ে গেল 'মেডিক্যাল ওয়ার্ল্ড নিউজ' পত্রিকায় (২১শে মার্চ, ১৯৬৯) ; লেখা হল, ১৮৮২ সালে কেম্ব্রিজে 'বৃটিশ সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাইকিক কাণ্ডকারখানার বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নিয়ে বৃথাই তদন্তকারীরা চেষ্টা করে গিয়েছেন—প্রথম সফল হলেন ব্যাকস্টার।

টাকা পয়সা দেদার আসতেই আরো যন্ত্রপাতি কিনে গবেষণা নিয়ে মত্ত হলেন ব্যাকস্টার। ইলেকট্রো-কারডিওগ্রাফ এবং ইলেকট্রো এনকেফালোগ্রাফ মেশিন পর্যন্ত আনালেন। এসব মেশিনের প্রয়োজন হয় হৃদ্‌পিণ্ড আর মস্তিষ্ক থেকে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করার জন্যে। ব্যাকস্টার মাপলেন উদ্ভিদদের তড়িৎ—বাইরে থেকে তড়িৎ-প্রবাহ উদ্ভিদদেহে সঞ্চারিত না করে। পলিগ্রাফের চাইতে বেশী খবর পাওয়া গেল কারডিওগ্রাফে। কারডিওগ্রাফের চাইতে দশগুণ বেশী সংবেদনশীলতা ধরা পড়ল এনকেফালোগ্রাফে (যা ব্রেনের তড়িৎ-প্রবাহ মাপার জন্যে ব্যবহার করা হয়)।

এরপর ভাগ্যক্রমে গবেষণার নতুন দিগন্ত দেখতে পেলেন ব্যাকস্টার। একদিন একটা কাঁচা ডিম ভেঙে তাঁর কুকুরকে খাওয়াতে যাচ্ছেন, কষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল উদ্ভিদে লাগানো পলিগ্রাফে। পরের দিনও দেখা গেল সেই একই কাণ্ড। ডিমের অনুভূতি কি হয়, দেখবার কৌতূহল নিয়ে গ্যালভানোমিটার লাগিয়ে দিলেন ডিমের সঙ্গে।

ন ঘণ্টা ধরে রেখাচিত্র আঁকা হল গ্রাফপেপারে। মুরগীছানার ভ্রূণে যে রকম হৃদ্‌স্পন্দন লক্ষিত হয়, অনুরূপ ছন্দের স্পন্দন আঁকা হয়ে গেল গ্রাফপেপারে। ডিমটা ভেঙে ভেতরে এমন কোনো রক্তসংবহনতন্ত্র দেখতে পেলেন না যার ফলে এমন স্পন্দন সম্ভব। হতভম্ব হয়ে গেলেন ব্যাকস্টার। বিজ্ঞান যে-শক্তিক্ষেত্রের

সন্ধান পায়নি এখনো, আচম্বিতে কি তার হদিশ পেলেন তিনি ?

কারডিওগ্রাফে একটা ডিম রেখে অফিস ঘরের অন্য প্রান্তে ফুটন্ত জলে ফেললেন একটা ডিম। প্রথম ডিমটা তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল দ্বিতীয় ডিমের মৃত্যুতে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই আবিষ্কারের পর সাময়িকভাবে উদ্ভিদ গবেষণা শিকেয় তুলে রেখেছিলেন ব্যাকস্টার। প্রাণের উৎস-সম্ভাবনা নিয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ রচিত হতে পারে এই বিষয়ের ওপর।

উদ্ভিদের যান্ত্রিক ব্যবহার

এরপরেই উদ্ভিদের এই যোগাযোগ-রহস্য নিয়ে তদন্তে নামলেন পিয়েরি পল সভিন। নিউ জার্সির ওয়েস্ট প্যাটার্সনের ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইনি। রেডিওতে ব্যাকস্টারের একটা সাক্ষাৎকার ইনি হঠাৎ শুনে ফেলেছিলেন।

ই-এস-পি এবং দূরনিয়ন্ত্রিত সম্মোহন নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সভিন। নিজে ইঞ্জিনীয়ারও ছিলেন। চাকরী করতেন বড় বড় কয়েকটা কোম্পানীতে। একটা কোম্পানীর নাম এরোস্পেস অ্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল টেলিফোন অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ।

লঙ জন ছিলেন পেশাদার সন্দেহবাদী। উদ্ভিদের প্রাথমিক অনুভূতি আছে, এই ব্যাপারে কয়েকটা ব্যবহারিক প্রয়োগের বর্ণনা শুনতে চেয়েছিলেন ব্যাকস্টারের কাছে এবং তাঁকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিলেন। ব্যাকস্টার বলেছিলেন, বিপজ্জনক অঞ্চলে জঙ্গল-যুদ্ধের সময়ে স্থানীয় গাছগুলোকে বিপদসংকেত জানানোর কাছে লাগাতে পারে সৈন্যরা। একই তার দিয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে গাছে গাছে—অতর্কিত আক্রমণ তাহলে এড়োনো যাবে। ব্যাকস্টার আরও বলেছিলেন, উদ্ভিদকে দিয়ে যান্ত্রিক পন্থায় একটা ছোট ইলেকট্রিক ট্রেনও চালানো যায়। মানুষের ভাবাবেগের হুকুম ছাড়া আর কোনো হুকুমে উদ্ভিদরা কিন্তু ট্রেন চালাবে না। সম্ভাবনাটা যদিও অবাস্তব, কিন্তু মনে ধরেছিল সভিনের। শুরু করেছিলেন এক্সপেরিমেণ্ট।

অদ্ভুত একটা দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন সভিন। তাঁর অধিকাংশ আবিষ্কারের অন্তর্দৃষ্টি আর আইডিয়া আসে নাকি অতীন্দ্রিয় ঝলক থেকে। ঠিক যেন মিডিয়াম হিসেবে বসে থাকেন উনি—সূক্ষ্ম জগতের ধ্যানধারণা এসে পেঁছোয় তাঁর চেতনায়। অনেক সময়ে একটা আবিষ্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির বিবরণ ঝলক মারফৎ মাথায় উদিত হলেও বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারেন না—পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি, তা ধরতে পারেন না, 'ঊর্ধ্বস্তরের সত্তা'কে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়। হাই ভোল্টেজ জেনারেটরের সাহায্যে নিজের শরীরের মধ্যে দিয়ে ২৭,০০০ ভোল্ট চালিয়ে

দিতেন, এবং দূর থেকেই হিলিয়াম-ভর্তি একটা বড় বাল্বকে সক্রিয় করতেন—তাঁর প্রশ্নের জবাবে ছায়াচ্ছন্ন বলয়গুলো কখনো এক-একদিকে ছুটে যেত। সম্মোহনে একান্তই অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে গ্যারাণ্টি দিয়ে হিপনোটাইজ করার একটা পন্থাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। গাঢ় আঁধারে ঢাকা ঘরের মধ্যে একটা নড়বড়ে মঞ্চ আর রামধনু প্যাটার্নের আলো দুলিয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিটিকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করতেন।

এই অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি দক্ষতা ছিল বলেই উদ্ভিদের মারফৎ নিজের চিন্তা আর আবেগকে সম্প্রচারিত করে খেলনার ইলেকট্রিক ট্রেনকে সামনে ছুটিয়ে ফের ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন সভিন। এরপরে নিউ জার্সির ম্যাডিসনে দর্শকদের সামনে সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যাপার তিনি দেখিয়েছিলেন তো বটেই, টেলিভিশন স্টুডিওর Klieg আলোর তলায় ইচ্ছামত ট্রেনের চলা এবং থামাও দেখিয়েছিলেন। লাইন বরাবর ইঞ্জিন চলতে শুরু করলেই একটা সুইচকে সক্রিয় করত সেই ইঞ্জিন এমনভাবে যে ইলেকট্রিকের জোরালো শক্ এসে লাগত সভিনের দেহে—সুইচের সঙ্গে যোগাযোগ থাকত অবশ্য তাঁর দেহের। লাইনের সামনে থাকত আর একটা সুইচ, তার দিয়ে যুক্ত থাকত একটা গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে—গ্যালভানোমিটার লাগানো থাকত মামুলি একটা ফিলোডেনড্রনের সঙ্গে। ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে সভিনের ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়ায় গ্যালভানোমিটারের কাঁটা লাফ দিয়ে টিপে দিত সুইচটা, উল্টো দিকে চালু হত ইঞ্জিন। শক্ খাওয়ার অনুভূতিটা মনে রাখতেন সভিন। এরপর তিনি তা প্রক্ষেপ করতেন গাছের দিকে সুইচ সক্রিয় করার জন্যে।

প্যারাসাইকোলজিতে সভিনের আগ্রহ দীর্ঘ দিনের। মানুষের ভাবনাচিন্তা-ভাবাবেগে গাছের সাড়া দেওয়ার মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বিলক্ষণ উত্তেজিত হয়েছিলেন। এমন একটা নিরেট পন্থা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যা যে-কোনো মানুষ সক্রিয় করতে পারবে। উদ্ভিদদের চৈতন্য থাকুক আর না থাকুক, সভিনের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে মানবদেহ থেকে যে এনার্জি ফিল্ড ঠিকরে বেরোয়, তার সঙ্গে উদ্ভিদ-সঞ্জাত এনার্জি ফিল্ডের মিল আছে এবং দুই ফিল্ডকে মিলিয়ে মিশিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। সমস্যা শুধু নির্ভরযোগ্য পন্থায় এই ব্যাপারের সুবিধাটুকু গ্রহণের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা। কারিগরি বিষয়ের লেখক ছিলেন বলে বহু পত্রপত্রিকায় টেবিল ভরে থাকত সভিনের। 'পপুলার ইলেকট্রনিক্স' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ে তিনি চমৎকৃত হলেন। প্রবন্ধটা একটা অস্বাভাবিক ইলেকট্রনিক সার্কিট এবং বিদেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত। এল জর্জ লরেন্স নামক এক রহস্যময় লেখক লিখেছিলেন প্রবন্ধটা। ট্রেনিং

দেওয়া বেড়ালকে নিয়ে শূন্য থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা লক্ষ্যভেদ করার একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল সোভিয়েতরা। জর্জ লরেন্স অনুপ্রাণিত হল প্রাণী-নিয়ন্ত্রিত এই পন্থায়। একই উদ্দেশ্যে ট্রেনিং দেওয়া উদ্ভিদদেরও কাজে কাজে লাগানো যায় কিনা এই সম্ভাবনার কথা সভিন লিখেছিলেন তাঁর প্রবন্ধে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে এমন একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন যা দিয়ে আশা করলেন উদ্ভিদের শক্তিক্ষেত্রের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তনও মাপতে পারবেন। ব্যাকস্টারের গ্যালভানোমিটারে যে সংবেদনশীলতা ধরা পড়েছে, তার একশগুণ বেশি সংবেদনশীলতা ধরা পড়বে তাঁর যন্ত্রে এবং ইলেকট্রনিক 'শব্দ' বাদ দেওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে।

ভোল্টেজ অ্যামপ্লিচিউড নয়, সভিন এবার মাপতে বসলেন দুটো প্রবহমান ভোল্টেজের মাঝের সূক্ষ্ম ফাঁকটুকু। উদ্ভাবন করলেন একটা সাধারণ আলো কমিয়ে দেওয়ার সুইচ, যার সুইচ হয়ে রইল উদ্ভিদের একটা পাতা, বাইরের প্রভাবে বা উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া অনুসারে—পাতার মধ্যে রেসিসট্যান্স কমা বাড়ার সঙ্গে একটা আলো উজ্জ্বল হবে, আবার নিষ্প্রভ হবে।

চব্বিশ ঘণ্টা গাছপালার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন সভিন এই যন্ত্র দিয়ে। উদ্ভিদদের লাগিয়ে রাখলেন একটা অজ্‌জিলোস্কোপের সঙ্গে যে যন্ত্রের বিরাট সবুজ চক্ষুটাকে দেখতে ইংরেজি ৮-য়ের মত (৪) ; উদ্ভিদের তড়িৎ-প্রবাহ কমা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসদুটোর আকার পালটে যেত। মনে হত যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা প্রজাপতি।

একই সঙ্গে একটা কমা বাড়া আওয়াজও শোনা গিয়েছিল—কম্পনের সামান্য পরিবর্তনও টের পেয়েছিলেন সভিন। ধরতে পেয়েছিলেন কি রকম প্রতিক্রিয়া চলছে উদ্ভিদদের মধ্যে। টেপরেকর্ডারে ধরে রেখেছিলেন কমা বাড়া আওয়াজটা—সেইসঙ্গে ধরা পড়েছিল সেকেন্ডে সেকেন্ডে আন্তর্জাতিক সময় সংকেতের একঘেয়ে বীপ বীপ ধ্বনি। স্টপওয়াচের সাহায্যে দূর থেকে পুরো ব্যাপারটা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

যন্ত্রপাতিগুলো অদ্ভুত নিঃসন্দেহে। সব চাইতে বিচিত্র হল স্বয়ংক্রিয় একটা যন্ত্র যা টেলিফোনের জবাব দিয়ে যাবে নিজে থেকে এবং কথাবার্তা রেকর্ড করেও রাখবে। রোজকার চাকরীর ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েক বছর ধরে বেনামে নানান পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করছিলেন ভদ্রলোক। একটা মৌলিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন যার সাহায্যে কাজ করতে করতেই সম্পাদকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতেন, তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতেন। পায়ে বাঁধা থাকত একটা ছোট্ট রেডিও ট্রান্সমিটার ; বাড়ীতে থাকত স্বয়ংক্রিয় টেপরেকর্ডারে আগে থেকেই টেপ করা বাঁধা ধরা কয়েকটা বুলি—একাধিক টেপরেকর্ডার রাখতেন এই

উদ্দেশ্যে। অফিস টেবিলে বসে বাড়ীর টেলিফোন মারফৎ খবর নিতেন, জবাবও দিতেন এই পদ্ধতিতে। টেলিফোনের কাছে রাখা ছোট একটা পকেট চিরুনিতে আঙুল বুলোলেই টেলিফোনের বক্তার শব্দ তরঙ্গ বিচার করে বক্তা কে, তা জানতে পারতেন।

উদ্ভিদদের সঙ্গে দূরনিয়ন্ত্রিত এই পন্থায় ভাববিনিময় করতে সক্ষম হলেন সভিন; সরাসরি বাড়ীর টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতেন। কমা বাড়া আওয়াজটা শুনে বুঝতে পারতেন গাছেদের প্রতিক্রিয়া কি ধরনের এবং যেখানেই থাকুক না কেন, এই আওয়াজ শুনে বাড়ীর আলো, রঙ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। সুইচ পদ্ধতিটাকে আরো উন্নতমানের সংবেদনশীল করার জন্যে আশা ছিল উদ্ভিদদের দিয়ে একটা আলো জ্বালিয়ে নেবেন এবং কাঁচের শিশির মধ্যে দিয়ে কিছু জীবাণুদের ছুটোছুটি বাড়িয়ে দিয়ে আর একটা সুইচ চালু করে দেবেন।

উদ্ভিদদের গায়ে ইলেকট্রোড বসিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে আস্তে আস্তে সভিন বুঝলেন, যে-সব উদ্ভিদদের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা বিশেষ রকমের, তাদের কাছ থেকেই সাড়া পাবেন তিনি বেশী। নিজেকে আচ্ছন্ন রেখে গাছের পাতায় আলতো করে হাত দিয়ে অথবা পাতায় জলসিঞ্চন করতে করতে গাছটার মঙ্গল কামনা করতেন। ব্যাকস্টারের মত তিনিও লক্ষ্য করলেন, কাছাকাছি কোনো জীবন্ত কোষের মৃত্যুতে, বিশেষ করে নরদেহের কোষের মৃত্যুতে, প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় উদ্ভিদ দেহে।

আরও দেখলেন, নিজের দেহে মৃদু ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবে সংকেত প্রবেশ করানো যায় উদ্ভিদ দেহে এবং সহজতম এই পন্থায় সাড়া পাওয়া যায় জোরালো রকমের। শরীরে সঞ্চিত স্থির তড়িৎকে মাটিতে চালিয়ে দিতেন ধাতুর টেবিল ছুঁয়ে—কয়েক মাইল দূরে তাঁর গাছেরা সাড়া দিত তৎক্ষণাৎ। ট্রেন এক্সপেরিমেণ্ট থেকে যা জেনেছিলেন, ইলেকট্রিক এক্সপেরিমেণ্ট করেও সেই একই তথ্যে উপনীত হলেন সভিন—আশি মাইল দূরের হলিডে কটেজ থেকে কোনো বিশেষ অনুভূতিকে স্মরণ করতে পারলে অথবা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলেই প্রতিক্রিয়া জাগে তাঁর উদ্ভিদদের মধ্যে।

বহু সমস্যার মধ্যে সভিনের একটা সমস্যা ছিল দিন কয়েক বাইরে থাকার সময়ে গাছগুলোর সঙ্গে নিজেকে জোরালো ভাবে সংযুক্ত রাখা—পরিপার্শ্বের চেয়ে যেন তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগটা বেশী থাকে গাছেদের। দূর পাল্লার টেলিফোন করার চাইতে অন্য কোনো পন্থায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণের দরকার হয়ে পড়ল এই কারণেই। নিজের দেহের বা নিজের এনাজ ফিল্ডের কোনো ক্ষতি ঘটলেই গাছেরা সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত বলে গাছেদের উপস্থিতিতে নিজের

দেহের কয়েকটা কোষ দূরনিয়ন্ত্রিত পন্থায় তিনি মেরে ফেলার এক্সপেরিমেন্টে হাত দিলেন। কাজ যা হল তা সত্যই প্রশংসনীয়! দীর্ঘদিন সজীব থাকতে পারে এমনি কোষ জোগাড় করা নিয়েই যা একটু অসুবিধে দেখা গেল। রক্ত কাজ দিল ভালই, চুলকে মারা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সব চাইতে ভাল কাজে এল শুক্রকীট। রক্তপাত ঘটানোর চাইতে শুক্রকীট সংগ্রহ করা সোজা এবং কম যন্ত্রণাদায়ক—ব্যাখ্যাটা সভিনের।

এই এক্সপেরিমেন্ট থেকেই সভিনের মনে হল যন্ত্রণা আর আঘাতে গাছেরা যদি বিচলিত হয়, আনন্দ আর আরামবোধের ভাবাবেগে সাড়া দেবে না কেন? অচিরেই দেখলেন অনুমান তাঁর অভ্রান্ত। আনন্দ আরামবোধেও সাড়া দিচ্ছে তাঁর গাছেরা—তবে তেমন জোরালোভাবে নয়—সুইচ চালু করে দেওয়ার মত প্রতিক্রিয়া নয়। দমে না গিয়ে আরো বেপরোয়া এক্সপেরিমেন্টে নামবেন ঠিক করলেন সভিন। আশি মাইল দূরে এক বান্ধবীকে নিয়ে যৌন সুখ উপভোগ করলেন। অতদূর থেকেও গাছেরা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যৌন সুখের তালে তালে এবং চূড়ান্ত মাত্রায় পেঁছোলো চরমানন্দের সময়ে। আশি মাইল দূরে বসে যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, তা ধরা পড়েছিল গাছেদের দেহে।

পরকীয়া প্রেমে অভ্যস্ত স্বামীদের ওপর নজর রাখার পক্ষে এক্সপেরিমেণ্টটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। বাড়ীতে টবে বেগোনিয়া রেখে দিলেই হল। কিন্তু বাজারে ছাড়ার মত যন্ত্র তো আবিষ্কার করতে পারেন নি সভিন। তাঁর পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যভাবে সুইচ চালু হওয়া তখনও বেশ মুস্কিলের ব্যাপার। হঠাৎ জানলায় কোনো পাখীর আবির্ভাবে, অথবা ঘরের মধ্যে বেড়াল ঢুকে পড়লে, সার্সিতে পোকামাকড় ঠোক্কর মারলে গাছেদের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া গেল না। তাই তিনি তিনটি উদ্ভিদে তার লাগিয়ে অন্য একটা ঘরে অন্য পরিবেশে রাখলেন—একই তারের গায়ে পর-পর লাগানো রইল তিনটি গাছ—যাতে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াটা বেশ জোরদার হয়। অন্য পরিবেশে রাখলেও গাছেদের উদ্দীপনা মিলেমিশে জোরদার হবেই, এমন তো কথা নেই। একই উদ্দীপক তিনটে গাছকেই সমানভাবে বিচলিত না-ও করতে পারে—অথবা তিনটের প্রত্যেকেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেরকম সম্ভাবনাও সুনিশ্চিত নয়।

মার্কনি বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কার করে সাড়া ফেলেছিলেন। সভিন দেখলেন, তাঁর এই আবিষ্কারও কম যায় না। পুরো ব্যাপারটাকে বিজ্ঞান মহলে তুলে ধরা দরকার। কিন্তু 'সায়েন্স' বা 'সায়েণ্টিফিক আমেরিকান'য়ের রক্ষণশীল পত্রিকার আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পেরে ধরলেন মেক্যানিক্যাল আর ইঞ্জিনীয়ারিং জার্নাল—যে-সব পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। একটা গাড়ী-পত্রিকার সম্পাদকের আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে চমকদার একটা গল্পও বানিয়ে ফেললেন। দূর থেকে গাছের

মাধ্যমে নাকি গাড়ী স্টার্ট করতে পারেন তিনি। চিন্তার ঢেউটা কেবল গাছের কাছে পাঠিয়ে দিলেই হল। ছোট্ট রেডিও ট্রান্সমিটার দিয়ে জিনিসটা করা খুব সহজ, মুস্কিল কেবল এমন একটা যন্ত্র তৈরী করা যা ইগনিসন চাবির ওপর সঠিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে, একবার ব্যর্থ হলে নতুন চাপ দেবে, ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলেই চাপ সরিয়ে নেবে। সাধারণ নাগরিকদের ভালই লেগেছিল ডিজাইনটা। শীতের ভোরে ব্রেকফাস্টের টেবিলে আরামে বসে থেকে শুধু মন দিয়ে হুকুম দিয়ে যদি ইঞ্জিন চালু করে তা গরম রাখা যায়, মন্দ কী! কিন্তু সভিনের গোটা পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল কেবল এক জায়গায়। এত এলাহি কাণ্ডকারখানার মধ্যে গাছের তো কোনো দরকারই হয় না—সরাসরি রেডিও মারফৎ কাজ সারা যায়।

আরও একটা চমৎকার পদ্ধতির কথা ভাবলেন সভিন। তুষার ঝরা রাতে বাড়ী ফিরে এসে পোষা ফিলোডেনড্রন গাছকে হুকুম দিয়ে গ্যারেজের দরজা খোলাবেন তিনি। প্রভুর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম সে শুনবে না—চোরের খপ্পর থেকে বাঁচা যাবে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে উপযুক্ত গবেষণাগার নির্মাণের টাকা সংগ্রহের জন্য সভিনের মাথায় এল নতুন একটা আইডিয়া। কেবলমাত্র চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে গাছেদের সাহায্যে এরোপ্লেন ওড়াবেন তিনি। এরোপ্লেনের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সঙ্গে লাগানো থাকবে উদ্ভিদেরা। পাইলটের লাইসেন্স ছিল সভিনের। রেডিও দিয়ে মাটি থেকে নিয়ন্ত্রণ করে মডেল প্লেন উড়িয়েছেন, ডিগবাজী খাইয়েছেন, শূন্যে অনেক খেলা দেখিয়ে ফের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। সমস্ত বেতার সংকেতের সাহায্যে। প্লেনের ডানার বিস্তার ছিল ছ-ফুট পর্যন্ত। ট্রান্সমিটারের সামান্য উন্নতি সাধন করে নিয়ে গাছের কাছে চিন্তা প্রক্ষেপ করে প্লেনটাকে দিয়ে এই ধরনেরই খেলা দেখালেন সভিন।

এয়ারপোর্টের কোনো প্লেনে ওঠবার আগেই প্লেন-লুঠেরা কেউ ঘাপটি মেরে আছে কিনা, গাছেদের সংবেদনশীলতার মাধ্যমে তাও ধরে ফেলার পন্থা ভাবলেন সভিন। সিকিউরিটির অফিসাররা হাইজ্যাকারকে যখন জেরা নিয়ে তন্ময়, ঠিক তখন গাছেদের গায়ে গ্যালভানোমিটার, ঘুরন্ত চুম্বক এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি লাগিয়ে প্লেন-লুঠেরার মানসিক অস্বস্তি ধরে ফেলার একটা পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেন। পদ্ধতিটার নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন স্কাইজ্যাক'।

বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে গাছেদের না লাগিয়ে রেখে গাছেদের মাধ্যমেই মানুষের ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া ধরবার একটা কৌশল যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনী এর আগেই উদ্ভাবন করেছে। ভার্জিনিয়ার ফোর্ট বেলভয়ের-য়ে টাকাকড়িও জুটে গেছে এই ব্যাপারে গবেষণার জন্যে। যুক্তরাষ্ট্র নৌদপ্তরও আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ব্যাকস্টারের এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে পরীক্ষা করে কিছু সফলতা অর্জন করেছে মেরী-ল্যাণ্ডের সিলভার স্প্রিংয়ের নৌ-অস্ত্র গবেষণাগার। গাছের ক্ষতি করার চিন্তা-টুকুই কেবল মাথায় আনলে পলিগ্রাফের কাঁটা লাফিয়ে ওঠে দেখা গেছে। জল, ইনফ্রা-রেড, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, আগুন, শারীরিক চাপ এবং অঙ্গচ্ছেদ এই সব গাছের ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, উপরোক্ত গবেষণাগারে তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। গবেষণা করেছেন এলডন বায়ার্ড।

বায়ার্ডের বিশ্বাস, পাতার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বাধাপ্রাপ্ত হলেই যে গ্যালভানো-মিটারে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তা ঠিক নয়। আসলে কোষেদের নিজস্ব শক্তির তারতম্য ঘটে বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে। সুইডেনের ডক্টর কার্লসন দেখিয়েছিলেন একগুচ্ছ কোষ কিভাবে মেরু পরিবর্তন করে; কিন্তু কোন্ এনার্জির জোরে তা হয়, বুঝতে পারেন নি। বায়ার্ডের বিশ্বাস, কোষদের ভোল্টেজ পরিবর্তনটাই কেবল মাপা হচ্ছে—গাছেদের চেতনা এই পদ্ধতি দিয়েই শক্তির পরিবর্তন সূচনা করে নিজেদের মধ্যে।

ব্যাকস্টারের গবেষণালব্ধ ফলাফল সমর্থন করেছিল বায়ার্ডের গবেষণা; গাছেদের পরিপার্শ্বস্থ কোনো প্রাণীর ভাবাবেগে সাড়া দিয়েছে গাছেরাও। অতিরিক্ত চাপে গাছেরাও যেন অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন আলো বা তাপের মত মূল উদ্দীপকও আর সাড়া জাগাতে পারে না তাদের মধ্যে। ব্যাকস্টার আর সভিনের মত বায়ার্ডও টেলিভিশনে হাতে কলমে দেখিয়েছিলেন গাছকে পুড়িয়ে দেবার ইচ্ছাটা মাথায় আনলেই কি রকম চঞ্চল হয় তারা—আরও অনেক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন টেলিভিশনের পর্দায়। গাছের সামনে সেকেণ্ড খানেকের জন্যে মাকড়শা নাড়লে গাছেরা প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে দীর্ঘক্ষণ। অন্য গাছের পাতা কেটে নিলে আরেক গাছ সৃষ্টি করে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস ইভ্যালুয়েটর নামে যুগান্তকারী নতুন ধরনের একটা মিথ্যা-জ্ঞাপক পদ্ধতি হাতে পেয়েছিলেন বায়ার্ড। থিওরীটা এই: মানুষের কণ্ঠস্বরে শোনা-যায় এবং শোনা-যায়-না, এই দুই-ধরনের শব্দ-তরঙ্গই থাকে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকলে, শোনা-যায়-না শব্দ-তরঙ্গ কণ্ঠস্বর থেকে উধাও হয়। কানে তা ধরা না পড়লেও, যান্ত্রিক উপায়ে রেখাচিত্রে তারতম্যটা ফুটিয়ে তোলা যায়। বায়ার্ড ঠিক করলেন, গাছের সঙ্গে যোগসাজসে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগাবেন।

জাপান এই ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগোলো। উদ্ভিদ রাজ্যে এতবড় গবেষণা আর হয়নি। জাপানী পুলিশের মিথ্যা-জ্ঞাপক বিশেষজ্ঞ ডক্টর কেন হাশিমোতো পলিগ্রাফের সঙ্গে আকুপাংচারের ছুঁচ দিয়ে একটা ক্যাকটাস গাছ লাগিয়ে মিথ্যা পাকড়াও করার ব্যবস্থা করলেন। ভদ্রলোক ব্যাকস্টারের গবেষণা

পড়ে দারুণ প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ব্যাকস্টার, সভিন বা বায়ার্ডের চাইতেও তাঁর ইচ্ছেটা ছিল আরও বিপ্লবাত্মক। একটা টেপরেকর্ডারে কেবল সন্দেহভাজনের কথাবার্তা ধরে নিতেন। ইলেকট্রনিক্স কায়দায় তা বিবর্ধিত করতেন। তারপর রেখাচিত্রে স্বরতরঙ্গ কিভাবে উঠছে নামছে, তা ফুটিয়ে তুলে এমন প্রমাণ হাজির করতেন যা জাপানী আইন আদালতে গ্রাহ্য হত।

ওঁর বিপ্লবাত্মক ইচ্ছেটা ছিল এই ঃ গাছের সঙ্গে সত্যি সত্যিই কথাবার্তা বলবেন।

ইচ্ছেটা বাস্তবায়িত করার জন্যে ওঁর আগেকার পদ্ধতিটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নেবেন ঠিক করলেন। তাহলেই রেখাচিত্রর বদলে শব্দ শোনা যাবে, যে-শব্দ কখনো উঠবে, কখনো নামবে। গাছ পাবে কণ্ঠস্বর। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার দানবিক সাগুয়ারো আর আরিজোনা মরুভূমির ক্যাকটাসের অনুরূপ ছোট একটা ক্যাকটাস নিয়ে প্রথম যে এক্সপেরিমেণ্ট করলেন, তা ব্যর্থ হল। তবে কি ওঁর যন্ত্রপাতি এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী, না, উনি নিজে দায়ী? যদিও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-বিষয়ক গবেষণায় ডক্টর হাসিমোতো ছিলেন জাপানের শীর্ষস্থানীয়।

খুব রাগ হয়ে গেল হাশিমোতোর। ওঁর স্ত্রী কিন্তু গাছপালা ভালবাসতেন। আশ্চর্য ফলাফল পাওয়া গেল এঁকে দিয়েই। ক্যাকটাসকে বললেন হাশিমোতো-গৃহিণী—ভয় কি! আমি বড্ড ভালবাসি তোমাকে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল ক্যাকটাসের দিক থেকে। ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে দিয়ে সেই 'সাড়া'র পরিবর্তন সাধন ঘটানো হল, বিবর্ধিত করা হল। যে শব্দ সৃষ্টি করল ক্যাকটাস মহাশয় তা অতি উচ্চনিনাদী শব্দ—অথচ সঙ্গীতের মত সুখশ্রাব্য, ছন্দ এবং সুর বিভিন্ন ধরনের। কখনো সখনো আনন্দে ভরপুর এবং মর্মস্পর্শী। দূরে থেকে হাই-ভোল্টেজ-তারে যে উচ্চনিনাদী গুঞ্জন শোনা যায়—অনেকটা সেই রকমের।

জন ফ্রান্সিস ডাওয়ারটি নামে এক তরুণ মার্কিন এই কথোপকথনের সাক্ষী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জাপানীজ ভাষার জবাব যেন ক্যাকটিজ ভাষায় দিয়ে গেছে ক্যাকটাস-টা। কুড়ি পর্যন্ত তাকে গুণতেও শিখিয়েছিলেন হাশিমোতো দম্পতী। দুই আর দুই যোগ করলে কত হয় জিজ্ঞেস করতেন; শব্দ মারফৎ জবাব দিত ক্যাকটাস। কালি দিয়ে আঁকা রেখা চিত্রে তা ফুটিয়ে তুললেই দেখা যেত চারটে স্পষ্ট এবং পরস্পর যুক্ত উঁচু-উঁচু চূড়া।

ডক্টর হাশিমোতো হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নন। টোকিও ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট তিনি। হাশিমোতো ইলেকট্রনিক রিসার্চ সেন্টারের কর্ণধার। ফুজি ইলেকট্রনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ-য়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং মূল গবেষকও বটে। শেষোক্ত

কোম্পানীই বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে গোটা টোকিওকে ঝলমলে করে রাখে। ক্যাকটাসের আরও অনেক ক্ষমতা সারা জাপানকে তিনি হাতেনাতে দেখিয়েছিলেন এই ঘটনার পর।

ডক্টর হাশিমোতো বিস্ময়করভাবে জনপ্রিয় লেখকও বটে। ওঁর বেস্ট-সেলার গ্রন্থ 'ইনট্রোডাক্‌সন টু ই-এস-পি'-র ষাটটা সংস্করণ হয়েছে, আশি সংস্করণ চলছে 'মিস্ট্রি অফ দ্য ফোর্থ ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড'' গ্রন্থের। ওঁর বিশ্বাস বর্তমান পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে বিশ্বজগতের সব কান্ডকারখানার ব্যাখ্যা করা যায় না। পদার্থবিজ্ঞান যে ত্রিমাত্রিক জগতের ব্যাখ্যা হাজির করে, তার বাইরে রয়েছে একটা চার-মাত্রিক জগৎ। অবস্তু জগৎ। ত্রিমাত্রিক জগতের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে এই চার-মাত্রিক জগৎ মনঃসংযোগের মারফৎ—যাকে কেউ কেউ বলেন সাইকোকাইনেসিস অথবা বস্তুর ওপর মনের প্রভাব। ত্রিমাত্রিক জগৎটা আসলে এই চারমাত্রিক জগতের ছায়া ছাড়া কিছুই নয়।

কথা-বলিয়ে এবং অংক-কষিয়ে ক্যাকটাসের কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যানা এইভাবেই উপস্থাপিত করেছিলেন ডক্টর হাশিমোতো।

গাছেরা মনের কথা ধরতে পারে

সৃজনক্ষম ব্যক্তি বলতে কি বোঝায় এই নিয়ে তখন ভাবনা চিন্তা করছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মার্সেল ভোগেল। সৃজনীক্ষমতা বিষয়টাই বাল্যকাল থেকে তাঁকে বড় ভাবিয়ে তুলেছিল। জোনাকির আলো ছেলেবেলায় দেখে অবাক হয়ে যেতেন। বড় বড় গ্রন্থাগারে এ ব্যাপারে কিছুই না পেয়ে মা-কে বলেছিলেন বিষয়টা নিয়ে একটা বই লিখবেন। দশ বছর পরে লিখেছিলেন সেই বই, যার বাংলা নাম 'কঠিন এবং তরল পদার্থে আলোকময়তা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ'। দু-বছর পরে সানফ্রান্‌সিসকোতে নিজের কোম্পানী গঠন করলেন ভোগেল। নাম দিলেন, 'ভোগেল লুমিনেস্‌সেন্স'। পনের বছরে অনেক বস্তু উৎপাদন করল এই কোম্পানী। টেলিভিশনের পর্দায় লাল রঙ দেখার কৌশল, আলোকময় ক্রেয়ন, পোকামাকড়দের সনাক্ত করার টিকিট, ছুঁচো-ইঁদুরদের মূত্র থেকে তাদের গোপন যাতায়াতের পথ নির্ণয়ের 'কালো আলো' এবং সাইকেডেলিক বর্ণসমূহ—আজ যা নব্য-কালের প্রাচীর পত্রে জনপ্রিয়।

১৯৫০ সালের পর একঘেয়ে কাজ ছেড়ে দিলেন ভোগেল। কোম্পানী বেচে দিলেন। আই-বি-এম'য়ের চাকরী নিলেন। চুম্বক, তরল ক্রিস্ট্যাল, চক্ষু-বৈদ্যুতিক পদ্ধতি নিয়ে বহু আবিষ্কার করলেন; কমপিউটরের বার্তা-ভাণ্ডারে রইল তাঁর বহু অবদান। পুরস্কার পেলেন অনেক।

এই চাকরী করার সময়ে সৃজনশীলতা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করে কর্মকর্তারা। একজন ছাত্র 'আরগোসি' পত্রিকায় ছাপা ব্যাকস্টারের একটা প্রবন্ধ তাঁকে দেখায়। প্রবন্ধটার নাম 'গাছেদের কি আবেগ-অনুভূতি আছে?' দেখেই পত্রিকাটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ভোগেল। ব্যাকস্টার যে পয়লা নম্বরের বুজরুক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাঁর। দিন কয়েক পরেই কিন্তু পত্রিকাটা ঝুড়ি থেকে উদ্ধার করেন এবং মতামত পালটে নেন।

সেমিনারে ছাত্রদের সামনে পড়ে শোনান প্রবন্ধটা। প্রবল হাসি টিটকিরি আরম্ভ হয়। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করলে মন্দ হয় না, এমন কথাও শোনা যায় সবার মুখে। সেইদিনই সন্ধ্যায় 'পপুলার ইলেট্রনিক্স' ম্যাগাজিনের সর্বশেষ সংখ্যাটির দিকে ভোগেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক ছাত্র। ব্যাকস্টারের একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ম্যাগাজিনে। ছিল একটা নক্শা। মাত্র পঁচিশ ডলার কি তার চাইতেও কম খরচ হবে নক্শা অনুযায়ী তারের যন্ত্রটা তৈরী করতে। যন্ত্রটার নাম 'সাইকো অ্যানালাইজার'। গাছেদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ এবং বিবর্ধনের যন্ত্র।

ছাত্রদের তিন দলে ভাগ করলেন ভোগেল। প্রত্যেক দলকে ব্যাকস্টারের পদ্ধতি অনুযায়ী এক্সপেরিমেণ্ট করতে চ্যালেঞ্জ জানালেন। নিজেও লেগে গেলেন। কিন্তু তিন দলের কেউই সফল হল না। হলেন কিন্তু নিজে। ব্যাকস্টার যা বলেছিলেন, দেখলেন ঠিক সেইভাবে গাছেরা পাতা ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আগেভাগে টের পায়, প্রবলতর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় শেকড় উপড়ে আনার বা পাতা পুড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকলে। সত্যি সত্যি পুড়িয়ে ফেললে তো কথাই নেই। ভোগেল অবাক হলেন—তিনি নিজেই কেবল সফল হলেন কেন এক্সপেরিমেণ্টে?

এগারো থেকে চোদ্দ বছর বয়েসে যা পেতেন, তাই পড়তেন ভোগেল। বিষয়টা ছিল অবশ্য মানুষের মন নিয়ে। মানুষের মন কাজ করে কি করে, জানার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। ম্যাজিক, প্রেততত্ত্ব, সম্মোহনী কৌশল—সমস্ত পড়েছিলেন; তরুণ হিপনোটিস্ট হিসেবে মঞ্চে খেলাও দেখিয়েছিলেন। মেসমারের সার্বজনীন তরল পদার্থ তত্ত্ব নিয়ে ক্ষিপ্তের মত পড়াশুনা শুরু করলেন। মেসমার বলেছিলেন, সার্বজনীন এই তরল পদার্থটির ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই শরীর খারাপ হয়, অসুখবিসুখ হয়। সেইসঙ্গে পড়লেন Cone'য়ের আত্ম-আদেশ তত্ত্ব—বিনা যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব এবং স্বাস্থ্যোন্নতির তত্ত্ব। 'সাইকিক এনার্জি' সম্পর্কেও পড়লেন গাদা গাদা বই। সাইকিক এনার্জি নামটা কার্ল জাঙ-য়ের। ফিজিক্যাল এনার্জি থেকে আলাদা হলেও সাইকিক এনার্জিকে সাধারণভাবে মাপা যায় না। ভোগেল ভাবলেন, সব এনার্জির মত সাইকিক এনার্জিকে কেন ভাঁড়ার-বন্দী করা যাবে না? কিন্তু রাখবেন কি ধরনের ভাঁড়ারে? আই-বি-এম ল্যাবোরেটরীতে সারি সারি সাজানো কেমিক্যালের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, এদের কোনো একটা

কি সেই ভাঁড়ার হতে পারে না ?

কিন্তু মনের ধাঁধা তো কাটল না। তাই পরামর্শ করলেন এক বান্ধবীর সঙ্গে। নাম তাঁর ভিভিয়ান উইলি। সহজাত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল বান্ধবীটির। ল্যাবোরেটরীতে এসে সব কটা কেমিক্যাল দেখবার পর উইলি মাথা নাড়লেন। উঁহু, এর কোনোটাই সাইকিক এনার্জিকে ধরে রাখার কাজে লাগবে না।

ভোগেল বললেন, আগেকার ধারণা ত্যাগ করা হোক। সহজাতভাবে যা মনে আসে, তাই বলুক না কেন উইলি। বান্ধবীটি তখন দুটো বৃক্ষপত্র তুলে নিলেন। একটাকে রাখলেন শোবার ঘরে বিছানার পাশের টেবিলে, আর একটাকে বসবার ঘরে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বিছানার পাশে রাখা পাতাটার দিকে চেয়ে মনে মনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতেন যেন পাতাটা বেঁচে থাকে। অন্য পাতাটাকে একদম ভাবতেন না।

একমাস পরে দেখা গেল সেই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড। ভোগেলকে এসে বললেন উইলি—'ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে শোবার ঘরের পাতাটা এখনো একদম তরতাজা—ঝকঝকে সবুজ। কিন্তু বসবার ঘরে পাতাটা শুকিয়ে বাদামী হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক আইন কানুনের আমরা যে খবর রাখি, তা লঙ্ঘন করে রহস্যজনক একটা শক্তি পাতাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

উত্তেজিত হলেন ভোগেল। ল্যাবোরেটরী উদ্যানের এল্‌ম্‌ বৃক্ষ থেকে তিনটে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ীতে এনে শোবার ঘরে রাখলেন কাঁচের ওপর পাশাপাশি। প্রতিদিন দুটো পাতার ওপর মনঃসংযোগ করে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন— মাঝের পাতাটিকে পাত্তাই দিলেন না। সাতদিন পরে দেখা গেল মাঝের পাতাটি শুকিয়ে বাদামী হয়ে গেছে—দু'পাশের পাতা দুটি বেশ সবুজ তাজা রয়েছে। এমন কি বোঁটা দুটোও যেন গাছ থেকে ছিঁড়ে আনার দরুন ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলেছে!

সাইকিক এনার্জি যে সক্রিয় হয়েছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না ভোগেলের। মনের শক্তি যদি গাছের পাতাকে সবুজ রাখতে পারে, তাহলে লিকুইড ক্রিস্ট্যালের ওপর তার ক্রিয়াকলাপ কি ধরনের হবে ভেবে মাথা খারাপ করার জোগাড় করলেন। এই নিয়েই আই-বি-এম ল্যাবোরেটরীতে গবেষণা করছিলেন ভদ্রলোক। মাইক্রোসকোপ দিয়ে সূক্ষ্ম জগৎ নিরীক্ষণে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। লিকুইড ক্রিস্ট্যালের শ-য়ে শ-য়ে কালার স্লাইড তুললেন, তিনশ গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত করলেন। স্লাইড প্রণয়নের সময়ে লক্ষ্য করলেন, 'মনটাকে আলগা' করে দিয়ে এমন সব তৎপরতা তিনি অনুভব করতে পারেন যা আণুবীক্ষণিক ক্ষেত্রে চোখে দেখা যায় না। চামড়ার চোখে যা অদৃশ্য, মনের চোখে তা ধরতে পারেন। সেই আলো নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের চোখে বা ক্যামেরার চোখে

বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন।

ওঁর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই : বিশুদ্ধ এনার্জির একটা পূর্ব আকৃতি বা ভৌতিক ভাবমূর্তির অস্তিত্ব থাকার দরুন লিকুইড ক্রিস্ট্যাল কঠিন বা ফিজিক্যাল আকার পরিগ্রহ করে—যে পিওর এনার্জি কঠিনাবস্থা আগেভাগে টের পায়। গাছেরা টের পায় মানুষের মনের ইচ্ছা—তাদের পাতা পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে মানব মনে দানা বাঁধলেই যেন সচকিত হয়; তাই যদি হয় তাহলে এই ইচ্ছে জিনিসটা এক ধরনের এনার্জি ফিল্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষান্তরে একেই কি বলা যায় না থট পাওয়ার? চিন্তা শক্তি?

১৯৭১ সালের শরৎকালে গাছ-গবেষণা শিকেয় তুলে রেখে মাইক্রোসকোপ এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন ভোগেল এবং একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন 'স্যান জোস মার্কারি' পত্রিকায়। ফলে টেলিফোনে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে পাগল হবার উপক্রম হলেন।

গাছেদের ওপর মানব ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে হলে যে ইলেকট্রোডটাকে পাতার সঙ্গে লাগিয়ে রাখার পদ্ধতিটার উন্নতি সাধন করা দরকার ভোগেল তা উপলব্ধি করলেন। ভুল হিসেব বা ইঞ্জিনীয়ারের 'শব্দ' বাদ দেওয়া দরকার—এই ভুলের জন্যে চার্টের ওপর পেন রেকর্ডার উল্টোপাল্টা তথ্য হাজির করে। ব্যাক্স্টার চিমটে দিয়ে ইলেকট্রোড আটকে দিতেন পাতায়। ভোগেল দেখলেন এতে পাতারা এলোপাথারি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ-কম্পন সৃষ্টি করে, পেন-রেকর্ডার এলোমেলোভাবে ছুটে যায়।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন ভোগেল। কিছু ফিলোডেনড্রনের প্রতিক্রিয়া দ্রুত, কারও কম, কারও ক্ষীণ। শুধু উদ্ভিদ নয়, পাতাগুলোরও প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে। যে সব পাতায় ইলেকট্রিক্যাল রেসিসট্যান্স বেশী, তাদের নিয়ে কাজ করা বেশী মুস্কিল। শাঁসালো পাতায় জলের ভাগ বেশী থাকে বলে এই ধরনের পাতায় ফলাফল দেখা যায় সবচেয়ে ভাল। গাছেরাও সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে পর্যায়ক্রমে, দিনের কোনো সময়ে থাকে পুরো-সক্রিয়, এমন কি মাসের বিশেষ সময়ে বৃদ্ধি পায় সক্রিয়তা। অন্য সময়ে যেন 'নেতিয়ে থাকে,' বিষণ্ণ থাকে।

আগার গঁদের আঠা আর নুন দিয়ে এক রকম জেলী তৈরী করে ইলেকট্রোডকে পাতার সঙ্গে আলগাভাবে লাগিয়ে দিতেন ভোগেল। চিমটে দিয়ে নয়। জেলী শুকিয়ে গেলে পাতার আর্দ্র অঞ্চলে ইলেকট্রোড ছুঁয়ে থাকত। চার্টে আঁকা হয়ে যেত টানা পরিস্কার লেখা—আঁকাবাঁকা দুলুনি কাঁপুনি একদম থাকত না। ইলেকট্রোডের ভুলভাল এইভাবে বাদ দিতে সক্ষম হলেন তিনি।

এরপর ১৯৭১ সালের বসন্তকালে ভোগেল কোমর বেঁধে লাগলেন নতুন

পর্যায়ের এক্সপেরিমেণ্টে—মানুষের মনের সঙ্গে ফিলোডেনড্রনের যোগাযোগটা ঠিক কোন সময়ে শুরু হচ্ছে, উন্নত ইলেকট্রোড সংস্থাপনের মাধ্যমে তা নির্ণয় করতে প্রয়াসী হলেন। গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে ফিলোডেনড্রন সংলগ্ন করে ইচ্ছাবর্ষণ করতেন—আঙুল দিয়ে পাতা ছুঁয়ে রেখে। যেন বন্ধুর ভাল চাইছেন। যতবার তা করতেন, ততবারই চার্টের ওপর পিন হোল্ডার উচ্চগামী রেখা এঁকে যেত পর্যায়ক্রমে। ঠিক সেই সময়ে তালুর ওপর একটা শক্তির ছোঁয়া অনুভব করতেন ভোগেল—গাছটা যেন এনার্জি উপুড় করে দিচ্ছে তাঁর তালুতে। তিন থেকে পাঁচ মিনিট পরে শত শুভেচ্ছা বর্ষণ করেও গাছের দিক থেকে আর শক্তিবর্ষণ অনুভব করতেন না—যেন নিঃশেষে সব এনার্জি ঢেলে দিয়ে ফুরিয়ে গেছে উদ্ভিদটা। ভোগেলের মনে হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে ফিলোডেনড্রনের সম্পর্কটা যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অথবা প্রণয়ীযুগলের দেখাসাক্ষাতের অনুরূপ—প্রথম মিলনেই আবেগ উচ্ছ্বাসের বন্যায় ভেসে যায়, তারপর শক্তির সঞ্চয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। প্রণয়ী যুগলের মতই হর্ষ আর তৃপ্তিতে ভরপুর থাকতেন ভোগেল আর উদ্ভিদ।

এক দঙ্গল উদ্ভিদের ওপর হাত বুলিয়ে বিশেষ সংবেদনশীল উদ্ভিদটিকে বার করতে পারতেন ভোগেল। প্রথমে সামান্য ঠাণ্ডা ভাব জাগত, তারপর পর-পর কয়েকটা তড়িৎ ধাক্কা অনুভব করতেন—যেন শক্তিশালী শক্তিক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছেন। তফাতে সরে গেলেও একই অনুভূতি জাগ্রত থাকত। প্রথমে যেতেন ঘরের বাইরে। তারপর আরও দূরে—আধ মাইল দূরে গিয়েও অনুভূতিটা টের পেয়েছেন। ব্যাকস্টারও এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন।

আর একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন ভোগেল। দুটো উদ্ভিদে তার লাগিয়ে সংলগ্ন করেছিলেন একই রেকর্ডিং মেশিনে। প্রথম উদ্ভিদের একটা পাতা ছিঁড়েছিলেন। দ্বিতীয় উদ্ভিদটায় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ঠিক তখনই যখন তিনি দ্বিতীয় উদ্ভিদের প্রতি মনঃসংযোগ করেছিলেন—নইলে নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে ভোগেল জেনেছিলেন, যোগ-গুরুরা অথবা জেন নামক ধ্যান বিদ্যায় পারদর্শীরা যখন ধ্যানস্থ থাকেন, আশপাশের বিরক্তিকর প্রভাবমুক্ত থাকেন। একই ব্যক্তিরা যখন দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকেন, তখন তাঁদের মস্তিষ্ক-তরঙ্গ ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাফে ধরে দেখা গেছে ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকাকালীন মস্তিষ্ক-তরঙ্গের অনুরূপ নয়। এই থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে।

চেতনার কোনো একটা অংশকে তিনি যখন 'ফোকাস' করছেন, উদ্ভিদদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছেন—উদ্ভিদদের চেতনায় তা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যাচ্ছে। দৈনন্দিন স্বাভাবিক চেতনাকে পরিহার করে যখনই সূক্ষ্ম চেতনাকে

প্রক্ষেপ করছেন গাছেদের ওপর, মনে মনে তাদের আশীর্বাদ করছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কামনা করছেন—অমনি নির্জীব অবস্থা কাটিয়ে উঠছে গাছেরা। মানুষ আর গাছ এই ভাবেই মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে এবং তৃতীয় কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়া গাছের মধ্যে দিয়েই মানুষের চেতনায় হাজির হচ্ছে। নিজেকে এবং গাছকে যুগপৎ সংবেদনশীল করতে তাঁর কখনো লেগেছে মাত্র কয়েক মিনিট, কখনো প্রায় আধঘণ্টা।

প্রক্রিয়াটার বিশদ ব্যাখ্যা চাইলে ভোগেল বলেছিলেন প্রথমে তিনি নিজের স্নায়বিক সাড়াগুলোকে প্রশান্ত করে আনেন—দেহযন্ত্রগুলোকে ধীরস্থির করার প্রয়াস পান, তারপরেই টের পান গাছ আর আর নিজের মধ্যে একটা শক্তিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সম্পর্কটা একবার স্থাপিত হলে গাছটা আর শব্দ, তাপমাত্রা, আশপাশের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এমন কি অন্যান্য গাছপালার প্রতিও যোগসূত্র সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায়—সাড়া দেয় কেবল ভোগেলের প্রতি—যেন সম্পর্কটা কেবল তাঁর সঙ্গেই অথবা যেন তিনি সম্মোহিত করেছেন উদ্ভিদ মহাশয়কে।

আত্মবিশ্বাস আসতেই বক্তৃতার আমন্ত্রণ অথবা টেলিভিশনে হাতেনাতে পরীক্ষার আহ্বান গ্রহণ করতে লাগলেন ভোগেল। একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এটা একটা ঘটনা ঃ উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে সক্ষম মানবকুল। উদ্ভিদরা জীবন্ত বস্তু, সংবেদনশীল শেকড় গেঁথে রেখেছে চতুর্দিকের বিস্তৃতির মধ্যে (rooted in space)। মানবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনায় তারা অন্ধ, বোবা, কালা হতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাবাবেগ পরিমাপের ক্ষেত্রে মনের দিক দিয়ে তারা নিরতিসীম সংবেদনশীল যন্ত্র। মানুষের পক্ষে উপকারী এনার্জি তারা বিকিরণ করে। ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব শক্তি-ক্ষেত্রে তারা শক্তির জোগান দেয়, বিনিময়ে উদ্ভিদ পায় শক্তির জোগান ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে।'

আরো বলেছিলেন ভোগেল, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা গাছেদের এবং নিজেদের এই ক্ষমতাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন। দরকার পড়লে তারা জঙ্গলে যায়। দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে পাইন গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের শক্তি নিজেদের শরীরে আহরণ করার জন্যে, শক্তির শূন্য ভাঁড়ার ভরিয়ে নেওয়ার জন্যে।

মাঝে মাঝে অবিশ্বাসী বা নিন্দুকের সম্মুখীন হতেন—রুখে দাঁড়াতো শ্রোতারা। ভীড়ের মধ্যে কারা তাঁর অনুকূলে তা ঠিক ধরতে পারতেন মনঃসংযোগ এবং বিকিরণ উপলব্ধি করে। তারপর যোগাভ্যাসের নিয়মে গভীর শ্বাস টেনে মনটাকে অন্য পরিবেশের ভাবমূর্তিতে সংস্থাপন করতেন।

জোরের সঙ্গে বলেছেন ভোগেল—'বৈরিতা বা প্রতিকূলতার অনুভূতি সম্পর্কে পাবলিক বক্তারা সবাই সচেতন। ভাব বিনিময়ের অন্যতম প্রধান অন্তরায় এই বৈরিতা বা প্রতিকূল মনোভাব। উদ্ভিদ এক্সপেরিমেণ্ট এই পরিবেশে অতি কঠিন

কাজ। উদ্ভিদ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এই বাধা কাটিয়ে উঠতে না পারলে—যতক্ষণ না অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসছে—গাছেরা কোনো সাড়াই আর দেয় না।'

উনি আরো বলেছেন—'গাছের প্রতিক্রিয়া বাইরের পরিবেশে ছড়িয়ে যাওয়ার আগে আমি যেন সেইসব প্রতিক্রিয়ার পরিশ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যাই। আমি স্তব্দ করতে পারি প্রতিক্রিয়াকে, আবার চালুও করতে পারি—যাতে উদ্ভিদ আর মানুষের পারস্পরিক ভাববিনিময় গড়ে ওঠে। আমার ভেতরকার কোনো এক এনার্জি দিয়ে উদ্ভিদকে শক্তিময় করে তুলতে পারি যে ধরনের সংবেদনশীলতা এই ধরনের কাজে একান্তই দরকার।

'উদ্ভিদের এই সাড়া দেওয়াটাকে যেন উদ্ভিদের ধীশক্তি বলে ভুল না করেন—আমার মনের মধ্যে উদ্ভিদ নিজেই যেন সম্প্রসারিত হয়। উদ্ভিদের জৈব তড়িৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগস্থাপনা সম্ভব হয়, অথবা এর মধ্যে দিয়েই তৃতীয় ব্যক্তির চিন্তাধারা আবেগ অনুভূতির নাগাল ধরা যায়।'

ভোগেলের সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কথায় এই ঃ

'যাবতীয় জীবন্ত বস্তুকে যে জীবনী শক্তি (Life force) বা মহাজাগতিক এনার্জি (Cosmic energy) ঘিরে রেখেছে, তাঁর অংশ নিতে পারে উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষ। এই অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়েই উদ্ভিদ আর মানুষ একাকার হয়ে যায়! এই একাকার হওয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ আর মানুষ যে শুধু পারস্পরিক ভাববিনিময়েই সক্ষম তা নয়—এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গাছের মাধ্যমে রেকর্ডিং চার্টেও ফুটিয়ে তুলতে পারে।'

উদ্ভিদ আর গাছের এনার্জি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, এই পর্যবেক্ষণে উপনীত হওয়ার পর ভোগেলের মাথায় নতুন মতলব এসেছিল। অসাধারণ সংবেদনশীল ব্যক্তির পক্ষে গাছের ভেতরে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হবে না কেন? ঠিক এই রকমটিই তো জানিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান অতীন্দ্রিয় বোদ্ধা জ্যাকব বোহ্মি। বয়স তাঁর কম। দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিলেন ভদ্রলোক, ত্রি-মাত্রিক জগৎ পেরিয়ে অন্য মাত্রিক জগতে নাকি অনুপ্রবেশ করতে পারতেন। বাড়ন্ত কোনো গাছের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আচমকা ইচ্ছে করলেই গাছটার সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। গাছেরই একটা অংশ হয়ে যেতেন। আলোর সন্ধানে গাছের জীবন সংগ্রাম উপলব্ধি করতে পারতেন। গাছের উচ্চাকাঙ্খার অংশ যেন নিজেও গ্রহণ করতে পারতেন এবং বাড়ন্ত পাতার আনন্দের ভাগ নিতে পারতেন।

ডেবি স্যাপ নামে একটি মেয়ে এসে একদিন দেখা করল ভোগেলের সঙ্গে। শান্তশিষ্ট মেয়ে। তাঁর ফিলোডেনড্রনের সঙ্গে চকিতের মধ্যে একাকার হয়ে যেতে পারে ডেবি। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সে প্রমাণও পাওয়া গেল।

প্রক্ষেপ করছেন গাছেদের ওপর, মনে মনে তাদের আশীর্বাদ করছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কামনা করছেন—অমনি নির্জীব অবস্থা কাটিয়ে উঠছে গাছেরা। মানুষ আর গাছ এই ভাবেই মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে এবং তৃতীয় কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়া গাছের মধ্যে দিয়েই মানুষের চেতনায় হাজির হচ্ছে। নিজেকে এবং গাছকে যুগপৎ সংবেদনশীল করতে তাঁর কখনো লেগেছে মাত্র কয়েক মিনিট, কখনো প্রায় আধঘণ্টা।

প্রক্রিয়াটার বিশদ ব্যাখ্যা চাইলে ভোগেল বলেছিলেন প্রথমে তিনি নিজের স্নায়বিক সাড়াগুলোকে প্রশান্ত করে আনেন—দেহযন্ত্রগুলোকে ধীরস্থির করার প্রয়াস পান, তারপরেই টের পান গাছ আর আর নিজের মধ্যে একটা শক্তিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সম্পর্কটা একবার স্থাপিত হলে গাছটা আর শব্দ, তাপ-মাত্রা, আশপাশের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এমন কি অন্যান্য গাছপালার প্রতিও যোগসূত্র সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায়—সাড়া দেয় কেবল ভোগেলের প্রতি—যেন সম্পর্কটা কেবল তাঁর সঙ্গেই অথবা যেন তিনি সম্মোহিত করেছেন উদ্ভিদ মহাশয়কে।

আত্মবিশ্বাস আসতেই বক্তৃতার আমন্ত্রণ অথবা টেলিভিশনে হাতেনাতে পরীক্ষার আহ্বান গ্রহণ করতে লাগলেন ভোগেল। একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এটা একটা ঘটনা ঃ উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে সক্ষম মানবকুল। উদ্ভিদরা জীবন্ত বস্তু, সংবেদনশীল শেকড় গেঁথে রেখেছে চতুর্দিকের বিস্তৃতির মধ্যে (rooted in space)। মানবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনায় তারা অন্ধ, বোবা, কালা হতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাবাবেগ পরিমাপের ক্ষেত্রে মনের দিক দিয়ে তারা নিরতিসীম সংবেদনশীল যন্ত্র। মানুষের পক্ষে উপকারী এনার্জি তারা বিকিরণ করে। ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব শক্তি-ক্ষেত্রে তারা শক্তির জোগান দেয়, বিনিময়ে উদ্ভিদ পায় শক্তির জোগান ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে।'

আরো বলেছিলেন ভোগেল, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা গাছেদের এবং নিজেদের এই ক্ষমতাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন। দরকার পড়লে তারা জঙ্গলে যায়। দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে পাইন গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের শক্তি নিজেদের শরীরে আহরণ করার জন্যে, শক্তির শূন্য ভাঁড়ার ভরিয়ে নেওয়ার জন্যে।

মাঝে মাঝে অবিশ্বাসী বা নিন্দুকের সম্মুখীন হতেন—রুখে দাঁড়াতো শ্রোতারা। ভীড়ের মধ্যে কারা তাঁর অনুকূলে তা ঠিক ধরতে পারতেন মনঃসংযোগ এবং বিকিরণ উপলব্ধি করে। তারপর যোগাভ্যাসের নিয়মে গভীর শ্বাস টেনে মনটাকে অন্য পরিবেশের ভাবমূর্তিতে সংস্থাপন করতেন।

জোরের সঙ্গে বলেছেন ভোগেল—'বৈরিতা বা প্রতিকূলতার অনুভূতি সম্পর্কে পাবলিক বক্তারা সবাই সচেতন। ভাব বিনিময়ের অন্যতম প্রধান অন্তরায় এই বৈরিতা বা প্রতিকূল মনোভাব। উদ্ভিদ এক্সপেরিমেণ্ট এই পরিবেশে অতি কঠিন

কাজ। উদ্ভিদ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এই বাধা কাটিয়ে উঠতে না পারলে—যতক্ষণ না অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসছে—গাছেরা কোনো সাড়াই আর দেয় না।'

উনি আরো বলেছেন—'গাছের প্রতিক্রিয়া বাইরের পরিবেশে ছড়িয়ে যাওয়ার আগে আমি যেন সেইসব প্রতিক্রিয়ার পরিশ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যাই। আমি স্তব্দ করতে পারি প্রতিক্রিয়াকে, আবার চালুও করতে পারি—যাতে উদ্ভিদ আর মানুষের পারস্পরিক ভাববিনিময় গড়ে ওঠে। আমার ভেতরকার কোনো এক এনার্জি দিয়ে উদ্ভিদকে শক্তিময় করে তুলতে পারি যে ধরনের সংবেদনশীলতা এই ধরনের কাজে একান্তই দরকার।

'উদ্ভিদের এই সাড়া দেওয়াটাকে যেন উদ্ভিদের ধীশক্তি বলে ভুল না করেন—আমার মনের মধ্যে উদ্ভিদ নিজেই যেন সম্প্রসারিত হয়। উদ্ভিদের জৈব তড়িৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগস্থাপনা সম্ভব হয়, অথবা এর মধ্যে দিয়েই তৃতীয় ব্যক্তির চিন্তাধারা আবেগ অনুভূতির নাগাল ধরা যায়।'

ভোগেলের সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কথায় এই ঃ

'যাবতীয় জীবন্ত বস্তুকে যে জীবনী শক্তি (Life force) বা মহাজাগতিক এনার্জি (Cosmic energy) ঘিরে রেখেছে, তাঁর অংশ নিতে পারে উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষ। এই অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়েই উদ্ভিদ আর মানুষ একাকার হয়ে যায়! এই একাকার হওয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ আর মানুষ যে শুধু পারস্পরিক ভাববিনিময়েই সক্ষম তা নয়—এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গাছের মাধ্যমে রেকর্ডিং চার্টেও ফুটিয়ে তুলতে পারে।'

উদ্ভিদ আর গাছের এনার্জি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, এই পর্যবেক্ষণে উপনীত হওয়ার পর ভোগেলের মাথায় নতুন মতলব এসেছিল। অসাধারণ সংবেদনশীল ব্যক্তির পক্ষে গাছের ভেতরে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হবে না কেন? ঠিক এই রকমটিই তো জানিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান অতীন্দ্রিয় বেত্তা জ্যাকব বোহ্‌মি। বয়স তাঁর কম। দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিলেন ভদ্রলোক, ত্রি-মাত্রিক জগৎ পেরিয়ে অন্য মাত্রিক জগতে নাকি অনুপ্রবেশ করতে পারতেন। বাড়ন্ত কোনো গাছের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আচমকা ইচ্ছে করলেই গাছটার সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। গাছেরই একটা অংশ হয়ে যেতেন। আলোর সন্ধানে গাছের জীবন সংগ্রাম উপলব্ধি করতে পারতেন। গাছের উচ্চাকাঙ্খার অংশ যেন নিজেও গ্রহণ করতে পারতেন এবং বাড়ন্ত পাতার আনন্দের ভাগ নিতে পারতেন।

ডেবি স্যাপ নামে একটি মেয়ে এসে একদিন দেখা করল ভোগেলের সঙ্গে। শান্তশিষ্ট মেয়ে। তাঁর ফিলোডেনড্রনের সঙ্গে চকিতের মধ্যে একাকার হয়ে যেতে পারে ডেবি। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সে প্রমাণও পাওয়া গেল।

গাছটা পুরোপুরি শান্ত যখন, ভোগেল জিজ্ঞেস করেছিলেন ডেবিকে—'এবার ঢুকতে পারেন গাছের মধ্যে ?' সায় দিয়েছিল ডেবি। ধীরস্থির শান্ত ভঙ্গিমায় বসেছিল কিছুক্ষণ—অদ্ভুত একটা নিরাসক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল চোখেমুখে—যেন এ জগতের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই—অন্য জগতে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আচমকা রেকর্ডিং পেন নড়ে উঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এঁকে গিয়েছিল ; যেন অস্বাভাবিক পরিমাণ শক্তি ঢুকছে গাছের মধ্যে।

সেদিন যা ঘটেছিল, ডেবি তা পরে লিখে রেখেছিল ঃ

মিঃ ভোগেল বললেন আমি যেন দেহমন শিথিল করে দিয়ে ফিলোডেনড্রনের দিকে নিজেকে প্রক্ষেপ করি। ওঁর অনুরোধ মত এলিয়ে দিলাম নিজেকে। পর-পর কয়েকটা ঘটনা ঘটল।

প্রথমেই বড় ভাবনা হল। গাছের ভেতরে ঠিক কি করে ঢুকব ভেবে পেলাম না। ঠিক করলাম কল্পনার সাহায্য নেওয়া যাক। কল্পনায় যেন দেখলাম মূল বোঁটার গোড়ায় একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছি। একবার ভেতরে প্রবেশ করার পর দেখলাম চলমান কোষদের। বোঁটার মধ্যে দিয়ে কোষ আর জল উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। ঊর্ধ্বস্রোতের মধ্যে ভিড়িয়ে দিলাম নিজেকে।

কল্পনায় ছড়িয়ে পড়া পাতাগুলোর দিকে এগোতে এগোতে অনুভব করলাম আমি যেন কল্প-দুনিয়া থেকে এমন একটা দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি যার ওপর আমার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মানসিক চিত্র আর পেলাম না। শুধু উপলব্ধি করলাম একটা বিস্তৃত প্রশস্ত উপরিভাগের অংশ হয়ে যাচ্ছি—ভরিয়ে তুলছি সেই অঞ্চলটা। ভাষায় তার বর্ণনা হয় না—বিশুদ্ধ চেতনা দিয়ে বুঝতে হয়। অনুভব করলাম গাছটা যেন আমাকে গ্রহণ করেছে। আমাকে আগলেও রেখেছে। সময়ের কোনো অনুভূতি আর রইল না। অস্তিত্ব আর চতুর্দিকের বিস্তৃতির (Space) সমাহার হয়ে গেলাম যেন আমি। হাসলাম স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে এবং নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এক হয়ে গেলাম গাছের সঙ্গে।

তারপর আমাকে শিথিল হতে বললেন মিঃ ভোগেল। তখন বুঝলাম আমি বড় ক্লান্ত। কিন্তু অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে মনটা। আমার সমস্ত এনার্জি চলে গেছে গাছের মধ্যে।

চার্টের ওপর রেকর্ডিংয়ের দিকে নজর রেখেছিলেন ভোগেল। মেয়েটি গাছের 'মধ্যে থেকে' বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলেন আচমকা থেমে গেল রেকর্ডিং পেন। পুনঃপ্রবেশ করে মেয়েটি কোষেদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছিল। ইলেকট্রোড একটা পাতাকে পুড়িয়ে দিয়েছে, সে খবরও এনেছিল। ভোগেল ইলেকট্রোড খুলে নিয়ে দেখেছিলেন কথাটা সত্যি। একটা পাতা প্রায় ফুটো হয়ে গেছে।

এক্সপেরিমেণ্টটা ডজন খানেক ব্যক্তিকে নিয়ে করেছিলেন ভোগেল এই ঘটনার পর। একটা মাত্র পাতার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রতিটা কোষ পর্যবেক্ষণ করে আসতে বলেছিলেন। কোষদেহের বিভিন্ন অংশের একই বিবরণ হাজির করেছিল প্রত্যেকে—এমন কি ডি-এন-এ মলিকিউল সংগঠনের বিশদ বিবরণ পর্যন্ত।

এই এক্সপেরিমেণ্ট থেকেই সিদ্ধান্তে আসেন ভোগেল যে, 'আমরা আমাদের দেহের এক-একটা কোষের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারি এবং মনের সেই মুহূর্তের তখন যা অবস্থা তার ভিত্তিতে কোষের ওপর নানা-রকমভাবে প্রভাব বিস্তারও করতে পারি। অসুখবিসুখের কারণ ব্যাখ্যায় একদিন পদ্ধতিটা কাজে আসতে পারে।'

বাচ্চারা বড়দের চেয়ে অনেক বেশী খোলা-মন হয়। ভোগেল তাই বাচ্চা-দের শেখাতে লাগলেন কি করে গাছেদের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিতে হয়। প্রথমে তিনি পাতা ছুঁতে বলেন, পাতাটার তাপমাত্রা কি, উপাদান কি আছে এবং গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন। তারপর পাতাট কে বেঁকাতে বলেন, পাতার স্থিতিস্থাপকতা টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করে পাতার ওপরে আর তলায় মৃদু টোকা দিতে বলেন এরপর। বাচ্চারা যখন বলে বেশ মজা লাগছে, অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে গা শিরশির করছে, তখন ভোগেল তাদের হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন পাতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আনা ফোর্স বা এনার্জি টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা। অধিকাংশ বাচ্চা সঙেগ সঙেগ বলে একটা ঢেউ-ভাঙার মত অথবা একটা চিনচিনে অনুভূতি টের পাওয়া যাচ্ছে বইকি।

ভোগেল লক্ষ্য করলেন যে সব বাচ্চারা পাতা ছুঁয়ে তন্ময়, তাদের অনুভূতিই সবচেয়ে প্রবল। অনুভূতি একবার শুরু হয়ে গেলেই বলতেন, 'এবার এলিয়ে দাও নিজেকে। এনার্জির আদান প্রদানটা পুরোপুরি অনুভব করার চেষ্টা করো। স্পন্দন টের পেলেই আস্তে আস্তে পাতার ওপর দিয়ে হাত বোলাও।' বাচ্চারা সহজেই তখন দেখেছে, হাত নামিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে পাতাও ঝুলে পড়েছে। হস্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখার পর দেখা গেছে পাতা বেশ দুলছে। দু-হাত সঞ্চালন করে পুরো উদ্ভিদটাকেই দোলাতে পেরেছে; আত্মবিশ্বাস আসতেই ভোগেলের নির্দেশে বাচ্চারা গাছের কাছে থেকে একটু একটু করে দূরে সরে গিয়ে একই এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে গেছে।

ভোগেলের মন্তব্য—'এই হল গিয়ে মূল প্রশিক্ষণ। যে ফোর্সকে দেখা যায় না, তার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়। চেতনাটা একবার এসে গেলে, ফোর্সটাকে নিয়ে কাজ চালানোর ক্ষমতা বাচ্চারা পায়।'

বাচ্চাদের মত বড়রা এত অনুভূতিসচেতন নয় বলেই ভোগেল বলছেন, 'বৈজ্ঞানিকরা তাঁর বা ব্যাকস্টারের এক্সপেরিমেণ্ট ল্যাবোরেটরীতে অনুষ্ঠিত

করতে পারবেন না। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ এক্সপেরিমেণ্ট সম্ভব নয়। গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বন্ধুর মত, নইলে ব্যর্থতা আসবেই!'

ক্যালিফোর্নিয়া সাইকিক্যাল সোসাইটির এক ডাক্তার মাসের পর মাস এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়েও সফল হননি। ডেনভারের সবচেয়ে নামী সাইকোঅ্যানালিস্টরাও ব্যর্থ হয়েছেন। ভোগেল মন্তব্য করেন—'মানুষ আর গাছের মধ্যে সমর্মিতাই হল আসল চাবিকাঠি। এই তত্ত্ব যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেননি, তাঁরা ব্যর্থ হবেনই। প্রশিক্ষিত পর্যবেক্ষকরা ছাড়া ল্যাবোরেটরীতে হাজার চেষ্টা করলেও এক্সপেরিমেণ্ট সফল হবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি একান্তই অপরিহার্য। এই পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক তাঁদের জীবনদর্শন দিয়ে বুঝতে চান না, সৃজনশীল পরীক্ষানিরীক্ষা মানেই হল পরীক্ষককে পরীক্ষার অঙ্গ হয়ে যেতে হয়।'

ব্যাকস্টারের সঙ্গে ভোগেলের তফাৎ এইখানেই। সম্ভবতঃ ভোগেল একধরনের সম্মোহনী নিয়ন্ত্রণ চালু করতে চান গাছেদের ওপর।

ভোগেলে বলেছেন, কেউ যদি একটা গাছের ওপর প্রভাববিস্তার করেও, ফলাফলটা সব সময়ে সুখজনক হয় না। তাঁর এক মনোবিজ্ঞানী বন্ধু উদ্ভিদ গবেষণায় আদৌ কোনো সত্য আছে কিনা দেখতে এসেছিলেন। পনেরো ফুট দূর থেকে ফিলোডেনড্রনের ওপর জোরালো আবেগ প্রক্ষেপ করতে বলেছিলেন তাঁকে ভোগেল। তৎক্ষণাৎ প্রবল সাড়া দিয়েই আচমকা 'নিষ্প্রাণ' হয়ে গেল ফিলোডেনড্রন। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ভোগেল, ঠিক সেই সময়ে কি ভাবছিলেন তিনি। বন্ধু বললেন—'ভাবছিলাম আমার নিজের ফিলোডেনড্রনের কথা—আপনারটা তার চাইতে একেবারেই নিরেস।' ভোগেলের উদ্ভিদ বেচারী এত আঘাত পায় যে সারাদিন কোনো সাড়া তো দেয়ই নি, তারপরেও দুটো হপ্তা ঝিমিয়ে থেকেছে।

ভোগেল নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অথবা তাদের চিন্তাধারার প্রতি গাছেরা প্রকৃতই বিরূপ ভাব পোষণ করতে পারে। এই যদি সত্য হয়, তাহলে, ভোগেলের বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে যেদিন কারও মনের চিন্তাপাঠ করতে হলে গাছের, শরণ নিলেই চলবে। প্রায় এই ধরনেরই একটা ব্যাপার এর আগেও অবশ্য ঘটেছে। ভোগেলের অনুরোধে তাঁর এক পরমাণু বিজ্ঞানী বন্ধু একটা টেকনিক্যাল প্রব্লেম নিয়ে কাজ করছিলেন। বন্ধুটি যখন তাই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, ভোগেলের উদ্ভিদটি একটানা ১১৮ সেকেণ্ড রেখাচিত্র এঁকে যায় চার্টের ওপর। বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটিকে জানান ভোগেল যে তাঁর চিন্তাও বন্ধ হয়েছে। বন্ধুটি সায় দেন। তবে কি গাছের মাধ্যমে চিন্তা-তরঙ্গ ধরতে পেরেছেন ভোগেল? মিনিট কয়েক পরে বৈজ্ঞানিক বন্ধুটি স্ত্রীর কথা ভাবতে শুরু করলেই গাছটাও ফের রেখাচিত্র আঁকতে

আরম্ভ করে—এবার ১৩৫ সেকেণ্ড ধরে। ভোগেলের মনে হল, তাঁর সামনেই যেন একটা গাছ একজন মানুষের চিন্তাপাঠ করে খাতায় লিখে যাচ্ছে। এই লেখার মানে উদ্ধার করা যেদিন সম্ভব হবে, মানুষটার মনের চিন্তা আঁচ করা কি কঠিন হবে?

এক কাপ কফি খেয়ে নিয়ে বন্ধুটিকে আবার স্ত্রীর কথা ভাবতে বলেন ভোগেল। আবার ১০৫ সেকেণ্ড ধরে রেখাচিত্র এঁকে গেল গাছটা। আগের বারের রেখাচিত্রের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য। ভোগেলের ধারণায় এই প্রথম গাছের দ্বারা চিন্তার স্পেকটোগ্রামের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল! চার্টের প্যাটার্নটা অনুধাবন করে সাংকেতিক বার্তার মূল চাবিকাঠি ধরে ফেললেই তো গাছের ভাষা বোঝা আর দুঃসাধ্য হবে না। শুধু যা সময়ের দরকার।

ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা গাছ পড়তে পারে, এই তথ্য প্রমাণ করার পর একদল মানুষের চিন্তাপঠনে গাছের দৌড় কদ্দূর জানবার পরীক্ষায় হাত দিলেন ভোগেল। অবিশ্বাসীদের নিয়ে দল করলেন। অজস্র প্রশ্ন বর্ষিত হল—অনেক চিন্তা করা হল। গাছ কিন্তু নির্বিকার। কিন্তু যেই একজন বলে উঠল—'উগ্র আনন্দ নিয়ে ভাবলে কি হয়?'—অমনি সবাইকে চমকে দিয়ে প্রাণবন্ত হল গাছটা। অথচ এক সেকেণ্ড আগেও এঁরা ভেবেছিলেন ভোগেল একটা বুজরুক! এক্সপেরিমেণ্ট তো নয়—ধাপ্পার আসর!

যৌনতার চিন্তায় তাহলে এমন একটা এনার্জি বিচ্ছুরিত হয় যা গাছেদের চনমনে করতে পারে? ডক্টর উইলহেল্ম্ রাইখ 'অরগোন' আবিষ্কার করে কিন্তু বলেছিলেন, পুরাকালের মানুষরা সদ্য কর্ষিত ক্ষেতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার পর মাঠের মধ্যেই যৌনক্রিয়ায় রত হত গাছেদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য। যৌনতা এনার্জি তাহলে গাছদের বাড়তে সাহায্য করে?

আর একবার প্রায়ান্ধকার ঘরে ভূতের গল্প শুনিয়েছিলেন ভোগেল একদল মানুষকে। 'জঙ্গলের রহস্যজনক কেবিনটার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে' অথবা 'হেঁট হয়ে কফিনের ডালাটা খুলল চার্লস,' অথবা 'হঠাৎ ছবি হাতে এক আগন্তুক আবির্ভূত হল'—এই কথাগুলো বলার সময়ে গাছ যেন একটু বেশী রকমের মনঃসংযোগ করেছিল। তবে কি গাছেরা কল্পনার দৌড় পরিমাপ করতে পারে? একদঙ্গল মানুষের চিন্তায় যে কল্পনা-এনার্জির সৃষ্টি, গাছেরা কি তা ধরতে পারে?

ভোগেল একথাও বলেছেন, যাঁরা চেতনাকে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, গাছ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক। ঊর্ধ্বচেতনায় যে মানুষ রয়েছেন, তাঁর 'ফোকাস' করা চিন্তাধারা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

স্বাস্থ্য যার ভাল নয়, গাছ বা অন্য ধরনের অতীন্দ্রিয় গবেষণায় তাঁর নামা উচিত নয়। এ-তত্ত্ব প্রমাণ করতে না পারলেও ভোগেলের অনুমান শাকসব্জী, ফল, বাদাম আর প্রোটিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ বিশেষ ধরনের খাদ্য এই ধরনের পরীক্ষার উপযুক্ত দৈহিক এনার্জি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ঊর্ধ্বস্তর থেকে শক্তি আহরণ করতে হয় বলে শরীরে পুষ্টির দরকার—কথাগুলো ভোগেলের।

ভোগেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, চিন্তার মত ঊর্ধ্বস্তরের এনার্জিসমূহ পঞ্চভূতে গড়া দেহের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কি করে। জীবন্ত প্রাণীদের এই দেহের ওপর সূক্ষ্ম এনার্জির প্রভাব সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যায় ভোগেল বলেছিলেন, জলের বিচিত্র ধর্ম সম্পর্কে এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করেছেন উনি। ক্রিস্ট্যালের গঠন, আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে যে বিজ্ঞান, তাকে এক কথায় বলে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি। ভোগেল এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী। ক্রিস্ট্যালোগ্রাফার হিসাবে তিনি দেখেছেন, বেশীর ভাগ লবণের ক্রিস্ট্যাল-আকার হয় এক রকমের, কিন্তু হিমবাহের কেন্দ্রস্থিত বরফের নমুনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে তিরিশটারও বেশী আকার। অনভিজ্ঞ মানুষ এই সব আকার দেখে ভাববে বুঝি প্রতিটাই আলাদা বস্তু। রহস্য সেই খানেই। জল একটা সত্যিকারের প্রহেলিকা।

ভোগেল এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা প্রমাণিত কোনো তত্ত্বের ধার কাছ দিয়েও যায় না। জল জিনিসটা সমস্ত জীবিত প্রাণীর দেহের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণশক্তির একটা সম্পর্ক আছে। জল সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে এবং লোমকূপের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার সময়ে দেহটাকে শক্তি দিয়ে ভরপুর করে চলেছে। জল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের প্রথম সূত্রটা ভোগেল পান সাইকিক গবেষকদের পর্যবেক্ষণ করে। এঁরা অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠানের পর কয়েক পাউণ্ড জল হারান দেহ থেকে। অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠানে এঁরা প্রাণশক্তি অথবা অতীন্দ্রিয় শক্তি খরচ করেন বলেই কি জলের অভাব ঘটে? সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্রে সাইকিক গবেষকের ওজন করলে দেখা যেত প্রতিক্ষেত্রেই তাঁরা ওজন হারিয়েছেন এক-একটা 'চক্রে' বসবার পর। এনার্জি হারাচ্ছেন তো বটেই, সেই সঙ্গে দেহের জলও হারাচ্ছেন।

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, ভোগেল তা জানেন না ঠিকই, কিন্তু উনি বিপুল উৎসাহে দীর্ঘ-অবহেলিত বহু সত্য অন্বেষণে এখনো ব্যস্ত। গাছেরা যে মানব জাতটাকে অনেক সাহায্য করতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সহজ সরল একটা প্রশিক্ষণ যন্ত্রের নক্‌শা করছেন উনি। এ-যন্ত্রের সাহায্যে বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন আবেগকে কিভাবে দেহমন থেকে বার করে দিতে হয় এবং প্রতিক্রিয়াটা কিভাবে লক্ষ্য করতে হয়। তাহলেই ভালবাসার কৌশল তারা শিখবে। চিন্তা তরঙ্গ কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে মহাশূন্যে ছুটে যেতে

পারে, সে তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবে। শক্তিপুঞ্জরূপী এই চিন্তা যে তাদেরই, এই সত্য জানবার পর তারা শিখবে শক্তিরূপী এই চিন্তা দিয়ে কিভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির আর ধীশক্তির উন্নতিসাধন করা যায়।

এ মেশিন কিন্তু মস্তিষ্ক-তরঙ্গ মাপবার মেশিন নয়। শর্টকাট পদ্ধতিতে অতীন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন যোগী হওয়ার পথও নয়। বাচ্চাদের আদর্শ মানব গড়ে তোলার যন্ত্র—তারা হবে সরল, সৎ, মানুষ। কথাগুলো ভোগেলের

উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর এই গবেষণার গুরুত্ব সংক্ষেপে ভোগেল যা বলেছেন, তা এই ঃ

'আমাদের ভেতরকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শক্তি বার করে দেওয়ার অক্ষমতার জন্যেই তো এত ভুগি আমরা। আঘাত পেলে ভেতরটা বিদ্রোহী হয়, আঘাতকে ভেতরে নিয়েই জীবনধারণ করি। ফলে একটা চাপসৃষ্টি হয় দেহমনে এবং উৎকণ্ঠা সঞ্চিত হয় পেশীতে। এই পেশীগত উৎকণ্ঠা মানুষটার এনার্জির অপচয় ঘটায়। অনেক দিন আগেই এই তত্ত্ব দেখিয়েছেন ডক্টর উইলহেল্‌ম্‌ রাইখ। উদ্বেগকে বার করে দিতে না পারলে দেহের রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। এই উদ্বেগমুক্তির পথের সন্ধান দেবে গাছেদের নিয়ে আমার গবেষণা।'

'গাছেরা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে,' বলেছেন ভোগেল। গাছেরা সব রকম ইচ্ছাকে ধরতে পারে—ক্ষতিকারক, বিদ্বেষপূর্ণ অথবা না-ভাল না-মন্দ—কোনো ইচ্ছাই অজ্ঞাত থাকে না উদ্ভিদ জগতের কাছে। মানুষ তাদের এই প্রতিভার ভাগ নিতে পারতো—কিন্তু অবহেলা করে এসেছে এতদিন।

ক্যালিফোর্নিয়ার দুজন তরুণ ছাত্র হিন্দুদর্শন আর মানবভিত্তিক মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। এঁদের নাম র‍্যানডাল ফণ্টেস আর রবার্ট সোয়া-নসন। ভোগেলের প্রশ্নমালা নিয়ে এখন এঁরা এমন সব বিস্ময়কর আবিষ্কার করে বসেছেন যে তারুণ্য সত্ত্বেও টাকাকড়ির সাহায্য পাচ্ছেন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে—গাছেদের সঙ্গে বার্তাবিনিময়ের রহস্যভেদে এগিয়ে আসছেন অনেক বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ পুরুষ ও প্রতিষ্ঠান।

প্রথম আবিষ্কারটা দৈবাৎ করে ফেলেছিলেন এই দুই তরুণ ছাত্র। হঠাৎ একদিন এঁরা লক্ষ্য করেন, একজনের হাই তোলায় এনার্জির বন্যা বয়ে যাচ্ছে যেন গাছের মধ্যে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি এঁরা দুজনে। কারণ ওঁরা জানতেন, সুপ্রাচীন হিন্দু পুঁথিতে লেখা আছে, ক্লান্ত মানুষ বড়সড় হাই তুলে নিজেকে শক্তিপূর্ণ করে তুলতে পারে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত 'শক্তি' আহরণ করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি ইন হেওয়ার্ডের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর নরম্যান গোল্ডস্টাইনের সহযোগিতায় আইভি ফিলোডেনড্রন উদ্ভিদের কোষ

স্বাস্থ্য যার ভাল নয়, গাছ বা অন্য ধরনের অতীন্দ্রিয় গবেষণায় তাঁর নামা উচিত নয়। এ-তত্ত্ব প্রমাণ করতে না পারলেও ভোগেলের অনুমান শাকসব্জী, ফল, বাদাম আর প্রোটিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ বিশেষ ধরনের খাদ্য এই ধরনের পরীক্ষার উপযুক্ত দৈহিক এনার্জি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ঊর্ধ্বস্তর থেকে শক্তি আহরণ করতে হয় বলে শরীরে পুষ্টির দরকার—কথাগুলো ভোগেলের।

ভোগেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, চিন্তার মত ঊর্ধ্বস্তরের এনার্জিসমূহ পঞ্চভূতে গড়া দেহের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কি করে। জীবন্ত প্রাণীদের এই দেহের ওপর সূক্ষ্ম এনার্জির প্রভাব সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যায় ভোগেল বলেছিলেন, জলের বিচিত্র ধর্ম সম্পর্কে এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করেছেন উনি। ক্রিস্ট্যালের গঠন, আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে যে বিজ্ঞান, তাকে এক কথায় বলে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি। ভোগেল এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী। ক্রিস্ট্যালোগ্রাফার হিসাবে তিনি দেখেছেন, বেশীর ভাগ লবণের ক্রিস্ট্যাল-আকার হয় এক রকমের, কিন্তু হিমবাহের কেন্দ্রস্থিত বরফের নমুনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে তিরিশটারও বেশী আকার। অনভিজ্ঞ মানুষ এই সব আকার দেখে ভাববে বুঝি প্রতিটাই আলাদা বস্তু। রহস্য সেই খানেই। জল একটা সত্যিকারের প্রহেলিকা।

ভোগেল এমন একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যা প্রমাণিত কোনো তত্ত্বের ধার কাছ দিয়েও যায় না। জল জিনিসটা সমস্ত জীবিত প্রাণীর দেহের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণশক্তির একটা সম্পর্ক আছে। জল সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে এবং লোমকূপের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার সময়ে দেহটাকে শক্তি দিয়ে ভরপুর করে চলেছে। জল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের প্রথম সূত্রটা ভোগেল পান সাইকিক গবেষকদের পর্যবেক্ষণ করে। এঁরা অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠানের পর কয়েক পাউণ্ড জল হারান দেহ থেকে। অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠানে এঁরা প্রাণশক্তি অথবা অতীন্দ্রিয় শক্তি খরচ করেন বলেই কি জলের অভাব ঘটে? সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্রে সাইকিক গবেষকের ওজন করলে দেখা যেত প্রতিক্ষেত্রেই তাঁরা ওজন হারিয়েছেন এক-একটা 'চক্রে' বসবার পর। এনার্জি হারাচ্ছেন তো বটেই, সেই সঙ্গে দেহের জলও হারাচ্ছেন।

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, ভোগেল তা জানেন না ঠিকই, কিন্তু উনি বিপুল উৎসাহে দীর্ঘ-অবহেলিত বহু সত্য অন্বেষণে এখনো ব্যস্ত। গাছেরা যে মানব জাতটাকে অনেক সাহায্য করতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সহজ সরল একটা প্রশিক্ষণ যন্ত্রের নক্‌শা করছেন উনি। এ-যন্ত্রের সাহায্যে বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন আবেগকে কিভাবে দেহমন থেকে বার করে দিতে হয় এবং প্রতিক্রিয়াটা কিভাবে লক্ষ্য করতে হয়। তাহলেই ভালবাসার কৌশল তারা শিখবে। চিন্তা তরঙ্গ কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে মহাশূন্যে ছুটে যেতে

পারে, সে তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবে। শক্তিপুঞ্জরূপী এই চিন্তা যে তাদেরই, এই সত্য জানবার পর তারা শিখবে শক্তিরূপী এই চিন্তা দিয়ে কিভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির আর ধীশক্তির উন্নতিসাধন করা যায়।

এ মেশিন কিন্তু মস্তিষ্ক-তরঙ্গ মাপবার মেশিন নয়। শর্টকাট পদ্ধতিতে অতীন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন যোগী হওয়ার পথও নয়। বাচ্চাদের আদর্শ মানব গড়ে তোলার যন্ত্র—তারা হবে সরল, সৎ, মানুষ। কথাগুলো ভোগেলের

উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর এই গবেষণার গুরুত্ব সংক্ষেপে ভোগেল যা বলেছেন, তা এই ঃ

'আমাদের ভেতরকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শক্তি বার করে দেওয়ার অক্ষমতার জন্যেই তো এত ভুগি আমরা। আঘাত পেলে ভেতরটা বিদ্রোহী হয়, আঘাতকে ভেতরে নিয়েই জীবনধারণ করি। ফলে একটা চাপসৃষ্টি হয় দেহমনে এবং উৎকণ্ঠা সঞ্চিত হয় পেশীতে। এই পেশীগত উৎকণ্ঠা মানুষটার এনার্জির অপচয় ঘটায়। অনেক দিন আগেই এই তত্ত্ব দেখিয়েছেন ডক্টর উইলহেল্‌ম্‌ রাইখ। উদ্বেগকে বার করে দিতে না পারলে দেহের রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। এই উদ্বেগমুক্তির পথের সন্ধান দেবে গাছেদের নিয়ে আমার গবেষণা।'

'গাছেরা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে,' বলেছেন ভোগেল। গাছেরা সব রকম ইচ্ছাকে ধরতে পারে—ক্ষতিকারক, বিদ্বেষপূর্ণ অথবা না-ভাল না-মন্দ—কোনো ইচ্ছাই অজ্ঞাত থাকে না উদ্ভিদ জগতের কাছে। মানুষ তাদের এই প্রতিভার ভাগ নিতে পারতো—কিন্তু অবহেলা করে এসেছে এতদিন।

ক্যালিফোর্নিয়ার দুজন তরুণ ছাত্র হিন্দুদর্শন আর মানবভিত্তিক মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। এঁদের নাম র্যানডাল ফণ্টেস আর রবার্ট সোয়ানসন। ভোগেলের প্রশ্নমালা নিয়ে এখন এঁরা এমন সব বিস্ময়কর আবিষ্কার করে বসেছেন যে তারুণ্য সত্ত্বেও টাকাকড়ির সাহায্য পাচ্ছেন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে—গাছেদের সঙ্গে বার্তাবিনিময়ের রহস্যভেদে এগিয়ে আসছেন অনেক বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ পুরুষ ও প্রতিষ্ঠান।

প্রথম আবিষ্কারটা দৈবাৎ করে ফেলেছিলেন এই দুই তরুণ ছাত্র। হঠাৎ একদিন এঁরা লক্ষ্য করেন, একজনের হাই তোলায় এনার্জির বন্যা বয়ে যাচ্ছে যেন গাছের মধ্যে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি এঁরা দুজনে। কারণ ওঁরা জানতেন, সুপ্রাচীন হিন্দু পুঁথিতে লেখা আছে, ক্লান্ত মানুষ বড়সড় হাই তুলে নিজেকে শক্তিপূর্ণ করে তুলতে পারে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত 'শক্তি' আহরণ করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি ইন হেওয়ার্ডের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর নরম্যান গোল্ডস্টাইনের সহযোগিতায় আইভি ফিলোডেনড্রন উদ্ভিদের কোষ

থেকে ছুটে যাওয়া তড়িৎ কণার পরিমাপ করে এঁরা যে আবিষ্কার করেন, তার দ্বারাই একটা গভীর আন্দাজি তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যায়—গাছেদের সরল স্নায়ুতন্ত্র আছে। এতদিন এই তত্ত্বের কল্পনাও কেউ করেননি। ফণ্টেস বর্তমানে 'নিটেলা' নামে একটা জলজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করছেন। এই উদ্ভিদের কোষগুলো দু-ইঞ্চি তো বটেই, তারও বেশী লম্বা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটে ফণ্টস যে দু-জনের সঙ্গে মিলেমিলে অভিনব এই গবেষণায় তন্ময়, তাঁদের একজন পদার্থবিদ্ ডক্টর হল পুথফ, অপর জন অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাক্তন টেস্ট পাইলট এবং পুলিশ-প্রধান। এঁর নাম প্যাট প্রাইস। ইনি নিজের বিবিধ মানসিক অভিক্ষেপের সাহায্যে 'নিটেলা' সক্রিয় করতে পারেন—ব্যর্থ প্রায় হন না বললেই চলে। ফণ্টস এবং পুথফের দুজনেরই তাই বিশ্বাস, হাজার খানেক মাইল দূরে প্রাইসকে রেখে এবং সূক্ষ্ম সময়জ্ঞাপক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁর মানসিক অভিক্ষেপের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 'নিটেলাকে' দিয়ে সাড়া দেওয়াতে তাঁরা সক্ষম হবেন এবং চিন্তার গতিবেগ যে আলোর গতিবেগের চাইতেও বেশী—তা প্রমাণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে সোয়ানসন ক্যালি-ফোর্ণিয়ার মার্তিনেজের জন কেনেডি ইউনিভার্সিটিতে পরামনোবিজ্ঞান আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রে যে গবেষণা করছেন তার মূল লক্ষ্য হল সেই সব মানুষদের নির্ণয় করা যারা টেলিপ্যাথি দিয়ে গাছেদের প্রভাবিত করতে পারে। যারা পারে না, তাদেরও এই গবেষণার মাধ্যমে নির্ণীত করার চেষ্টা চলছে।

মহাশূন্য থেকে যারা আসছে পৃথিবীকে দেখতে

১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে সুবিখ্যাত মাউণ্ট পালোমার মান-মন্দিরের অনতিদূরে ওক গ্রোভ পার্কে প্রবেশ করল অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা নীল রঙের ভক্সওয়াগেন গাড়ী। ড্রাইভারের আসন থেকে নামলেন সাত চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার। নাম, জর্জ লরেন্স। একজন সহকারীকে নিয়ে মরুভূমিসদৃশ সুদূর এই অঞ্চলে তিনি এসেছেন বুনো ওক, ক্যাকটাস আর য়ুক্কাস গাছের সংকেত যন্ত্রপাতিতে ধরা যায় কিনা দেখবার জন্যে। এহেন জঙ্গলকে বাছাই করেছেন মানুষের সৃষ্টি কোনো বাগড়ায় সংকেত গুলিয়ে যাবে না, এই আশায়। এ অঞ্চল নাকি 'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ডীপ-ফ্রিঞ্জ-এরিয়া'—তাঁর ভাষায়। গাছেদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে সুস্পষ্ট—কোনো রকম ভেজাল থাকবে না তার মধ্যে। তাঁর যন্ত্রপাতি কিন্তু ব্যাকস্টার, সভিন আর ভোগেলের মত নয়। ফ্যারাডে টিউব দিয়ে আড়াল করা তাপ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখেছেন কিছু উদ্ভিজ্জ টিশু—কোনো রকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বাগড়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। লরেন্স দেখেছিলেন,

ইলেকট্রনিক সেনসরের চাইতে অনেক ভালভাবে সংকেত গ্রহণ করতে পারে জীবন্ত উদ্ভিজ্জ টিশ্যু এবং জীবন্ত বস্তুর জৈববিকিরণকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জৈব মাধ্যমের জুড়ি আর হয় না। মরু-বৃক্ষদের গায়ে ইলেকট্রোড তিনি লাগাননি, কেন না প্রতিবেশী বৃক্ষদের থেকে অনেক দূরে থাকায় এদের সংকেত হবে অবিমিশ্র এবং সুস্পষ্ট। তার বদলে একটা লেন্সহীন টিউবকে ফোকাস করেছিলেন বিশেষ একটা টার্গেট উদ্ভিদের ওপর। টিউবের মুখটা বেশ চওড়া। দূরে লেন্সহীন টিউবের বদলে রেখেছিলেন একটা টেলিস্কোপ—উদ্ভিদটা যাতে স্পষ্ট দেখা যায়, তাই একটা গাছের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন একটা সাদা কাপড়। মাইলখানেক দূর থেকেও সংকেত গ্রহণ করতে পেরেছে জীবন্ত টিশ্যু। জীবন্ত টিশ্যুর চাঞ্চল্য পেন রেকর্ডারে না ধরে তিনি শব্দের মাধ্যমে ধরেছিলেন। একটা একটানা মৃদু শিস শোনা যেত—গাছের সংকেত এসে পেঁছোলেই সুস্পষ্ট স্পন্দনের মত পর-পর শিসের শব্দ স্পন্দিত হত।

প্রথম দিনের ঘটনা, বিকেলের খাওয়া দাওয়ার জন্যে দুজনে বসে আছেন কলকব্জা থেকে দশগজ তফাতে। যন্ত্রের মুখ ঘোরানো রয়েছে আকাশের দিকে। সসেজে কামড় দিয়েছেন লরেন্স, এমন সময়ে একটানা শিস দেওয়ার শব্দটা স্পন্দিত শব্দে রূপান্তরিত হল। লরেন্স ভাবলেন বুঝি সসেজের কোষ মারা যাচ্ছে বলেই গাছেরা বিচলিত হয়ে সংকেত পাঠাচ্ছে। তারপরেই খেয়াল হল আচারের সসেজে কোষেরা জৈব কারণে মৃত। যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করলেন। প্রায় আধঘণ্টার মত স্পন্দিত শিস ধ্বনি জাগ্রত রইল—তারপর ফিরে এল একটানা শিস ধ্বনি। তাজ্জব হয়ে গেলেন লরেন্স।

যন্ত্রের মুখ তো ঘোরানো ছিল আকাশের দিকে। তবে কি মহাশূন্য থেকে কেউ বা কিছু সংকেত পাঠিয়ে গেল এতক্ষণ ধরে? চিন্তাটা ফ্যানট্যাসটিক। তাই কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে রইলেন লরেন্স।

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, ঝট করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও মন চাইল না। কোটি কোটি মাইল দূর থেকে প্রেরিত সংকেত তাঁরা যন্ত্র মারফৎ ধরে ফেলেছেন সসেজ খেতে খেতে, এমন সম্ভাবনায় সায় দিতে মন কি চায়? বিশেষ করে সে সংকেত যদি ধীমান সংকেত হয়!

সতর্ক লরেন্স তাই কয়েকটা মাস ব্যয় করলেন যন্ত্রটাকে আরও ধারালো করার ব্যাপারে। বেশ কিছু উন্নতিসাধন করলেন। 'আন্তঃনাক্ষত্রিক সংকেত গ্রহণের বায়োডায়নামিক ফিল্ড স্টেশন'—যন্ত্রটার এ-হেন একটা নামকরণও করলেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে আবার যন্ত্র নিয়ে এলেন আগের জায়গায়। আকাশের যেদিক থেকে সংকেত এসেছিল বলে মনে হয়েছিল, যন্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন সেইদিকে। Ursa Major—গ্রেট বীয়ারের দিকে

থেকে ছুটে যাওয়া তড়িৎ কণার পরিমাপ করে এঁরা যে আবিষ্কার করেন, তার দ্বারাই একটা গভীর আন্দাজি তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যায়—গাছেদের সরল স্নায়ুতন্ত্র আছে। এতদিন এই তত্ত্বের কল্পনাও কেউ করেননি। ফণ্টেস বর্তমানে 'নিটেলা' নামে একটা জলজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করছেন। এই উদ্ভিদের কোষগুলো দু-ইঞ্চি তো বটেই, তারও বেশী লম্বা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটে ফণ্টিস যে দু-জনের সঙ্গে মিলেমিলে অভিনব এই গবেষণায় তন্ময়, তাঁদের একজন পদার্থবিদ্ ডক্টর হল পুথফ, অপর জন অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাক্তন টেস্ট পাইলট এবং পুলিশ-প্রধান। এঁর নাম প্যাট প্রাইস। ইনি নিজের বিবিধ মানসিক অভিক্ষেপের সাহায্যে 'নিটেলা' সক্রিয় করতে পারেন—ব্যর্থ প্রায় হন না বললেই চলে। ফণ্টিস এবং পুথফের দুজনেরই তাই বিশ্বাস, হাজার খানেক মাইল দূরে প্রাইসকে রেখে এবং সূক্ষ্ম সময়জ্ঞাপক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁর মানসিক অভিক্ষেপের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 'নিটেলাকে' দিয়ে সাড়া দেওয়াতে তাঁরা সক্ষম হবেন এবং চিন্তার গতিবেগ যে আলোর গতিবেগের চাইতেও বেশী—তা প্রমাণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে সোয়ানসন ক্যালিফোর্নিয়ার মার্তিনেজের জন কেনেডি ইউনিভার্সিটিতে পরামনোবিজ্ঞান আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রে যে গবেষণা করছেন তার মূল লক্ষ্য হল সেই সব মানুষদের নির্ণয় করা যারা টেলিপ্যাথি দিয়ে গাছেদের প্রভাবিত করতে পারে। যারা পারে না, তাদেরও এই গবেষণার মাধ্যমে নির্ণীত করার চেষ্টা চলছে।

মহাশূন্য থেকে যারা আসছে পৃথিবীকে দেখতে

১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে সুবিখ্যাত মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের অনতিদূরে ওক গ্রোভ পার্কে প্রবেশ করল অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা নীল রঙের ভক্সওয়াগেন গাড়ী। ড্রাইভারের আসন থেকে নামলেন সাত চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার। নাম, জর্জ লরেন্স। একজন সহকারীকে নিয়ে মরুভূমিসদৃশ সুদূর এই অঞ্চলে তিনি এসেছেন বুনো ওক, ক্যাকটাস আর য়ুক্কাস গাছের সংকেত যন্ত্রপাতিতে ধরা যায় কিনা দেখবার জন্যে। এহেন জঙ্গলকে বাছাই করেছেন মানুষের সৃষ্টি কোনো বাগড়ায় সংকেত গুলিয়ে যাবে না, এই আশায়। এ অঞ্চল নাকি 'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ডীপ-ফিুজ-এরিয়া'—তাঁর ভাষায়। গাছেদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে সুস্পষ্ট—কোনো রকম ভেজাল থাকবে না তার মধ্যে। তাঁর যন্ত্রপাতি কিন্তু ব্যাকস্টার, সভিন আর ভোগেলের মত নয়। ফ্যারাডে টিউব দিয়ে আড়াল করা তাপ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখেছেন কিছু উদ্ভিজ্জ টিশু—কোনো রকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বাগড়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। লরেন্স দেখেছিলেন,

ইলেকট্রনিক সেনসরের চাইতে অনেক ভালভাবে সংকেত গ্রহণ করতে পারে জীবন্ত উদ্ভিজ্জ টিশ্যু এবং জীবন্ত বস্তুর জৈবাবিকিরণকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জৈব মাধ্যমের জুড়ি আর হয় না। মরু-বৃক্ষদের গায়ে ইলেকট্রোড তিনি লাগাননি, কেন না প্রতিবেশী বৃক্ষদের থেকে অনেক দূরে থাকায় এদের সংকেত হবে অবিমিশ্র এবং সুস্পষ্ট। তার বদলে একটা লেন্সহীন টিউবকে ফোকাস করেছিলেন বিশেষ একটা টার্গেট উদ্ভিদের ওপর। টিউবের মুখটা বেশ চওড়া। দূরে লেন্সহীন টিউবের বদলে রেখেছিলেন একটা টেলিস্কোপ—উদ্ভিদটা যাতে স্পষ্ট দেখা যায়, তাই একটা গাছের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন একটা সাদা কাপড়। মাইলখানেক দূর থেকেও সংকেত গ্রহণ করতে পেরেছে জীবন্ত টিশ্যু। জীবন্ত টিশ্যুর চাঞ্চল্য পেন রেকর্ডারে না ধরে তিনি শব্দের মাধ্যমে ধরেছিলেন। একটা একটানা মৃদু শিস শোনা যেত—গাছের সংকেত এসে পেঁছোলেই সুস্পষ্ট স্পন্দনের মত পর-পর শিসের শব্দ স্পন্দিত হত।

প্রথম দিনের ঘটনা, বিকেলের খাওয়া দাওয়ার জন্যে দুজনে বসে আছেন কলকব্জা থেকে দশগজ তফাতে। যন্ত্রের মুখ ঘোরানো রয়েছে আকাশের দিকে। সসেজে কামড় দিয়েছেন লরেন্স, এমন সময়ে একটানা শিস দেওয়ার শব্দটা স্পন্দিত শব্দে রূপান্তরিত হল। লরেন্স ভাবলেন বুঝি সসেজের কোষ মারা যাচ্ছে বলেই গাছেরা বিচলিত হয়ে সংকেত পাঠাচ্ছে। তারপরেই খেয়াল হল আচারের সসেজে কোষেরা জৈব কারণে মৃত। যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করলেন। প্রায় আধঘণ্টার মত স্পন্দিত শিস ধ্বনি জাগ্রত রইল—তারপর ফিরে এল একটানা শিস ধ্বনি। তাজ্জব হয়ে গেলেন লরেন্স।

যন্ত্রের মুখ তো ঘোরানো ছিল আকাশের দিকে। তবে কি মহাশূন্য থেকে কেউ বা কিছু সংকেত পাঠিয়ে গেল এতক্ষণ ধরে? চিন্তাটা ফ্যানট্যাসটিক। তাই কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে রইলেন লরেন্স।

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, ঝট করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও মন চাইল না। কোটি কোটি মাইল দূর থেকে প্রেরিত সংকেত তাঁরা যন্ত্র মারফৎ ধরে ফেলেছেন সসেজ খেতে খেতে, এমন সম্ভাবনায় সায় দিতে মন কি চায়? বিশেষ করে সে সংকেত যদি ধীমান সংকেত হয়!

সতর্ক লরেন্স তাই কয়েকটা মাস ব্যয় করলেন যন্ত্রটাকে আরও ধারালো করার ব্যাপারে। বেশ কিছু উন্নতিসাধন করলেন। 'আন্তঃনাক্ষত্রিক সংকেত গ্রহণের বায়োডায়নামিক ফিল্ড স্টেশন'—যন্ত্রটার এ-হেন একটা নামকরণও করলেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে আবার যন্ত্র নিয়ে এলেন আগের জায়গায়। আকাশের যেদিক থেকে সংকেত এসেছিল বলে মনে হয়েছিল, যন্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন সেইদিকে। Ursa Major—গ্রেট বীয়ারের দিকে

রইল যন্ত্রের অবস্থান। এবার কিন্তু উঠলেন একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে (Pisgah Crater) ; মরুভূমির ঠিক মাঝখানে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৩০০ ফুট উঁচুতে। চার পাশে তিরিশ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে জমাট লাভা ছাড়া আর কিছুই রইল না—এক কণা ঘাসও নয়। ফ্যারাডে টিউব, ক্যামেরা এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বাধাবিপত্তি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাদিসহ টেলিস্কোপ ঘোরালেন Ursa Major-য়ের দিকে। উদ্ভিজ্জ টিশু চেম্বার তো রইলই। তারপর সুইচ টিপে দিলেন শব্দ-সংকেত ধ্বনির। নব্বই মিনিট পর আবার চেনা কিন্তু সংক্ষিপ্ত সংকেতের প্যাটার্ণ ধরা পড়ল যন্ত্রে। ঘণ্টা কয়েক ধরে কিছুক্ষণ অন্তর তিন থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত স্পন্দিত শব্দ-সংকেত অব্যাহত রইল আকাশের একই দিকে যন্ত্র ফিরিয়ে রাখার সময়ে।

১৯৭১ সালের এক্সপেরিমেণ্টের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন লরেন্স এইভাবে। যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটা দৈবাৎ করে ফেলেছেন কিনা, এই নিয়ে অজস্র চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল লরেন্সের। সংকেত কোত্থেকে আসছে, কে পাঠাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারলেন না। শুধু আন্দাজ করলেন, সম্ভবত সঞ্চরমান ছায়াপথ এই বিচিত্র শব্দ-সংকেতের উৎস হলেও হতে পারে। হয়ত Ursa Major থেকে এ সংকেত আসছে না ; ছায়াপথের কোথাও ঘনীভূত নক্ষত্র সমাবেশ এই সংকেতের উৎস।

এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু চালিয়ে গেলেন লরেন্স—এরপর নিজের ল্যাবোরেটরী থেকে যন্ত্রের মুখ ঘোরানো রইল সেই একই স্থানাঙ্ক অর্থাৎ কোঅর্ডিনেটের দিকে। চব্বিশঘণ্টা চলল প্রতীক্ষা। কয়েক হপ্তা, এমন কি কয়েক মাস পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। সংকেত যখন এসেছে, তখন আর চিনতে ভুল হয়নি। একটা সংকেত বার-র্-র্-র্ বীপ-বীপ-বীপ টাইপের ; লরেন্সের মতে কোন পার্থিব প্রাণীর সংকেত এমনটা হয় না।

অদ্ভুত এই সংকেতের প্রকৃতি সম্বন্ধে আন্দাজি মতামত চাওয়া হয়েছিল লরেন্সের কাছে। উনি বলেছিলেন—'আমার মন বলে না যে এ-সব সংকেত পৃথিবীর মানুষদের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছে। সম্ভবতঃ দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের লেনদেন চলছে। যেহেতু আমরা জৈবিক ভাববিনিময় বুঝতে পারি না, এই ধরনের 'কথোপকথনের আওতার বাইরে রয়ে গেছি আমরা। খুবই প্রচণ্ড মাত্রার এনার্জি নিশ্চয় পাঠানো হচ্ছে ; কেন না আমাদের যন্ত্রপাতি তেমন উন্নত ধরনের না হওয়া সত্ত্বেও নক্ষত্র জগতের বহুদূরের বার্তাবিনিময় ধরতে পারছে। সংকেতগুলো তাই আশু প্রয়োজনীয় ধরনের। কিছু একটা ঘটছে কোথাও এবং কেউ মরিয়া হয়ে সাহায্য চাইছে।'

আবিষ্কারটার গুরুত্ব থাকতে পারে, এই ধারণা নিয়ে লরেন্স তাঁর ১৯৭১

(অক্টোবর) সালের টেপ এবং সাত পৃষ্ঠার একটা প্রতিবেদন ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটে গচ্ছিত রেখেছেন। ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দলিল হিসাবে এই কাগজ পত্রের মূল্য আর হয় না। প্রতিবেদনের শেষে উনি লিখেছেন—'আন্তঃনাক্ষত্রিক ভাববিনিময় ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। উৎস এবং লক্ষ্য—দুটোই অজ্ঞাত। জৈব সেনসর মারফং এদের পাকড়াও করা গেছে বলেই মনে হয় জৈব ধরনের সংকেত প্রেরক এর মূলে আছে। কোনোরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন গ্রাহক যন্ত্রে যে বাগড়া সৃষ্টি করে নি, তা পরে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। যন্ত্রপাতির গলদও ছিল না। যাচাই করার জন্যে পৃথিবীব্যাপী আরও পরীক্ষা দরকার। ব্যাপারটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ—অবহেলা করা ঠিক নয়।'

লরেন্স বলেছেন, যন্ত্রের টেপ-শব্দসংকেত শুনতে খুব ভাল লাগে না ঠিকই, কিন্তু কয়েক হপ্তা ধরে তিনবার কি তারও বেশীবার বাজানোর পর প্রবলমাত্রায় মোহিত হতে হয়।

শব্দ-সংকেতটা যেন অর্থহীন বকবকানি—কিন্তু গভীরভাবে ছন্দোময়। প্যাটার্নের মধ্যে ছন্দোবদ্ধতা আছে বলেই ধীমান প্রকৃতি আন্দাজ করা যায়।

ইলেকট্রনিক্স দিয়ে এ সংকেত ধরা যাবে না। কেন না 'বায়োসিগন্যাল' রয়েছে তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বাইরে।

১৯৫০ সালে বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেছিলেন এই মহাবিশ্বে আমরা একা নই, অন্য ধীমান জীবদের অস্তিত্ব সম্ভব। আমাদের চাইতেও অনেক উন্নত তারা ; আগে কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকরাই এই তত্ত্ব মানতে চাননি। কথাটা লরেন্সের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদ কার্ল ফ্রেডরিক গস কয়েক মাইল লম্বা প্রকাণ্ড আকারে সমকোণে শস্যক্ষেত্র কাটতে বলেছিলেন সাইবেরিয়া প্রান্তরে মহাবিশ্বের প্রাণীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে—তারা যেন জানতে পারে পৃথিবীতে আমরা আছি। অষ্ট্রিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিট্রো বলেছিলেন সাহারায় জ্যামিতিক খাল কেটে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হোক গভীর রাত্রে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক চার্লস গ্রস প্রস্তাব করেছিলেন একটা বিরাট আয়না দিয়ে রোদ্দুর প্রতিফলিত করা হোক মঙ্গলগ্রহের দিকে।

১৯২৭ সালে নরওয়ের রেডিও ইঞ্জিনীয়ার জরগেন হ্যাল্স্ রেডিওতে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন। সিকি শতাব্দী পরে শেষ কালে এই বিচিত্র প্রতিধ্বনিগুলোকে সৌরজগতে সংকেত মনে করা হয়েছিল—হয়ত ধীমান প্রাণীরা পাঠাচ্ছে ; পাল্টা সংকেতও পাঠানো হয়েছিল পৃথিবী থেকে।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের সি ডব্লিউ ব্র্যাডলি টেক্সাসের হিউসটন থেকে পাঠানো KLEE-TV অক্ষরগুলো বসবার ঘরের টিভিতে দেখতে পান।

পরের কয়েক মাসে এই অক্ষরগুলোই ল্যাংকাস্টারে আটলাণ্টিক ইলেকট্রনিক্স অফিসে দেখা যায়। কিন্তু অক্ষরগুলো সংকেত হিসাবে পাঠানো হয়েছিল তিন বছর আগে। ১৯৫০ সালে এ সংকেত-অক্ষর পালটে KPRC করা হয়। তবে কি পৃথিবীর ওপরে ভাসমান 'প্লাজমা' মেঘে সংকেতগুলো জমা হয়েছিল? পুরো ব্যাপারটাই যেন অর্থহীন অথবা অত্যন্ত দামী ধাপ্পাবাজি।

CETI মানে হল Communication with Extraterrestrial Intelligences ; এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেছে ১৯৭১য়ের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েট আর্মেনিয়ায়। আহ্বায়ক ছিল যুগপৎ রাশিয়া ও আমেরিকা।

লরেন্সের অনুযোগ, অধিকাংশের অভিমত মহাবিশ্বের সংকেত কেবল বেতার মারফৎই ধরা সম্ভব। এঁরা যদি বায়োলজিক্যাল সিগন্যাল গ্রহণের আইডিয়া মাথায় আনতে পারতেন, সুযোগ বেশী পেতেন। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে 'অ্যাসট্রলজি, দ্য স্পেশ এজ সায়েন্স' নামক গ্রন্থের লেখকের রচনায়। প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়েছিল 'স্যাগা' ম্যাগাজিনে (জানুয়ারী, ১৯৭৩)। প্রবন্ধকার বলেছিলেন মহাবিশ্বের ধীমান জীবদের সংকেত গ্রহণের অন্তরায় বাঁধাধরা বৈজ্ঞানিক পন্থা।

এক এনার্জিকে আর এক এনার্জিতে রূপান্তরকরণে যান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে গাছের শরণ নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন লরেন্স। প্রকৃতি নাকি এই ব্যবস্থা বানিয়ে রেখেছেন গাছেদের মধ্যে।

১৯৬৩ সালে এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে ফ্যাসাদে পড়লেন লরেন্স। সমসাময়িক বিশেষজ্ঞরা ফিজিক্স বা ইলেকট্রনিক্স সম্বন্ধে তেমন খবর কেউ রাখতেন না। ওঁর লক্ষ্য কি, কেউ ধরতে পারলেন না। লরেন্স তখন ১৯২০তে অনুষ্ঠিত রাশিয়ান হিসটলজিস্ট Gurwitsch দম্পতীর গবেষণা নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন। এঁরা দেখেছিলেন, পিঁয়াজের শেকড়ের ডগায় কোষেরা নিয়মিত ছন্দে দ্বিধাবিভক্ত হয়। বলেছিলেন, সব জীবন্ত কোষ অদৃশ্য বিকিরণ ত্যাগে সক্ষম। পিঁয়াজের শেকড়ের কোষেরা নিশ্চয় কাছাকাছি কোথা থেকেও এনার্জি সংগ্রহ করছে। লরেন্সও চাইছিলেন সংকেত প্রেরণ এবং গ্রহণের কোনো একটা জৈব পদ্ধতি।

রাশিয়ান হিসটলজিস্ট একটা কাঁচের নলে একটা পেঁয়াজের শেকড় রেখে রে-গানের মত খোলা মুখটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আর একটা নলের দিকে—তার খোলা মুখে ছিল আর একটা পেঁয়াজের শেকড়। তিনঘণ্টা পর দ্বিতীয় শেকড়টাকে মাইক্রোসকোপের তলায় রেখে কোষ বেড়েছে কি হারে তা গুণেছিলেন। দেখেছিলেন, স্বাভাবিক হারের চাইতে শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী। নিশ্চয়

প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করেছিল দ্বিতীয় গ্রাহক শেকড়টা।

বিকিরণটা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। দুটো শেকড়ের মাঝে একটা পাতলা কোয়ার্জ রেখেছিলেন। কিন্তু ফলাফল হয়েছে একই। তখন জিলেটিন মাখিয়ে দিয়েছিলেন কোয়ার্জে। বাড়তি কোষ বিভাজন আর দেখা যায়নি। জিলেটিন মাখানো কোয়ার্জের বদলে কাঁচের প্লেট রেখেছিলেন—কোষ বিভাজন বাড়েনি। যেহেতু কাঁচ বা জিলেটিন বিবিধ আলট্রাভায়োলেট ফ্রিকোয়েন্সি রুখে দিতে পারে তড়িৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালির ওপর, কাজেই শেকড় বিকিরিত এই রশ্মি আলট্রা-ভায়োলেটের মতই ছোট্ট বা ছোট্টতর হতে পারে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি। যে-হেতু এই রশ্মি মনে হচ্ছে যেন কোষ বিভাজন বৃদ্ধি ঘটায় বা 'মাইটোসিস' ঘটায়, অতএব রশ্মিকে তিনি বললেন 'মাইটোজেনিক রে'।

বিজ্ঞান মহলে ঝড় তুলেছিল এই পর্যবেক্ষণ। মাইটোজেনিক রে-র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সূর্য থেকে আসা আলট্রাভায়োলেট রে-র চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী বলে বৈজ্ঞানিকরা বলেছিলেন পার্থিব প্রাণশক্তি সম্পন্ন কোনো কিছুর পক্ষে এই ধরনের রশ্মি বিকিরণ সম্ভব নয়। প্যারিসে দুজন গবেষক এই ফলাফল দেখালেন এক্সপেরিমেণ্ট করে। মস্কোতে একজন দেখালেন খমিরের অংকুরিত হওয়া শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া যায় পেঁয়াজের শেকড়ের মাইটোজেনিক রে-র সামনে ধরলে।

বার্লিনের কাছে সিমেন্স অ্যাণ্ড হাল্সকে ইলেকট্রিক কোম্পানীর দুজন বৈজ্ঞানিক বললেন মাইটোজেনিক রে একটা ঘটনা। ফ্রাঙ্কফুর্টের এক গবেষক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দিয়ে এই রশ্মির পরিমাপও করলেন। পক্ষান্তরে কিন্তু অ্যাংলো-স্যাক্সন গবেষকরা রশ্মির প্রতিক্রিয়া ধরতে ব্যর্থ হলেন। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স যখন বললেন রশ্মি-তত্ত্ব পুরোপুরি কাল্পনিক, তখন Gurwitsch বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন।

মাইটোজেনিক রে নির্ণয়ের জন্যে আলট্রাভায়োলেট স্পেকট্রোমিটার ছিল না লরেন্সের। কিন্তু তত্ত্বটা তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। উনি কিন্তু আঁচ করেছিলেন রাশিয়ান হিসটলজিস্টের এই এক্সপেরিমেণ্টে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নিশ্চয় আছে। দেখেছিলেন, ধোঁয়ায় অথবা মনে মনে শেকড় ধ্বংস করার কথা ভাবলে পেঁয়াজের শেকড়ের কোষ বিচলিত হয় খুব অল্প সময়ের জন্যে (এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ)। ব্যাকস্টারের সাফল্যের পর থেকেই লরেন্স নিশ্চিত হলেন যে উদ্ভিদের কলাতন্তু মানুষের ভাব বা আবেগ গ্রহণ করতে পারে।

ডক্টর মেরি সিজার ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার অডিও-ভিজুয়াল সার্ভিসেস-য়ে লরেন্সের সহকর্মী। ভদ্রমহিলার বাড়ীর একটা গাছ রহস্যজনকভাবে মারা যায়। লরেন্স তাঁকে একটা ফিলোডেনড্রন কিনে দেন। ভদ্রমহিলার উদ্বেগ বা আবেগে

দিনের বিশেষ কয়েকটা সময়ে উদ্ভিদটি সাড়া দিয়েছিল। লরেন্স অবশ্য হুঁশিয়ার বলেই মনে করেছিলেন, ব্যাপারটা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে ঘটছে।

১৯৬৯ সালের অক্টোবরে এই বিষয়ে পর-পর প্রবন্ধ লেখেন লরেন্স। 'ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড দি লিভিং প্লান্ট' প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়েছিল 'ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড' জার্নালে। লরেন্স বলেছিলেন, এই প্রথম গাছেদের ইলেকট্রোডায়নামিক প্রপার্টি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। মূল চারটে প্রশ্ন করেছিলেন লরেন্স। তার মধ্যে একটা ছিল, সাড়ে তিন লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কোনটি ইলেকট্রনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময়? উনি এমন কথাও বলেছিলেন যে হাবার্ড নামে এক গবেষক দেখেছেন, টম্যাটোর একপাশে খোঁচা মারলে অপর পাশটা শিউড়ে ওঠে।

ছ-মাস পরে একই জার্নালে 'ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড প্যারাসাইকোলজি' প্রবন্ধে লরেন্স প্রশ্ন তুলেছিলেন মানুষের সত্তায় এমন কোনো সংবেদনশীলতা কি আছে যা চাপা পড়ে গেছে আধুনিক ভাব বিনিময় ব্যবস্থার ফলে?

লরেন্স একটা চমকপ্রদ খবর দিয়েছিলেন। ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ফেডেরিকো কাজামালি একটা আলট্রা-হাই-ফ্রিকোয়েন্সি যন্ত্র বানিয়েছিলেন মানবিক টেলিপ্যাথি পরীক্ষা করার জন্যে—অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যন্ত্র-ব্যবহারের তিনিই প্রথম সূচনা করেন পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট ডিকটেটর বেনিটো মুসোলিনী গবেষণাটা গোপনীয় ঘোষণা করে-ছিলেন।

'পপুলার ইলেকট্রনিক্স' পত্রিকার জুন, ১৯৭১ সংখ্যায় লরেন্স লিখেছিলেন গাছেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে অত্যধিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর। ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করলে মারাও যেতে পারে।

জান মারতা হলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার এক পুস্তক প্রকাশক। ফিজিওলজি-ক্যাল সাইকোলজির একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন ভদ্রলোক। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। কামারের গনগনে লোহার স্ফুলিঙ্গ হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারতেন—যেন তাক থেকে ধুলো ঝাড়ছেন এমনিভাবে। কানাডায় বসবাস করার পর একদিন খবর পেলেন এক উদ্ভিদ প্রেমিকের বহু গাছ কাহিল হয়ে পড়ছে। কারণ অন্বেষণ করতে গেলেন মারথা। দেখলেন, গাছের দল থেকে একটা গাছকে বার করে নিয়ে গেলে নিঃসঙ্গতায় গাছটা মুষড়ে পড়ছে। মারাও যাচ্ছে কয়েক ক্ষেত্রে। দলের মধ্যে ফিরিয়ে দিলে আবার স্বাস্থ্য-ঝলমলে হয়ে উঠছে।

বাড়ী বাড়ী ডাক পড়ত মারথার গাছেদের রোগ নির্ণয়ের জন্যে; লক্ষ্য করলেন, গাছের মালিক নিজে যত্ন নিলে গাছ তরতাজা থাকে—একলা ফেলে

রাখলে ঝিমিয়ে পড়ে। ফ্লোরিডা থেকে প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা 'ফাইকাস বেঞ্জামিন' গাছটাকে এনে ফোয়ারার পাশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। গাছ নেতিয়ে পড়েছিল জল এবং পুষ্টি দেওয়া সত্ত্বেও। সেখান থেকে সরিয়ে লোক যাতায়াতের পথের পাশে রাখতেই গাছের স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধার ঘটেছিল।

১৯৭০য়ে লরেন্স শুনলেন রেডিও-তরঙ্গ দিয়ে ইউক্রেন-য়ে গাছের বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আলট্রাসনিক ভাইব্রেশনও কাজ দিয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগও সফল হয়েছে এই এক্সপেরিমেণ্টে। তাই যদি হয় তাহলে সার দিয়ে মাটি নষ্ট না করে গাছপালার বৃদ্ধি ঘটানো তো সম্ভব বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে!

শব্দ জাতীয় উদ্ভিদ-উদ্দীপক নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন লরেন্স। তারপর পড়লেন দোটানায়। আন্তঃনাক্ষত্রিক ভাব বিনিময় তাঁর মূল লক্ষ্য—তাহলেই পৃথিবীর বাইরেকার প্রাণী জগতের অস্তিত্ব ধরা যাবে। ভেবে দেখলেন, এই নিয়েই ব্যস্ত থাকা যাক। উদ্ভিদ জগতের অনেক প্রহেলিকার সমাধান তো হবেই, পৃথিবীর বাইরের ধীমান জগতেরও সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৯৭৩ সালের ৫ই জুন সান বার্নার্ডিনোর অ্যাঙ্কর কলেজ অফ ট্রুথ ঘোষণা করল বিশ্বের প্রথম জৈবিক আন্তঃনাক্ষত্রিক বার্তাবিনিময় মানমন্দিরের উদ্বোধন ঘটেছে সেখানে। গবেষণা পরিচালনা করবেন লরেন্স। যে যন্ত্রটা উনি উদভাবন করলেন, তার নাম দিলেন 'স্টেলারটন'। ওজন, তিন টন। তার মধ্যে আছে একটা রেডিও টেলিস্কোপ আর জৈবিক সংকেত গ্রহণের বায়োডায়নামিক ফিল্ড স্টেশন।

অ্যাঙ্করের প্রেসিডেণ্ট এড জনসন বললেন, রেডিও অ্যাসট্রনমি মহাশূন্যের ইনটেলিজেণ্ট সংকেত গ্রহণে যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন এই প্রতিষ্ঠান লরেন্সের গবেষণাকে মদৎ দেবে—জৈবিক বার্তাবিনিময় বেতার-ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত হটিয়ে দেবেই।

লরেন্স হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, মহাবিশ্বের যতদূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চালানো যায়, তার মধ্যেই ১০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, গ্রহ পৃথিবীতে সংকেত পাঠাতে পারে।

অ্যাঙ্করের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড হ্যারেল বলেছিলেন, মানুষ বড় ধ্বংসকামী নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। অন্যান্য গ্রহের মমতাময় ধীমান জীবের সঙ্গে ভাববিনিময় ঘটলে মানুষেরই উপকার হবে।

লরেন্স বলেছিলেন, সম্ভবতঃ উদ্ভিদরাই একমাত্র খাঁটি অপার্থিব যারা পৃথিবীর খনিজ সম্পদকে যেন ম্যাজিকের মাধ্যমে প্রাণীজগতের বেঁচে থাকার উপযুক্ত করে তুলেছে! এখন আমাদের কাজ হল অকাল্ট বাদ দিয়ে ফিজিক্সের মাধ্যমে গাছের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা।

লরেন্স যদি সফল হন, তাহলে ধাতুর তৈরী যন্ত্রযান পাঠিয়ে মহাবিশ্বে ধীমান জীবের অন্বেষণ পুরোনো এবং বাতিল হয়ে যাবে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ লাগে সংকেত আসতে—সেক্ষেত্রে দরকার শুধু একটা 'টেলিফোন নাম্বারের'। গাছেরা সানন্দে সাহায্য করবে আমাদের এ-ব্যাপারে।

সর্বশেষ সোভিয়েত আবিষ্কার

শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নয়, সোভিয়েত দেশও উৎসাহী হয়েছে গাছেদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ক্ষমতা সম্পর্কিত গবেষণায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা'তে ১৯৭০-য়ের অক্টোবরে লেখা হয় একটা প্রবন্ধ—'গাছের পাতারা কি বলে আমাদের?' 'গাছেরা কথা বলে···হ্যাঁ, তারা ককিয়ে চেঁচিয়েও ওঠে। মনে হয় যেন, মুখ বুঁজে দুর্ভাগ্য সয়, যন্ত্রণায় উচ্চবাচ্য করে না।' প্রাভদার রিপোর্টার চার্টকভ চমৎকৃত হয়েছিলেন মস্কোর তিমিরিয়াজেভ অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচার সায়েন্সে অসাধারণ কাণ্ডকারখানা দেখে।

লিখেছিলেন, 'আমার চোখের সামনেই যবের অংকুরটা যেন আক্ষরিক অর্থে কেঁদে উঠল গরম জলে ডুবিয়ে ধরতেই। বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সেন্সিটিভ ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেণ্টেই কেবল ধরা পড়ল উদ্ভিদটার 'কণ্ঠস্বর'। যেন নিতল অশ্রু দুলে উঠল চওড়া কাগজের ফিতেতে। মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির যবের যন্ত্রণায় যেন ছটফটিয়ে উঠল সাদা কাগজের ওপর রেকর্ডিং পেনটা। সবুজ পাতাগুলো দেখে অবশ্য বোঝাও গেল না তার দেহযন্ত্রগুলো মারা যাচ্ছে। এক ধরনের 'মস্তিষ্ক কোষ' যেন বলে দিলে কি ঘটছে তার ভেতরে।'

প্রাভদার রিপোর্টার অ্যাকাডেমির প্ল্যাণ্ট ফিজিওলজি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান প্রফেসর ইভান ইসিডোরোভিচ গুণার-য়র সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শ-য়ে শ-য়ে এক্সপেরিমেণ্ট করে প্রফেসর প্রমাণ পেয়েছিলেন যে মানুষের ক্ষেত্রে স্নায়ুর 'ইমপাল্‌স্‌' যেমন একটা সর্বজ্ঞাত ঘটনা, গাছেদেরও তেমনি 'ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌স্‌' আছে। প্রফেসর গুনার এমনভাবে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতেন যেন মনে হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। গাছেরাও যেন পক্ককেশ সৌম্য মানুষটার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকত।

প্রফেসর গুনায়ের চীফ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আগে ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। টেকনলজি ছেড়ে দিয়ে গাছ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন গাছেদের জীবন আছে, এই বিশ্বাস নিয়ে। দিন যদি লম্বা হয়, গাছ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে—রাতে বিশ্রাম নেয়—এই তথ্য স্পেশ্যাল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। বলেছিলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন গাছেরা গাছ-ঘরের আলো নিজেরাই নিভোতে আর জ্বালাতে পারবে। শুনে যেন মনে হয় সায়েন্স-ফিকশন! গাছেদের যে স্মৃতি

শক্তি আছে, তাও আঁচ করেছিলেন। ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ তাদের ডুবিয়ে রাখার পর উষ্ণ জলে ডোবাতেই বেশ কিছুক্ষণ নিঃসাড় থেকেছে তারা—ঠাণ্ডা-স্মৃতি যেন জ্বল জ্বল করছে সত্তার মধ্যে।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এবং রোগ-আরোগ্যকারী বিশ্বের বিস্ময় এডগার কেসি প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আমেরিকান প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় এসেছিলেন ১৯৭১য়ের গ্রীষ্মে। প্রত্যেকেই বিজ্ঞানবিদ্। 'Are Plants Sentient ?' নামক পানিশকিনের একটা ফিল্ম তাঁরা দেখেছিলেন। রোদ্দুর, হাওয়া, মেঘ, অন্ধকার, মাছি, মৌমাছির উপস্থিতিতে গাছেদের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেখেছিলেন কেমিক্যালে বা আগুনে জখম হলে গাছ কি রকম কাতরায়। অতর্কিত আঘাতে একটা পাতার বায়োপোটেনশিয়াল পাল্স্ কিভাবে ক্লোরোফর্ম বাষ্পে মিলিয়ে যায়, তাও লক্ষ্য করেছিলেন। চমৎকৃত হয়েছিলেন টাইম-ল্যাপ্স্ ফটোগ্রাফি মারফৎ বিধৃত বৃদ্ধি-পাওয়ার-সময়ে গাছেদের নৃত্য দেখে। ফুল ফুটছে, অন্ধকার হলে বন্ধ হচ্ছে—ঠিক যেন অন্য এক সময়ে-ক্ষেত্রের প্রাণী এই গাছেরা।

১৯৭২ য়ের এপ্রিলে সুইস্ খবরের কাগজ Weltwoche-তে খবর বেরোয় যে একই সাথে আলাদা আলাদা ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে গুনার এবং ব্যাকস্টারের এক্সপেরিমেণ্ট। প্রবন্ধটা অনূদিত হয় রাশিয়ান ভাষায়। নাম দেওয়া হয়—'গাছেদের বিচিত্র জগৎ'। বলা হয়, গাছেরা সংকেত গ্রহণ করে, ভেতরকার কোনো একটা কেন্দ্রে জবাব তৈরী করে নিয়ে প্রেরণ করে। নার্ভাস সেণ্টারটা শেকড়ের টিশুতে নিহিত থাকতে পারে। মানুষের হৃদ্পিণ্ডের পেশীর মত এই টিশু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। তাদের জীবনের ছন্দ আছে। নিয়মিত ব্যবধানে বিশ্রাম এবং প্রশান্তি পাওয়ার পর মারা যায়।

প্রবন্ধটা মস্কো নিউজপেপার 'ইজভেস্তিয়া'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিপোর্টার পাঠায় সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্রের রসদ সংগ্রহের জন্যে। রিপোর্টার স্বীকার করেন, গাছদের স্মৃতিশক্তি, ভাষা এমন কি পরার্থিতাও আছে—ব্যাকস্টারের অন্য মতবাদটা কিন্তু তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন—ফিলোডেনড্রনকে জখম করার ইচ্ছেটা মানুষের মনে এলেই সে জানতে পারে, এটা নাকি পশ্চিমী খবরের কাগজের রটনা। উনি তাই লেনিনগ্রাদে গেলেন অ্যাগ্রোফিজিক্স ইন্সটিটিউটের বায়োসিবারনেটিক্স ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করতে—তাঁর মতামত জানতে।

চল্লিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে গাছেদের তাপমাত্রা, জলীয় পদার্থের প্রবাহবেগ, বৃদ্ধিবেগ ইত্যাদি তো মেপেই ছিল, সেইসঙ্গে পরিমাপ করেছিল কখন এবং কতখানি জল একটা গাছ পান করতে চায়, কখন বেশী পুষ্টি চায়, কখন শীতবোধ করে, কখন গরমবোধ করে; যন্ত্র

লরেন্স যদি সফল হন, তাহলে ধাতুর তৈরী যন্ত্রযান পাঠিয়ে মহাবিশ্বে ধীমান জীবের অন্বেষণ পুরোনো এবং বাতিল হয়ে যাবে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ লাগে সংকেত আসতে—সেক্ষেত্রে দরকার শুধু একটা 'টেলিফোন নাম্বারের'। গাছেরা সানন্দে সাহায্য করবে আমাদের এ-ব্যাপারে।

সর্বশেষ সোভিয়েত আবিষ্কার

শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নয়, সোভিয়েত দেশও উৎসাহী হয়েছে গাছেদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ক্ষমতা সম্পর্কিত গবেষণায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা'তে ১৯৭০-য়ের অক্টোবরে লেখা হয় একটা প্রবন্ধ—'গাছের পাতারা কি বলে আমাদের ?' 'গাছেরা কথা বলে···হ্যাঁ, তারা কঁকিয়ে চেঁচিয়েও ওঠে। মনে হয় যেন, মুখ বুঁজে দুর্ভাগ্য সয়, যন্ত্রণায় উচ্চবাচ্য করে না।' প্রাভদার রিপোর্টার চার্টকভ চমৎকৃত হয়েছিলেন মস্কোর তিমিরিয়াজেভ অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচার সায়েন্সে অসাধারণ কাণ্ডকারখানা দেখে।

লিখেছিলেন, 'আমার চোখের সামনেই যবের অংকুরটা যেন আক্ষরিক অর্থে কেঁদে উঠল গরম জলে ডুবিয়ে ধরতেই। বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সেন্সিটিভ ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেণ্টেই কেবল ধরা পড়ল উদ্ভিদটার 'কণ্ঠস্বর'। যেন নিতল অশ্রু দুলে উঠল চওড়া কাগজের ফিতেতে। মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির যবের যন্ত্রণায় যেন ছটফটিয়ে উঠল সাদা কাগজের ওপর রেকর্ডিং পেনটা। সবুজ পাতাগুলো দেখে অবশ্য বোঝাও গেল না তার দেহযন্ত্রগুলো মারা যাচ্ছে। এক ধরনের 'মস্তিষ্ক কোষ' যেন বলে দিলে কি ঘটছে তার ভেতরে।'

প্রাভদার রিপোর্টার অ্যাকাডেমির প্ল্যাণ্ট ফিজিওলজি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান প্রফেসর ইভান ইসিডোরোভিচ গুণার-য়র সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শ-য়ে শ-য়ে এক্সপেরিমেণ্ট করে প্রফেসর প্রমাণ পেয়েছিলেন যে মানুষের ক্ষেত্রে স্নায়ুর 'ইমপাল্‌স্' যেমন একটা সর্বজ্ঞাত ঘটনা, গাছেদেরও তেমনি 'ইলেকট্রিক্যাল ইমপালস্' আছে। প্রফেসর গুনার এমনভাবে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতেন যেন মনে হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। গাছেরাও যেন পক্ককেশ সৌম্য মানুষটার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকত।

প্রফেসর গুনায়ের চীফ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আগে ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। টেকনলজি ছেড়ে দিয়ে গাছ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন গাছেদের জীবন আছে, এই বিশ্বাস নিয়ে। দিন যদি লম্বা হয়, গাছ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে—রাতে বিশ্রাম নেয়—এই তথ্য স্পেশ্যাল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। বলেছিলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন গাছেরা গাছ-ঘরের আলো নিজেরাই নিভোতে আর জ্বালাতে পারবে। শুনে যেন মনে হয় সায়েন্স-ফিকশন! গাছেদের যে স্মৃতি

শক্তি আছে, তাও আঁচ করেছিলেন। ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ তাদের ডুবিয়ে রাখার পর উষ্ণ জলে ডোবাতেই বেশ কিছুক্ষণ নিঃসাড় থেকেছে তারা—ঠাণ্ডা-স্মৃতি যেন জ্বল জ্বল করছে সত্তার মধ্যে।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এবং রোগ-আরোগ্যকারী বিশ্বের বিস্ময় এডগার কেসি প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আমেরিকান প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় এসেছিলেন ১৯৭১য়ের গ্রীষ্মে। প্রত্যেকেই বিজ্ঞানবিদ্। 'Are Plants Sentient ?' নামক পানিশকিনের একটা ফিল্ম তাঁরা দেখেছিলেন। রোদ্দুর, হাওয়া, মেঘ, অন্ধকার, মাছি, মৌমাছির উপস্থিতিতে গাছেদের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেখেছিলেন কেমিক্যালে বা আগুনে জখম হলে গাছ কি রকম কাতরায়। অতর্কিত আঘাতে একটা পাতার বায়োপোটেনশিয়াল পাল্‌স্ কিভাবে ক্লোরোফর্ম বাষ্পে মিলিয়ে যায়, তাও লক্ষ্য করেছিলেন। চমৎকৃত হয়েছিলেন টাইম-ল্যাপ্‌স্ ফটোগ্রাফি মারফৎ বিধৃত বৃদ্ধি-পাওয়ার-সময়ে গাছেদের নৃত্য দেখে। ফুল ফুটছে, অন্ধকার হলে বন্ধ হচ্ছে—ঠিক যেন অন্য এক সময়ে-ক্ষেত্রের প্রাণী এই গাছেরা।

১৯৭২ য়ের এপ্রিলে সুইস্ খবরের কাগজ Weltwoche-তে খবর বেরোয় যে একই সাথে আলাদা আলাদা ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে গুনার এবং ব্যাকস্টারের এক্সপেরিমেণ্ট। প্রবন্ধটা অনূদিত হয় রাশিয়ান ভাষায়। নাম দেওয়া হয়—'গাছেদের বিচিত্র জগৎ'। বলা হয়, গাছেরা সংকেত গ্রহণ করে, ভেতরকার কোনো একটা কেন্দ্রে জবাব তৈরী করে নিয়ে প্রেরণ করে। নার্ভাস সেণ্টারটা শেকড়ের টিশুতে নিহিত থাকতে পারে। মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীর মত এই টিশু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। তাদের জীবনের ছন্দ আছে। নিয়মিত ব্যবধানে বিশ্রাম এবং প্রশান্তি পাওয়ার পর মারা যায়।

প্রবন্ধটা মস্কো নিউজপেপার 'ইজভেস্তিয়া'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিপোর্টার পাঠায় সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্রের রসদ সংগ্রহের জন্যে। রিপোর্টার স্বীকার করেন, গাছদের স্মৃতিশক্তি, ভাষা এমন কি পরার্থিতাও আছে—ব্যাকস্টারের অন্য মতবাদটা কিন্তু তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন—ফিলোডেনড্রনকে জখম করার ইচ্ছেটা মানুষের মনে এলেই সে জানতে পারে, এটা নাকি পশ্চিমী খবরের কাগজের রটনা। উনি তাই লেনিনগ্রাদে গেলেন অ্যাগ্রোফিজিক্স ইন্সটিটিউটের বায়োসিবারনেটিক্স ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করতে—তাঁর মতামত জানতে।

চল্লিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে গাছেদের তাপমাত্রা, জলীয় পদার্থের প্রবাহবেগ, বৃদ্ধিবেগ ইত্যাদি তো মেপেই ছিল, সেইসঙ্গে পরিমাপ করেছিল কখন এবং কতখানি জল একটা গাছ পান করতে চায়, কখন বেশী পুষ্টি চায়, কখন শীতবোধ করে, কখন গরমবোধ করে; যন্ত্র

মারফৎ সংকেতে জানাতো কখন জল পান করতে চায়। একেবারেই ঢক ঢক করে খেতো না, ঘণ্টায় দু-মিনিটের বেশী নয়।

রিপোর্টার ভদ্রলোক তাজ্জব হয়ে গেছিলেন এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে। বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর মানুষের কারিগরি ক্ষমতার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল অনুভূতি সচেতনতা।

অধ্যক্ষ ভদ্রলোকের নাম কারামানভ। সাক্ষাৎকারের সময়ে ব্যাকস্টারের প্রকৃত আবিষ্কার 'গাছেদের মানুষের চিন্তা বা আবেগ পাকড়াও করার ক্ষমতা' নিয়ে একটা কথাও বলেননি। শুধু প্রশ্ন করেছিলেন রিপোর্টারকে—গাছেরা কি আকার চিনতে পারে? কোন্ মানুষ তাদের ক্ষতি করছে, আর কে তাদের জল দিচ্ছে—তফাৎ বুঝতে পারে? জবাবটা নিজেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন —"এ প্রশ্নের জবাব আজ আমি দিতে পারব না। আজও ব্যাকস্টার অথবা আমরা কেউই প্রস্তুত হইনি 'সমস্ত' গাছেদের প্রতিক্রিয়া, শ্রবণক্ষমতা, চীৎকার বা কথাবার্তার সংকেত উদ্ধারের ব্যাপারে।"

কারামানভ আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সিবারনেটিক্স দিয়ে গাছেরা সম্ভবতঃ নিজেদের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়ে তর তর করে বেড়ে উঠে প্রচুর ফলন দিতে পারবে। চাষবাসে যুগান্তর আসবে। সব্জী আর ফলের অভাব থাকবে না।

ইজভেসতিয়া প্রবন্ধের ঠিক পরেই আর একটি রাশিয়ান মাসিক পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরোয়। ম্যাগাজিনটার নাম বাংলায় 'বিজ্ঞান আর ধর্ম'। লেখকের নাম মারকুলভ। তিনি লেখেন, 'আমেরিকান অপরাধ বিজ্ঞানী' ব্যাকস্টার এমন কিছু নতুন কথা বলেন নি। গাছেরা যে মানুষের মেজাজে সাড়া দেয় অথবা তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিশক্তি আছে, এমন কাণ্ড আলমা আটা-র স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আগেই লক্ষিত হয়েছে। যেমন হাইড্রোজেন ল্যাম্পের ফ্ল্যাশ কতক্ষণ অন্তর ঝলসাচ্ছে, মটরশুঁটি, আলু, গম তা মনে রাখে। ক্রফুট আঠারো ঘণ্টা ব্যবধানের ফ্ল্যাশ যখন মনে রাখতে পারে, তখন তাদের দীর্ঘ স্মৃতিশক্তিও আছে বলা যায়।

শুধু কি তাই, গাছেদের দিয়ে একদিন খনিজ অন্বেষণও করা যাবে। কেন না, পাশাপাশি যদি খনিজ সমৃদ্ধ আকর আর শুধু পাথর রাখা যায়, গাছেরা তা বুঝতে পারে।

'ফুল, জবাব দাও!' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের শেষের দিকে জনপ্রিয় একটি রঙিন পত্রিকায়—বাংলায় যার নাম 'জ্ঞানই শক্তি'। তাতে লেখা হয় সম্মোহিত ব্যক্তিরা আরো সরাসরি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাছের দিকে আবেগের অভিক্ষেপ ঘটাতে পারে—স্বাভাবিক ব্যক্তির পক্ষে যা সম্ভব নয়। বুল-

গোরিয়ান হিপনোটিস্ট জাঁজ অ্যান্‌গুশেভ-কে দিয়ে এই এক্সপেরিমেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মোহিত মেয়েটির আশি সেণ্টিমিটার তফাতে একটা ফুলের সঙ্গে এন্‌কেফালোগ্রাফ অর্থাৎ ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজ মাপবার যন্ত্র লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। হিপনোটিস্টের হুকুমে মেয়েটি আনন্দে ডগমগ হতেই পেন রেকর্ডার এঁকেছিল একরকম রেখাচিত্র, শৈত্যবোধের আদেশে ঠকঠক করে কাঁপতেই পেন রেকর্ডার এঁকেছিল অন্যরকম রেখাচিত্র। ফুলটির সঙ্গে যেন সরাসরি যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটির !

ব্যাকস্টার দাবী করেছিলেন, গাছেরা নাকি মিথ্যা ধরতে পারে। যাচাই করা হয়েছিল সম্মোহিত মেয়েটিকে দিয়ে। তাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার যে কোনো একটি সংখ্যাকে মনে করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এক থেকে দশ পর্যন্ত বলে গেলে প্রতিবারেই যেন 'না' বলে মেয়েটি এমনটা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যেন মিথ্যা বলে—যে সংখ্যাটি মনে করেছে, তা যেন কখনোই মুখে না প্রকাশ করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! পাঁচ সংখ্যাটিবলা মাত্র মেয়েটি অস্বীকার করলেও গাছটা প্রবল এবং সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল গ্রাফ পেপারে। পাঁচ সংখ্যাটিই মনে মনে ভেবেছিল মেয়েটি ! মিথ্যাকথন সহ্য করতে পারেনি উদ্ভিদ মহাশয় !

'ফুল, জবাব দাও !' প্রবন্ধের লেখক পুশকিন প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন, এই সব এক্সপেরিমেণ্টের পর মনে হয়, গাছেদের কোষ আর মানুষের স্নায়ুকোষের ভাষায় একটা সম্পর্ক আছে। একেবারেই আলাদা সজীব দুরকমের কোষেরা যেন পরস্পরকে বুঝতে পারে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানে বিপ্লব সৃষ্টি করা যাবে গাছ আর মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আরো গবেষণা চালালে।

গাছের জগতের ম্যাজিক আর মিস্ট্রি নিয়ে শেষকালে একটা চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ লেখা হয়। জনপ্রিয় লেখক ভ্‌লাডিমির সলোখিন বইটি চারখণ্ডে প্রকাশ করেন তিরিশ লক্ষ সার্কুলেশনের ম্যাগাজিন 'বিজ্ঞান এবং জীবন' পত্রিকায়। বইটার নাম ছোট্ট—'ঘাস'। গুনারের এক্সপেরিমেণ্ট প্রেরণা জোগায় লেখককে। অবাক হন রাশিয়ানদের মধ্যে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চারিত না হওয়ায়। গাছেরা অনুভব করতে পারে ! যন্ত্রণার শিউরে উঠতে পারে ! চেঁচায় ! মনে রাখে সমস্ত ! সোভিয়েট অ্যাকাডেমি সায়েন্সের এক নামী বৈজ্ঞানিক যে গাছেদের এই সংবেদনশীলতা নিয়ে চমৎকৃত হয়েছে, সে খবরও দেন সলোখিন। গাছের ওপর অত্যাচার করার বাসনা নিয়ে কাছে এলেই গাছ বেচারী নাকি নার্ভাস হয়, ভয় পায়, পারলে যেন জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ত। বিশেষ ব্যক্তিটি দূরে সরে গেলেই শান্ত হয় যখন জল দেওয়ার ব্যক্তি কাছে আসে।

সলোখিন কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনার খবর রাখতেন না। শত্রুমিত্র চেনবার ক্ষমতা ছাড়াও অব্যাখ্যাত কি এক উপায়ে বঞ্চিত প্রতিবেশীকে জল দিয়ে বাঁচিয়ে

রাখতে পারে গাছেরা। ব্যাপারটা দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। কিছুতেই বুঝতে পারেন নি কাঁচের কয়েদ ঘরে বন্দী জল-বঞ্চিত জল পেল কি করে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে !

সলৌখিন কিন্তু 'ঘাস' বইটিতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের একহাত নিয়েছিলেন গাছেদের অবহেলা করার জন্যে। গাছহীন দুনিয়াটাকে কল্পনা করতে বলেছিলেন।

লিখেছিলেন আরও একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। গাছেদের কাছে যেন হাজার বছরের ফারাকটা কিছুই নয়। তা না হলে টুটেনখামেনের সমাধি-মন্দিরে যে ফুলের মালা পাওয়া গিয়েছিল, তার বর্ণ অমন তাজা থাকে কি করে ? রাজসম্পদ, রাজসমারোহ সবই কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে, হয়নি কেবল ফারাওয়ের বিধবা পত্নী রক্ষিত পুষ্পমালার বর্ণসমারোহ !

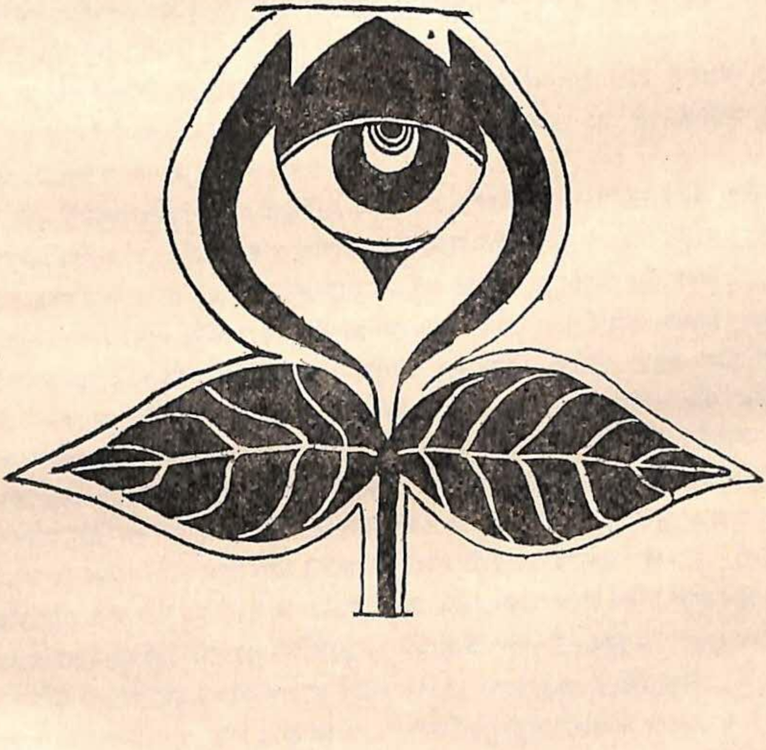
কয়লা, তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস—এই তিনটেই সৌরশক্তির তিন রকমের চেহারার জ্বালানি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে এই তিন জ্বালানির বদলে অন্য এক রকমের সৌরশক্তির সন্ধানে আছেন, তা প্রকাশ পেয়েছিল 'রসায়ন এবং জীবন' পত্রিকার ১৯৭৩ সংখ্যায়। আমেরিকান নোবেল প্রাইজ প্রাপক মেলভিন ক্যালভিন ফটোসিনথেসিস নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন, সূর্যকিরণের প্রভাবে গাছের ক্লেরোফিল জিঙ্ক অক্সাইডের মত সেমি-কনডাকটরে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে। একটা 'গ্রীন ফটো এলিমেণ্ট'ও সৃষ্টি করেছিলেন ক্যালভিন যা প্রতি বর্গসেণ্টিমিটারে ০.১ মাইক্রো-অ্যাম্পায়ার কারেণ্ট উৎপাদন করতে পারত। কয়েক মিনিট পরে গাছের ক্লোরোফিল নিঃশেষিত হয়ে গেলে সল্ট সলিউশনে হাইড্রোকুইনোন মিশিয়ে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে তাকে কাজে লাগিয়ে ক্লোরোফিলকে আবার শক্তিপূর্ণ করা যেত। হিসেব করে দেখেছিলেন ক্যালভিন একটা ক্লোরোফিল ফটো এলিমেণ্ট দশ বর্গমিটার পরিমিত জায়গায় এক কিলোওয়াট পাওয়ার উৎপাদন করতে পারে। বলেছিলেন, ব্যাপক হারে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে সিকি শতাব্দীর মধ্যে সিলিকন সোলার ব্যাটারীর চাইতেও একশ গুণ সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

প্রফেসর গুনার কিন্তু গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বিপুল উদ্যমে। তাঁর মূল প্রেরণা এসেছিল যে প্রবন্ধ পড়ে তা লিখেছিলেন তাঁরই একই সহকর্মী —সিন্যুখিন। এই প্রবন্ধে একজন ভারতীয় ফিজিয়লজিস্ট এবং বায়োফিজিসিস্টের উল্লেখ ছিল—যিনি জীবদ্দশায় প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন—মৃত্যুর পরেও তাঁর নামোল্লেখ একটা বিরল ঘটনা। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সোভিয়েত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগেন এবং ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে এই ভারতীয় ঋষির দু-শ'তম জন্মদিবস পালন করেন অ্যাকাডেমি অফ

সায়েন্সের মূল সম্মেলন কক্ষে। একবাক্যে স্বীকার করেন উপেক্ষিত এই ভারতীয় তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছেন। ছ-বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে সম্মানিত করেন তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী দুখণ্ডের সুদৃশ্য সচিত্র একটি গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করে। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯০২ সালে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এ ব্যাপারে, সেগুলিকেও সংগ্রহ করে ছাপা হয় একটি খণ্ডে (Response in the Living and Non-Living)।

এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। রচনাবলীর মধ্যে ইনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীতে এখন প্রয়োজন প্রাচীন প্রাচ্যের জ্ঞান আর আধুনিক পাশ্চাত্যের সায়েণ্টিফিক টেকনিক এবং ভাষার সমন্বয় সাধন।

দ্বিতীয় খণ্ড



উদ্ভিদ রহস্যের পথিকৃৎ যাঁরা

দশ লক্ষ গুণ বিবর্ধিত উদ্ভিদ-জীবন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, নর্থ ক্যালকাটা। প্রাক-মুসলিম ক্লাসিক ডিজাইনের একটা বাড়ী রয়েছে প্রায় বারো বিঘে জমির ওপর। মূল ভবনটিকে বলা হয় ইণ্ডিয়ান টেম্পল অফ সায়েন্স। ফলকে যা লেখা আছে, তা এইঃ এই মন্দির উৎসর্গ করা হ'ল ঈশ্বরের নামে যাতে তিনি সম্মান এনে দেন ভারতকে, শান্তি দেন বিশ্বকে।

এই ভবনের কাঁচের আধারে রাখা আছে পঞ্চাশ বছর আগে উদ্ভাবিত এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যা গাছপালার বৃদ্ধি আর আচরণ প্রক্রিয়া দশ কোটি গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত আকারে ধরতে পারে। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের বিপুল ধীশক্তির চাক্ষুস প্রমাণ এই ইন্সট্রুমেণ্ট।

মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয় যে প্ল্যান্ট ফিজিওলজিতে ইনি এতদূর এগিয়েছিলেন যে সমসাময়িক কেউ তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে নি।

বড় বিচিত্র জীবন স্যার জগদীশ বোসের। পড়েছিলেন পাঠশালায়, পশ্চিমী অনুকরণ থেকে ছেলেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর বাবা। চার বছর বয়েসে এমন একজনের কাঁধে চেপে পাঠশালায় যেতেন পূর্ব জীবনে যে ছিল ডাকাত সর্দার—জেল খেটে এসে চাকরী নিয়েছিলেন বালক জগদীশের বাবার কাছে। জীবনের প্রথম শিক্ষা এই প্রাক্তন ডাকাত সর্দারের কাছেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি—সমাজ পরিত্যক্ত এই মানুষটি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁর মনকে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ফিজিক্স আর গণিতে তাঁর দক্ষতা দেখে চমৎকৃত হয়ে কলেজের ফাদার লাফণ্ট তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। জগদীশের বাবা কিন্তু এই পেশার ভয়াবহতা সম্যক উপলব্ধি করে ছেলেকে কেম্ব্রিজের ক্রাইস্টস্ কলেজে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়তে পাঠালেন। ফিরে এসে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক পদ পেলেন। কিন্তু একজন ভারতীয় ইংরেজদের টপকে মাথায় গিয়ে বসবে, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মতে কোনো ভারতীয়ই নাকি বিজ্ঞান পড়ানোর উপযুক্ত নয়। তাই তাঁর মাইনে ইংরেজদের মাইনের অর্ধেক করে দেওয়া হল। অপমানিত জগদীশবাবু তিন বছর বেতনের চেক স্পর্শ না করে পড়িয়ে গেলেন। প্রতিটি লেকচার শুনতে ঘরে তিলধারণের জায়গা থাকত না, এত ভাল পড়াতেন তিনি। শেষকালে হার মানল কর্তৃপক্ষ—মাইনে দেওয়া হল তাঁর সম্মান ও যোগ্যতা অনুসারে।

দশ লক্ষ গুণ বিবর্ধিত উদ্ভিদ-জীবন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, নর্থ ক্যালকাটা। প্রাক-মুসলিম ক্লাসিক ডিজাইনের একটা বাড়ী রয়েছে প্রায় বারো বিঘে জমির ওপর। মূল ভবনটিকে বলা হয় ইণ্ডিয়ান টেম্পল অফ সায়েন্স। ফলকে যা লেখা আছে, তা এই ঃ এই মন্দির উৎসর্গ করা হ'ল ঈশ্বরের নামে যাতে তিনি সম্মান এনে দেন ভারতকে, শান্তি দেন বিশ্বকে।

এই ভবনের কাঁচের আধারে রাখা আছে পঞ্চাশ বছর আগে উদ্ভাবিত এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যা গাছপালার বৃদ্ধি আর আচরণ প্রক্রিয়া দশ কোটি গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত আকারে ধরতে পারে। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের বিপুল ধীশক্তির চাক্ষুস প্রমাণ এই ইন্সট্রুমেণ্ট।

মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয় যে প্ল্যান্ট ফিজিওলজিতে ইনি এতদূর এগিয়েছিলেন যে সমসাময়িক কেউ তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে নি।

বড় বিচিত্র জীবন স্যার জগদীশ বোসের। পড়েছিলেন পাঠশালায়, পশ্চিমী অনুকরণ থেকে ছেলেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর বাবা। চার বছর বয়েসে এমন একজনের কাঁধে চেপে পাঠশালায় যেতেন পূর্ব জীবনে যে ছিল ডাকাত সর্দার—জেল খেটে এসে চাকরী নিয়েছিলেন বালক জগদীশের বাবার কাছে। জীবনের প্রথম শিক্ষা এই প্রাক্তন ডাকাত সর্দারের কাছেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি—সমাজ পরিত্যক্ত এই মানুষটি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁর মনকে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ফিজিক্স আর গণিতে তাঁর দক্ষতা দেখে চমৎকৃত হয়ে কলেজের ফাদার লাফণ্ট তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। জগদীশের বাবা কিন্তু এই পেশার ভয়াবহতা সম্যক উপলব্ধি করে ছেলেকে কেম্ব্রিজের ক্রাইস্টস্ কলেজে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়তে পাঠালেন। ফিরে এসে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক পদ পেলেন। কিন্তু একজন ভারতীয় ইংরেজদের টপকে মাথায় গিয়ে বসবে, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মতে কোনো ভারতীয়ই নাকি বিজ্ঞান পড়ানোর উপযুক্ত নয়। তাই তাঁর মাইনে ইংরেজদের মাইনের অর্ধেক করে দেওয়া হল। অপমানিত জগদীশবাবু তিন বছর বেতনের চেক স্পর্শ না করে পড়িয়ে গেলেন। প্রতিটি লেকচার শুনতে ঘরে তিলধারণের জায়গা থাকত না, এত ভাল পড়াতেন তিনি। শেষকালে হার মানল কর্তৃপক্ষ—মাইনে দেওয়া হল তাঁর সম্মান ও যোগ্যতা অনুসারে।

মার্কনি যখন বোলোগনায় তার-ছাড়া শূন্য-পথে ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, স্যার জগদীশ তখন সে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করে বসে আছেন। মার্কনির পেটেণ্ট যে বছর বাজারে ছাড়া হয় তার এক বছর আগেই ১৮৯৫ সালে একটা মিটিং হয়েছিল কালকাটা টাউন হলে। সভাপতি ছিলেন বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি। এই মিটিংয়ে জগদীশ বোস তিনটে দেওয়াল ফুঁড়ে লেকচার হল থেকে পঁচাত্তর ফুট দূরস্থ একটা ঘরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে একটা ভারী লোহার গোলককে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, একটা পিস্তল ছুঁড়েছিলেন এবং একটা বোমা ফাটিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি আমন্ত্রণ জানালো শ্রীবোসকে। সে দেশে পত্র পত্রিকায় ঝড় তুলে তিনি দেশে ফিরতেই রয়াল সোসাইটির চাপে ইম্পিরিয়েল গভর্ণমেণ্ট চল্লিশ হাজার পাউণ্ড অনুদান দিতে চাইল জগদীশ বোসের গবেষণার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকা আর এল না। মন ভেঙে গেল তাঁর। ভাঙা মন অবশ্য জোড়া লেগেছিল যখন নোবেল-প্রাইজ-বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা না পেয়ে এক গুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া রেখে গেছিলেন সম্মানচিহ্ন স্বরূপ।

১৮৯৯ সালে জগদীশবাবু লক্ষ্য করলেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। বেশী খাটালে ধাতু ক্লান্ত হয়, জিরেন দিলে স্বাভাবিক হয়। এই থেকেই তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষ আর পশুর মত ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারে ধাতুও—যদি বিশ্রাম পায়। নির্জীব বস্তু আর সজীব প্রাণীর টিশুর আণবিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, ঈষদুষ্ণ ম্যাগনেটিক অক্সাইড অফ আয়রন যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে পেশী-তরঙ্গের। উভয় ক্ষেত্রেই জিরেন দিলে, হাত বুলোলে বা ঈষদুষ্ণ জলে নাইয়ে দিলে ক্লান্তি কেটে যায়—হয় না কেবল পটাশিয়ামের বেলা—বিষাক্ত পেশী টিশুর মতই পটাশিয়ামকে বিভিন্ন বস্তুর সান্নিধ্যে আনলে তার আর স্বাভাবিকতা ফিরে আসে না।

১৯০০ সালে প্যারিস এক্সজিবিশনে ইণ্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ফিজিক্সে শ্রীবোস যখন বললেন, সজীব এবং অজীবের ফারাকটা খুব প্রশস্ত নয় এবং অনতিক্রম্য নয়, তখন তাজ্জব বনে গেলেন বৈজ্ঞানিকরা।

ধাতু আর প্রাণী-জীবনের এই সব বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখে জগদীশবাবুর মাথায় নতুন চিন্তা এল—উদ্ভিদ জগতেও এই সাদৃশ্য পাওয়া যাবে না কেন?

শুরু হল এক্সপেরিমেণ্ট। গাজর, বীট আর হর্স-চেস্টনাটের পাতা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে জগদীশ বোস দেখলেন, আঘাত পেলে ধাতু আর পেশী যেমন সাড়া দেয়, ঠিক সেইভাবে উদ্ভিদেরাও সাড়া জাগায় ওপর থেকে নিচের শেকড়ের ডগা পর্যন্ত। অথচ তাদের নাকি স্নায়ুতন্ত্র নেই। প্রাণীদের যেভাবে আরক

প্রভাবে আচ্ছন্ন করা যায়, জগদীশবাবু দেখলেন উদ্ভিদদেরও আচ্ছন্ন করা যায় সেইভাবে। হাওয়ায় নারকোটিক ভেপার উড়ে গেলে স্বাভাবিকতা ফিরে পায়।

১৯০১ সালের দশই মে রয়াল সোসাইটিতে আমন্ত্রিত হয়ে চার বছরের গবেষণার সংক্ষিপ্তসার নিবেদন করে সর্বশেষে জগদীশবাবু বলেছিলেন, আমার পূর্বপুরুষরা তিন হাজার বছর আগে বলে গেছিলেন, পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক এবং অদ্বিতীয়কে যারা দেখেছে, তারাই দেখেছে চিরন্তন সত্যকে—আর কেউ না, আর কেউ না !

হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছিল জগদীশবাবুর বক্তৃতায় ! আশ্চর্যের বিষয়, কেউ প্রতিবাদও জানায়নি—শেষ ক'লাইনের আধিভৌতিক ধারণা সত্ত্বেও। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ তো চাপ দিলেন, খবরদার, বক্তৃতাটা ছাপবার সময়ে শেষের ক'লাইন যেন বাদ দেওয়া না হয়। শ্রীবোসকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, যুক্তিতে আপনার খুঁত নেই। সারা জীবন ধাতুর প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছি, তাদের জীবন আছে, জেনে আমি খুব সুখী। এরকম ধারণা নাকি তাঁরও ছিল, দ্বিধাগ্রস্তভাবে ধারণাটার উল্লেখ করতে গিয়ে রয়াল ইন্সটিটিউশনে ধাক্কা খেয়েছেন।

১৯০২ সালে জগদীশবাবু তাঁর এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল ছাপিয়ে দিলেন। লণ্ডন, প্যারিস আর বার্লিনে দেওয়া বক্তৃতামালা Response in the Living and Non-Living নামক গ্রন্থে প্রকাশ করলেন। যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে গাছেদের কানকো বা ফুসফুস নেই, হজমের জন্য পাকস্থলী নেই এবং নড়াচড়ার জন্যে পেশী নেই, তাই তাঁর ধারণা হল উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের মত গাছেদেরও উত্তেজনাবোধ থাকতে পারে—জটিল স্নায়ুতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও।

পরের দুটো যুগ এই বিষয় নিয়েই গবেষণারত রইলেন জগদীশবাবু। গাছেদের সঙ্কোচন বিবর্ধিত আকারে দেখার জন্যে একটা অপটিক্যাল লিভার তৈরী করেছিলেন। সেই প্রথম এই অপটিক্যাল পাল্‌স্ রেকর্ডার দিয়ে উদ্ভিদ-দেহযন্ত্রদের নড়াচড়া দৃশ্যগ্রাহ্য করে তুলতে সক্ষম হলেন। বিজ্ঞান দুনিয়ার কাছে এতাবৎকাল অদৃশ্য ছিল এই বিপুল বিস্ময়।

এই ইন্সট্রুমেণ্ট দিয়ে জগদীশ টিকটিকি, কচ্ছপ, ব্যাঙের চামড়ার আচরণের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন আঙুর, টম্যাটো, অন্যান্য ফুল আর সব্জীর চামড়ার আচরণের। দেখিয়েছিলেন, উদ্ভিদ জগতের পরিপাক যন্ত্র প্রায় প্রাণী জগতের পাকস্থলীর অনুরূপ। দেখিয়েছিলেন, প্রাণী-চোখের রেটিনা আর বৃক্ষ-জগতের পাতায় আলোর যা প্রতিক্রিয়া, তার মধ্যে একটা কাছাকাছি সাদৃশ্য রয়েছে। একই বিবর্ধক দিয়েই প্রমাণ করেছিলেন, ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করলে পেশীর মত উদ্ভিদেরাও ক্লান্ত হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন। গরম আর ঠাণ্ডায় ঠিক কোন অবস্থায় উদ্ভিদদের নড়াচড়া

সবচেয়ে ভাল হতে পারে, এই এক্সপেরিমেণ্ট করার সময়ে একদিন দেখলেন হঠাৎ শিউরে উঠল উদ্ভিদটা—প্রাণীজগতের মরণ-খেঁচুনির মত সেই শিহরণ। মৃত্যুকালে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স ত্যাগ করল উদ্ভিদটি। জগদীশ-বাবু বলেছিলেন, পাঁচশ সবুজ মটরদানা পাঁচশ ভোল্ট উৎপাদন করতে পারে।

গাছেরা সীমাহীন পরিমাণ কার্বনডায়অক্সাইড পছন্দ করে, এই ধারণা উল্টে দিয়ে জগদীশবাবু দেখালেন, এই গ্যাস অধিক পরিমাণে তাদের দমবন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু প্রাণীদের যেমন অক্সিজেন দিয়ে বাঁচানো যায়, তাদেরও অক্সিজেন দিয়ে তাজা করে তোলা যায়। হুইস্কি অথবা জিন মদ্যে মানুষের মত উদ্ভিদরাও মাতাল হয়, পানশালার মাতালের মত টলমল করে, জ্ঞান হারায়, পরে জ্ঞান ফিরলে 'হ্যাংগ-ওভার' অথবা মদ খাওয়ার পরবর্তী ঝিমুনি ভাব থাকে। অন্ততঃ সেইরকম সুস্পষ্ট লক্ষণ তিনি দেখেছিলেন।

এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল দুটো প্রকাণ্ড খণ্ডে ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে প্রকাশ করেন জগদীশবাবু ('রেসপন্স অ্যাজ এ মিন্স অফ ফিজিয়লজিক্যাল ইনভেস-টিগেসন')। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৮১ এবং ৩১৫টা আলাদা এক্সপেরিপেণ্টের বিস্তারিত বিবরণ ছিল সেই খণ্ড দুটোয়। সাধারণ বিশ্বাসের পরিপন্থী এই বইয়ের ব্যাখ্যায় জগদীশবাবু বলেছিলেন, কমবাস্‌চন্‌ ইঞ্জিনের ক্রিয়া অথবা ঘোড়া টেনে বন্দুক ছোঁড়ার তুলনা থেকে সবাই ধরে নিয়েছেন, যে কোনো উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় দুম করে ফেটে যাওয়া রাসায়নিক পরিবর্তনের অনুরূপ হবে—এনার্জি হু-হু করে কমে যাবে পরিণাম স্বরূপ।

পক্ষান্তরে জগদীশবাবুর এক্সপেরিমেণ্টে দেখা গেল, উদ্ভিদদের নড়াচড়া, বৃক্ষ-রসের ঊর্ধ্বগতি এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটছে পরিপার্শ্ব থেকে এনার্জি আহরণের জন্যে—যে এনার্জি তারা ভবিষ্যৎ-ব্যবহারের জন্যে প্রচ্ছন্ন অথবা সঞ্চয় করে রাখতে পারে। বিপ্লবাত্মক এই আইডিয়া, বিশেষ করে উদ্ভিদদের নার্ভ আছে—এই ধারণা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের ক্ষেপিয়ে দিল—জগদীশবাবুকে তাঁরা পরম শত্রু জ্ঞান করলেন।

তাঁর দ্বিতীয় বইখানায় (কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো ফিজিয়লজি) তিনি ৩২১টা বাড়তি এক্সপেরিমেণ্ট দিয়ে দেখালেন উদ্ভিদ-জগতের স্নায়ু একক এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু প্রাণী-জগতের স্নায়ুর সঙ্গে তার পৃথকীকরণ সম্ভব নয়।

সমালোচকরা তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছেড়েছিল এইসব বিপ্লবাত্মক কথাবার্তা শুনে। কুঠরীবদ্ধ মামুলী জ্ঞান নিয়ে যাঁর সমালোচনা করেছিল, তিনি যে পঞ্চাশ বছর পরের কথা বলছেন, তারা ভাবতেও পারেনি—তাই তাঁর ধ্যান ধারণার সমঝদার হওয়ার কোনো পথ তাদের ছিল না।

বাধা পেয়ে না দমে গিয়ে যন্ত্রপাতিগুলোর আরও উন্নতি সাধন করলেন জগদীশ-

বাবু যাতে আরো সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া ধরা যায়। এবার কিন্তু ফলাফল এত বিশ্বাস-উৎপাদনকারী হল যে তা প্রকাশিত হল রয়াল সোসাইটির 'ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজ্যাকশন্স'-য়ে। সেই বছরেই জগদীশবাবু লিখলেন তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ—'রিসার্চেস্ অন ইরিটেবিলিটি অফ প্ল্যাণ্টস্', পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৭৬, এক্সপেরিমেণ্ট সংখ্যা ১৮০।

রয়াল সোসাইটি যাতে জগদীশের উদ্ভিদ-গবেষণা-বৃত্তান্ত না ছাপে, তাই একটি মাত্র বিরুদ্ধ ভোট যিনি দিয়েছিলেন, অনুতপ্ত সেই প্রাণীবিজ্ঞানী পরে এসে জগদীশবাবুর কাছে অন্যায় স্বীকার করে বলেছিলেন, এরকম ব্যাপার-স্যাপার যে ঘটতে পারে, বিশ্বাসও করতে পারিনি। ভেবেছিলাম প্রাচ্য ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া জমেছে। এখন স্বীকার করছি, আপনি আগাগোড়া সঠিক। জগদীশবাবু অতীত ভুলে গিয়ে ভদ্রলোকের নামটি কখনো ফাঁস করেননি।

বৃটিশ প্রকাশনা 'নেশন' য়ে সেই প্রথম নথিভুক্ত হল জগদীশবাবুর গবেষণার। লেখা হয়েছিল, সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে গাজরের কাঁপুনি বিবর্ধন করে ক্ষুদে একখানা কাঁচ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন জগদীশবাবু। চিমটে দিয়ে চেপে ধরতেই কেঁপে উঠেছিল গাজর, প্রতিফলিত আলো ঘরের অন্যপ্রান্তে পড়েছিল—বহুগুণ বিবর্ধিত আকারে দেখা গিয়েছিল গাজরের কাঁপুনি।

নিরামিষাশী জর্জ বার্নাড শ জগদীশের ল্যাবোরেটরীতে ম্যাগনিফায়ারের মাধ্যমে দেখেছিলেন বাঁধাকপির পাতাকে গরম জলে ডোবালে কি ভয়ংকর খিঁচুনি সহ মারা যায়। নিজের রচনা-সংগ্রহ জগদীশকে উৎসর্গ করে তিনি লিখেছিলেন, 'সামান্যতম দিচ্ছে বৃহত্তম জীবিত জীববিজ্ঞানীকে'।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রশস্তির পুনরাবৃত্তি ঘটল ভিয়েনায়। বিখ্যাত জার্মান আর অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানীরা এক বাক্যে বললেন, নতুন এই তদন্ত ধারায় ক্যালকাটা অনেক এগিয়ে আছে আমাদের চেয়ে।

কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৭ সালে 'স্যার' উপাধি দেওয়া হল জগদীশ বাবুকে। ঊনষাটতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্য সব আবিষ্কারই যেন জনগণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়—তাঁর ইন্সটিটিউট থেকে কোনো আবিষ্কারের পেটেণ্ট যেন না নেওয়া হয়। অতীতেও তিনি পেটেণ্ট নিতে চাননি বলেই মার্কনির বদলে বেতার টেলিগ্রাফির জনক হতে পারেননি। আইডিয়াকে তিনি লাভে পরিণত করতে পারতেন পেটেণ্ট নিয়ে নিলে।

ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে স্যার জগদীশ ঘোষণা করলেন, ক্রেসকোগ্রাফ নামে একটা নতুন ইন্সট্রুমেণ্ট তিনি আবিষ্কার করেছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোসকোপও যা পারেনি, ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র তাই পারবে—উদ্ভিদদের নড়াচড়া ১০,০০০ গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত করতে পারবে, সেই সঙ্গে এক মিনিটের মধ্যে উদ্ভিদদের পরিবর্তন আর বৃদ্ধি কতখানি হচ্ছে, তাও রেকর্ড করতে পারবে। এই যন্ত্র দিয়েই জগদীশবাবু দেখালেন ছন্দে ছন্দে বাঁধিত হয় উদ্ভিদরা। প্রথম স্পন্দন অনেকখানি বৃদ্ধি আনে, তারপরের স্পন্দনে তার এক চতুর্থাংশ কুঁচকে যায়। কলকাতায় এই স্পন্দনের গড়পরতা হিসেব দেখা গেছিল প্রায় তিন মিনিট।

এর পরেই তিনি 'ব্যালেন্সড ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্র আবিষ্কার করে গাছেদের বৃদ্ধি-হারের তফাৎটা প্রতি সেকেণ্ডে এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের ১/১৫০০ ভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করতে পেরেছিলেন।

আমেরিকার 'সায়েণ্টিফিক আমেরিকান' জার্নালে লেখা হল, ডক্টর বোসের ক্রেসকোগ্রাফের তুলনায় আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপও হার মেনে যায়।

১৯১৯ এবং ১৯২০তে স্যার জগদীশের ইউরোপ সফরের সময়ে রক্ষণশীল 'টাইম্‌স্‌' লিখেছিল—ইউরোপের আমরা এখনো বর্বর পর্যায়ে রয়েছি ; প্রাচ্যের এই মানুষটি গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সংশ্লেষ ঘটিয়ে এক এবং অদ্বিতীয়র মধ্যে এনে ফেলেছেন যাবতীয় প্রকাশিত পরিবর্তনকে।

এত কাণ্ডর পর যখন ১৯২০ তে স্যার জগদীশকে রয়াল সোসাইটির ফেলো করা হবে ঘোষণা করা হল, অবিশ্বাসীদের খুঁতখুঁতানি গেল না। ওঁর এক পুরোনো বিরোধী প্রফেসর ওয়েলার বললেন, ক্রেসকোগ্রাফের ডিমন্‌স্‌ট্রেশন চাই বিশেষজ্ঞদের সামনে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ১৯২০র ২৩শে এপ্রিল এঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন স্যার জগদীশ। 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় বেশ কয়েকজন সতীর্থর সঙ্গে লর্ড র‍্যালে লিখেছিলেন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি যে সঠিকভাবে নির্ণীত হয় এই যন্ত্রে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। দশ লক্ষ থেকে এককোটি গুণ পর্যন্ত বিবর্ধন সম্ভব ক্রেসকোগ্রাফে।

পাঁচই মে টাইম্‌স্‌-য়ে স্যার জগদীশ নিজে লিখলেন, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া প্রতিবন্ধক বিজ্ঞানের অগ্রসর শ্লথ করে। গত বিশ বছর আমাকে নানা-ভাবে ইচ্ছে করে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এসবই ঝেড়ে ফেলছি এই কারণে যে শেষ পর্যন্ত তো এই দেশের মহান্‌ বিজ্ঞানীরা আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯২৩ সালে আবার যখন ইউরোপ সফরে গেলেন স্যার জগদীশ, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসন তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন লিখিতভাবে। সেই বছরেই প্রকাশিত হয় স্যার জগদীশের ২২৭ পৃষ্ঠার বই 'দ্য ফিলজফি অফ দ্য অ্যাসেণ্ট অফ স্যাপ'। হেনরী বার্গসন লিখেছিলেন, অব-শেষে প্রকৃতি তাঁর সযত্ন রক্ষিত গুপ্তকথা ফাঁস করতে বাধ্য হলেন।

কৌতুকচ্ছলে লিখল 'লা মাটিন' পত্রিকা—এরপর ফুলের ঘায়ে কে বেশী কষ্ট পাচ্ছে বলা হবে ? ফুল, না মহিলাটি ?

১৯২৪ আর ১৯২৬ সালে মোট ৫০০ পৃষ্ঠার আরো দুটো বই ছাপালেন স্যার জগদীশ। বহু এক্সপেরিমেণ্টের বৃত্তান্ত এই বই দুখানার নাম 'দ্য ফিলজফি অফ ফটোসিনথেসিস' এবং 'দ্য নারভাস মেকানিজ্‌মস্‌ অফ প্ল্যাণ্টস্‌'। ১৯১৬ য়ে তাঁকে লীগ অফ নেশনস কমিটির ইণ্টারকালচারাল কো-অপারেশনের সদস্য নির্বাচন করা হল। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-ও ছিলেন এই কমিটিতে।

ভারত সরকারের চৈতন্যোদয়ের জন্য স্যার অলিভার লজ, জুলিয়ান হাক্সলে এবং রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্টসহ বেশ কয়েকজন চাপ দিলেন বড়লাটকে, স্যার জগদীশের প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটানো হোক।

১৯২৯য়ে অবসর প্রাপ্ত স্যার জগদীশ তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের লেকচার হলে সারা জীবনের বৈজ্ঞানিক দর্শনকে পেশ করলেন সংক্ষিপ্ত আকারে ব্রোঞ্জ, রূপো আর সোনা দিয়ে নির্মিত হিন্দু সূর্য দেবতার রথারূঢ় মহাকাশ পরিক্রমারত মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে। বললেন, সজীব আর অজীব বস্তুর মধ্যেকার সীমারেখা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। বুঝেছি আলোকময় জগতের মাঝে আমরা অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের নিজেদের এই জীবন আর উদ্ভিদের জীবনের মধ্যে সম্ভাব্য কোনো সম্পর্ক আছে কী ? অনুমান নয়, হাতেনাতে এখন তা অকাট্যভাবে দেখানো যাচ্ছে। পুরোনো সব অসমর্থিত ভিত্তিহীন ধারণা ত্যাগ করা দরকার এখন। শেষ আবেদন জানাই উদ্ভিদের উদ্দেশেই—উদ্ভিদদের নিজেদের স্বাক্ষর না থাকলে যেন কোনো সাক্ষ্যই গ্রহণ করা না হয়।

উদ্ভিদদের রূপান্তর

যদিও এর মধ্যেই সাড়ে তিন লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদের ফিরিস্তি হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও কোন্‌ শক্তি বাঁচিয়ে রেখেছে উদ্ভিদ-জগৎকে, তা কিন্তু আজও বিজ্ঞানের আওতায় আসেনি।

১৫৮৩ সালে ১৫২০টা উদ্ভিদকে ১৫টা শ্রেণীতে সাজান বীজ আর ফলের ভিত্তিতে ফ্লোরেন্সের এক ভদ্রলোক কেসালপাইনাস। তাঁর পরেই ৮০০০ উদ্ভিদকে বাইশটা শ্রেণীতে সাজান ফরাসী তুর্নিফোর্ট ফুলের পাপড়ির রঙের ভিত্তিতে।

সেই প্রথম বংশবৃদ্ধির ব্যাপারকে টেনে আনা হল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে। খৃষ্ট-জন্মের ৫০০ বছর আগে যদিও হেরোডোটাস বলেছিলেন ব্যাবিলোনিয়ানরা দু-রকমের তালবৃক্ষ আলাদা করে চিনেছিল—একটা পরাগরেণু ছিটিয়ে দিত আরেকটার ফুলে ফল উৎপাদনের জন্যে—তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের

আগে কেউ উপলব্ধি করে নি যে উদ্ভিদেরাও বংশবৃদ্ধির তাগিদসম্পন্ন প্রাণী—তাদের নিজেদেরও একটা বংশবৃদ্ধি তাগিদের জীবন আছে।

যে উদ্ভিদে ফুল ধরে, সে উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি এবং নিষেক বা গর্ভাধানের জন্যে যে পরাগরেণুর প্রয়োজন আছে, এ-তত্ত্ব প্রথম পরিবেশন করেন একজন জার্মান—রুডলফ জ্যাকব ক্যামেরেরিয়াস। ১৬৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে পণ্ডিতসমাজে।

উদ্ভিদদের যে সুস্পষ্ট পুং এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতরা দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম দিয়ে তা ধামাচাপা দেন। ভালভা-কে তাঁরা বললেন স্টিগমা, ভ্যাজাইনাকে স্টাইল, পেনিস এবং গ্ল্যান্সকে ফিলামেণ্ট আর অ্যান্থার।

হাজার হাজার বছর ধরে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও উদ্ভিদরা তাদের বংশবৃদ্ধির জীবন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করা হল পুং দেহ যন্ত্রকে 'স্ট্যামেন' আর স্ত্রী দেহযন্ত্রকে 'পিস্টিল' নামকরণ করে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাজ্জব হত যদি শুনত প্রতিটি শিষের প্রতিটি শস্যদানা গ্রীষ্মকালে এক-একটা ভ্রূণকোষ বা গর্ভাশয় এবং শিষ-পরিবৃত শস্যদানার রেশমী কেশের আড়ালে এক-একটা পথ শিষের ওপরকার প্রতিটি শস্যকে ফলন্ত করার জন্য প্রস্তুত, যদি জানত প্রতিটি বীজ এক-একটি মিলনের ফলশ্রুতি—তাহলে কি তারা তাজ্জব হয়ে যেত না? দাঁতভাঙা ল্যাটিন নামের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার দরকারই হত না যদি কিশোর কিশোরীরা জানত প্রতিটা পরাগরেণু অনুপ্রবেশ করে কেবল এক-একটা গর্ভাশয়ে যার মধ্যে থাকে কেবল একটিই বীজ, তাহলে কি উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাদের কৌতূহলের সঞ্চার ঘটত না? তামাকের একটি মাত্র বীজকোষের এক ইঞ্চির ষোলভাগের মাত্র এক ভাগ জায়গার মধ্যে পড়ে থাকে ২৫০০ বীজ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই ২৫০০ বীজের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে—এ-তত্ত্ব কি বিস্ময়কর নয়? পড়তে আগ্রহ জাগায় না? প্রকৃতির বিস্ময় দিয়ে অংকুরিত তরুণ মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগানোর বদলে মধ্যযুগের শিক্ষকরা শুধুমুধু পাখী আর মৌমাছিদের টেনে আনলেন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ক্রিয়ার মূল রহস্যে—আসল তথ্য অনুদ্ঘাটিতই থেকে গেল।

উভলিঙ্গ আদিপুরুষ থেকেই মানুষের উদ্ভব, এই 'প্রাচীন জ্ঞানে'র সঙ্গে উদ্ভিদের উভলিঙ্গ ধর্মের সাদৃশ্য কল্পনা করার ক্ষমতা কটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ আছে? স্ব-গর্ভাধান এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কয়েকটি উদ্ভিদের মধ্যে যেভাবে আছে, তা মনে হয় যেন অলৌকিক। কিছু পামবৃক্ষ স্ট্যামিনেট পুষ্প সৃষ্টি করে এক বছরে, আরেক বছরে পিসটিলেট পুষ্প। ঘাস এবং শস্যের ক্ষেত্রে একের দ্বারা অন্যের গর্ভাধান ঘটে হাওয়ার দ্বারা, বেশীর ভাগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে

পাখী আর কীটপতঙ্গের দৌলতে। গর্ভাধান যার ঘটেনি, সে ফুল আটদিন পর্যন্ত অথবা শুকিয়ে ঝরে না যাওয়া পর্যন্ত তীব্র সুগন্ধ বিতরণ করে। অথচ অনুপ্রবেশ একবার ঘটে গেলেই সাধারণতঃ আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বন্ধ করে সুগন্ধ বিতরণ। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন কামনা-তিক্ততায় সুগন্ধ দুর্গন্ধেতে পর্যবসিত হয়, ফুলের ক্ষেত্রেও ঘটে তাই। একইভাবে একবার যদি অনুপ্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হয়, স্ত্রী দেহযন্ত্রে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। এই ব্যাপার প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ফরাসী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ব্রগনিয়ার্ট। 'কলোকাসিয়া অদোরাতা' নামে একটি ফুলের সবুজ সমারোহ লক্ষ্য করতে গিয়ে তিনি আবিস্কারটি করে ফেলেন। দেখলেন, ফুল ধারণের সময়ে উদ্ভিদটার তাপ বৃদ্ধি পায় প্রতিদিন অপরাহ্নে তিন থেকে ছ-ঘণ্টার মত—ছদিন থাকে এই তাপবৃদ্ধি—ঠিক যেন জ্বর হয়। অনুপ্রবেশের ঠিক সময়টিতে স্ত্রী দেহযন্ত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ করিয়ে ব্রগনিয়ার্ট লক্ষ্য করেন উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে তাপমাত্রা বাড়ে এগারো ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত।

অধিকাংশ পরাগরেণু দাহ্যশক্তিসম্পন্ন হয়। তেতে লাল হয়ে ওঠা কোনো কিছুর ওপর ফেলে দিলে বন্দুকের বারুদের মত জ্বলে ওঠে দপ করে। একসময়ে থিয়েটারের মঞ্চে কৃত্রিম বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হত এইভাবে—গরম চাটুর ওপর নিক্ষেপ করা হত লাইকোপোডিয়ামের পরাগরেণু। বহু উদ্ভিদের পরাগরেণু যে ধরনের গন্ধ ছাড়ে, তার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে জন্তু বা মানুষের শুক্র-সৌরভের। একই ক্রিয়া একই রকমভাবে সম্পাদন করে পরাগরেণু উদ্ভিদের স্ত্রী দেহযন্ত্রমুখে প্রবেশের পর—পুরো পথে পরিভ্রমণ সেরে গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। পশু এবং মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তেমনি বংশবৃদ্ধির রুচি আছে। কতকগুলি শৈবালের শুক্র-কীট ভোরের শিশিরবাহিত অবস্থায় স্ত্রী সন্ধানে পরিচালিত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিডের স্বাদে আকৃষ্ট হয় সূক্ষ্ম কাপের দিকে—যার তলদেশে অনুপ্রবেশের প্রতীক্ষায় থাকে শৈবালের ডিম্বাণুরা। ফার্নের শুক্রকীটরা পক্ষান্তরে চিনি পছন্দ করে এবং সুমিষ্ট জলে স্ত্রী অন্বেষণ করে নেয়।

উদ্ভিদে এই বিশেষ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা আবিষ্কার করে ক্যামেরোরিয়াস সাড়া সৃষ্টি করবার পর পদ্ধতিমূলক উদ্ভিদবিজ্ঞান পর্যালোচনা শুরু করেন কার্ল লিন। এঁর পদ্ধতির নামই হয়ে গিয়েছিল বংশবৃদ্ধির দেহযন্ত্র পদ্ধতি। স্ত্রী এবং পুরুষ বংশবৃদ্ধির দেহযন্ত্রের ভিত্তিতে উদ্ভিদ-জগৎকে শ্রেণীভুক্ত করেন ইনি এবং ছ-হাজার বিভিন্ন উদ্ভিদকে নথিভুক্ত করেন। বট্যানির ছাত্ররা পরম উৎসাহিত হয়েছিল তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে। আজও উদ্ভিদের নামকরণে ল্যাটিন নাম ব্যবহারের রেওয়াজ সত্ত্বেও প্রথম যিনি নামকরণ করেন, তাঁর নামটাও জুড়ে দেওয়া হয় শেষে—যেমন, (Pisum Sativum Linnaeum); শেষ নামটা

আগে কেউ উপলব্ধি করে নি যে উদ্ভিদেরাও বংশবৃদ্ধির তাগিদসম্পন্ন প্রাণী—তাদের নিজেদেরও একটা বংশবৃদ্ধি তাগিদের জীবন আছে।

যে উদ্ভিদে ফুল ধরে, সে উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি এবং নিষেক বা গর্ভাধানের জন্যে যে পরাগরেণুর প্রয়োজন আছে, এ-তত্ত্ব প্রথম পরিবেশন করেন একজন জার্মান—রুডলফ জ্যাকব ক্যামেরেরিয়াস। ১৬৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে পণ্ডিতসমাজে।

উদ্ভিদদের যে সুস্পষ্ট পুং এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতরা দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম দিয়ে তা ধামাচাপা দেন। ভালভা-কে তাঁরা বললেন স্টিগমা, ভ্যাজাইনাকে স্টাইল, পেনিস এবং গ্ল্যান্সকে ফিলামেণ্ট আর অ্যান্থার।

হাজার হাজার বছর ধরে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও উদ্ভিদরা তাদের বংশবৃদ্ধির জীবন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করা হল পুং দেহ যন্ত্রকে 'স্ট্যামেন' আর স্ত্রী দেহযন্ত্রকে 'পিস্টিল' নামকরণ করে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাজ্জব হত যদি শুনত প্রতিটি শিষের প্রতিটি শস্যদানা গ্রীষ্মকালে এক-একটা ভ্রূণকোষ বা গর্ভাশয় এবং শিষ-পরিবৃত শস্য-দানার রেশমী কেশের আড়ালে এক-একটা পথ শিষের ওপরকার প্রতিটি শস্যকে ফলন্ত করার জন্য প্রস্তুত, যদি জানত প্রতিটি বীজ এক-একটি মিলনের ফল-শ্রুতি—তাহলে কি তারা তাজ্জব হয়ে যেত না? দাঁতভাঙা ল্যাটিন নামের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার দরকারই হত না যদি কিশোর কিশোরীরা জানত প্রতিটা পরাগরেণু অনুপ্রবেশ করে কেবল এক-একটা গর্ভাশয়ে যার মধ্যে থাকে কেবল একটিই বীজ, তাহলে কি উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাদের কৌতূহলের সঞ্চার ঘটত না? তামাকের একটি মাত্র বীজকোষের এক ইঞ্চির ষোলভাগের মাত্র এক ভাগ জায়গার মধ্যে পড়ে থাকে ২৫০০ বীজ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই ২৫০০ বীজের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে—এ-তত্ত্ব কি বিস্ময়কর নয়? পড়তে আগ্রহ জাগায় না? প্রকৃতির বিস্ময় দিয়ে অংকুরিত তরুণ মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগানোর বদলে মধ্যযুগের শিক্ষকরা শুধুমুধু পাখী আর মৌমাছিদের টেনে আনলেন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ক্রিয়ার মূল রহস্যে—আসল তথ্য অনুদ্ঘাটিতই থেকে গেল।

উর্ভলিঙ্গ আদিপুরুষ থেকেই মানুষের উদ্ভব, এই 'প্রাচীন জ্ঞানে'র সঙ্গে উদ্ভিদের উর্ভলিঙ্গ ধর্মের সাদৃশ্য কল্পনা করার ক্ষমতা কটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ আছে? স্ব-গর্ভাধান এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কয়েকটি উদ্ভিদের মধ্যে যেভাবে আছে, তা মনে হয় যেন অলৌকিক। কিছু পামবৃক্ষ স্ট্যামিনেট পুষ্প সৃষ্টি করে এক বছরে, আরেক বছরে পিসটিলেট পুষ্প। ঘাস এবং শস্যের ক্ষেত্রে একের দ্বারা অন্যের গর্ভাধান ঘটে হাওয়ার দ্বারা, বেশীর ভাগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে

পাখী আর কীটপতঙ্গের দৌলতে। গর্ভাধান যার ঘটেনি, সে ফুল আটদিন পর্যন্ত অথবা শুকিয়ে ঝরে না যাওয়া পর্যন্ত তীব্র সুগন্ধ বিতরণ করে। অথচ অনুপ্রবেশ একবার ঘটে গেলেই সাধারণতঃ আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বন্ধ করে সুগন্ধ বিতরণ। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন কামনা-তিক্ততায় সুগন্ধ দুর্গন্ধতে পর্যবসিত হয়, ফুলের ক্ষেত্রেও ঘটে তাই। একইভাবে একবার যদি অনুপ্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হয়, স্ত্রী দেহযন্ত্রে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। এই ব্যাপার প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ফরাসী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ব্রগনিয়ার্ট। 'কলোকাসিয়া অদোরাতা' নামে একটি ফুলের সবুজ সমারোহ লক্ষ্য করতে গিয়ে তিনি আবিস্কারটি করে ফেলেন। দেখলেন, ফুল ধারণের সময়ে উদ্ভিদটার তাপ বৃদ্ধি পায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে তিন থেকে ছ-ঘণ্টার মত—ছদিন থাকে এই তাপবৃদ্ধি—ঠিক যেন জ্বর হয়। অনুপ্রবেশের ঠিক সময়টিতে স্ত্রী দেহযন্ত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ করিয়ে ব্রগনিয়ার্ট লক্ষ্য করেন উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে তাপমাত্রা বাড়ে এগারো ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত।

অধিকাংশ পরাগরেণু দাহ্যশক্তিসম্পন্ন হয়। তেতে লাল হয়ে ওঠা কোনো কিছুর ওপর ফেলে দিলে বন্দুকের বারুদের মত জ্বলে ওঠে দপ করে। একসময়ে থিয়েটারের মঞ্চে কৃত্রিম বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হত এইভাবে—গরম চাটুর ওপর নিক্ষেপ করা হত লাইকোপোডিয়ামের পরাগরেণু। বহু উদ্ভিদের পরাগরেণু যে ধরনের গন্ধ ছাড়ে, তার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে জন্তু বা মানুষের শুক্র-সৌরভের। একই ক্রিয়া একই রকমভাবে সম্পাদন করে পরাগরেণু উদ্ভিদের স্ত্রী দেহযন্ত্রমুখে প্রবেশের পর—পুরো পথে পরিভ্রমণ সেরে গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। পশু এবং মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তেমনি বংশবৃদ্ধির রুচি আছে। কতকগুলি শৈবালের শুক্র-কীট ভোরের শিশিরবাহিত অবস্থায় স্ত্রী সন্ধানে পরিচালিত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিডের স্বাদে আকৃষ্ট হয় সূক্ষ্ম কাপের দিকে—যার তলদেশে অনুপ্রবেশের প্রতীক্ষায় থাকে শৈবালের ডিম্বাণুরা। ফার্নের শুক্রকীটরা পক্ষান্তরে চিনি পছন্দ করে এবং সুমিষ্ট জলে স্ত্রী অন্বেষণ করে নেয়।

উদ্ভিদে এই বিশেষ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা আবিষ্কার করে ক্যামেরেরিয়াস সাড়া সৃষ্টি করবার পর পদ্ধতিমূলক উদ্ভিদবিজ্ঞান পর্যালোচনা শুরু করেন কার্ল লিন। এঁর পদ্ধতির নামই হয়ে গিয়েছিল বংশবৃদ্ধির দেহযন্ত্র পদ্ধতি। স্ত্রী এবং পুরুষ বংশবৃদ্ধির দেহযন্ত্রের ভিত্তিতে উদ্ভিদ-জগৎকে শ্রেণীভুক্ত করেন ইনি এবং ছ-হাজার বিভিন্ন উদ্ভিদকে নথিভুক্ত করেন। বট্যানির ছাত্ররা পরম উৎসাহিত হয়েছিল তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে। আজও উদ্ভিদের নামকরণে ল্যাটিন নাম ব্যবহারের রেওয়াজ সত্ত্বেও প্রথম যিনি নামকরণ করেন, তাঁর নামটাও জুড়ে দেওয়া হয় শেষে—যেমন, (Pisum Sativum Linnaeum); শেষ নামটা

কার্ল লিন-য়ের স্মৃতিরক্ষার্থে।

উদ্ভিদদের শ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারে বংশবৃদ্ধি প্রবণতার সাহায্য নিতে গেলে কবিসুলভ প্রতিভার প্রয়োজন। লিন বা লিনিয়াসের মৃত্যুর আট বছর পর ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে সাঁইত্রিশ বছরের দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক যুবক কার্লবাদে উদ্ভিদ অভিযানে বেরিয়ে সহসা প্রচলিত পুরো পদ্ধতিটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। ইনিই জার্মানীর সবচেয়ে বড় কবি গ্যেটে।

গাছপালার মধ্যে আনমনাভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ উদ্ভিদ-জগতের আশ্চর্য প্রকৃতি তাঁর চোখ খুলে দিল—যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন মহাকবি। পরবর্তী-কালে ইনি কবি হয়েও বিজ্ঞানের আসনে সম্মান পেয়েছেন। অথচ সমসাময়িক পণ্ডিতরা তাঁকে টিটকিরিই দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন ডারউইনকে তাঁর আঙ্গিক বিবর্তনবাদের জন্যে। সুবিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল গ্যেটেকে মনে করতেন ডারউইনের সহকর্মী। আঙ্গিক বিবর্তনবাদ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁদের অন্যতম প্রকৃতি-দার্শনিক।

লিপজিগ ইউনিভার্সিটিতেই গ্যেটের মন বিদ্রোহী হয়েছিল কড়া নিয়মশৃঙ্খলা-বন্দী বিজ্ঞানের দশা দেখে। ইউনিভার্সিটিতেই পণ্ডিতদের ক্রমাগত বিরুদ্ধা-চরণে তিতিবিরক্ত হয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে গ্যালভানিজম, মেসমেরিজম এবং ইলেক-ট্রিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুললেন। মিসটিসিজ্‌ম্‌ এবং অ্যালকেমি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন, কেন না ছেলেবেলা থেকে ম্যাগনেটিজম এবং ইলেকট্রিসিটির কাণ্ডকারখানা আর মেরুপ্রবণতা তাঁকে উদ্বেলিত করেছিল। ব্রুনো, স্পিনোজা প্রমুখ মনীষীর ধ্যানধারণা তাঁকে চঞ্চল করে। শেষ পর্যন্ত গ্যেটের বিশ্বাস জন্মায় যে বিজ্ঞানের সন্নিকটে আসতে পারে অকাল্ট—যা সজীব সত্তার ব্যাপার—নিষ্প্রাণ কতকগুলো ক্যাটালগ নয়। প্রকৃতির প্রতি সমবেদনা নিয়ে জ্ঞান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন—নইলে সজীব প্রাণীর মতই উদ্ভিদের বৃদ্ধিচক্রের সন্ধান পাওয়া যাবে না। বাগানে জঙ্গলে তিনি নিবিষ্ট হয়ে যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে পায়চারী করতেন প্রকৃতি রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধানে। পাদচারণা করতে করতে এইভাবেই তিনি একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন উদ্ভিদের সমস্ত অংশই তার পাতারই রকমফের—একটা গঠন বিভিন্ন গঠন আকারে সৃষ্টি করছে পুরো উদ্ভিদটাকে। এই হল গিয়ে সুবিখ্যাত উদ্ভিদের রূপান্তর অথবা মেটামরফসিস অফ প্ল্যাণ্ট তত্ত্বের মূলভিত্তি। এতদিন এই সহজ সত্যটা অদৃশ্য থেকেছে তাঁর এবং তাবৎ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে—চকিতের মধ্যে সত্যটা ঝলসে উঠল তাঁর মস্তিষ্কে।

স্যার জর্জ ট্রেভেলিয়ান অবশ্য পরে লিখেছিলেন, গ্যেটে পাতা বলতে বোঁটা সংলগ্ন পাতাকে বোঝাননি। আরও একটা শব্দের দরকার যা দিয়ে বোঝানো

যায় উদ্ভিদের প্রতিটি দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে নিহিত এমন একটা মূল গঠন যা একটা অংশকে আরেকটা অংশে রূপান্তর করতে পারে। এরকম একটা শব্দ হল Phyllome (স্যার জর্জের ভাষায়)।

গোটের সুচিন্তিত মূল্যায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল Ernest Lehrs লিখিত 'ম্যান অব ম্যাটার' গ্রন্থে। গ্যেটে নাকি আর একটি প্রাকৃতিক মৌলিক সত্যর নামকরণ করেননি। যদিও তিনি সচেতন ছিলেন বিষয়টি সম্বন্ধে। তত্ত্বটির নামকরণ হওয়া উচিত আত্মত্যাগ। পত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফুল হয়ে—কিন্তু ফুল তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়েও নিছক একটা মুমূর্ষু দেহযন্ত্র—এ মৃত্যু যেন উচ্চতর আত্মিক সত্তায় বিলীন হওয়ার পূর্বাবস্থা। একই মূলতত্ত্ব কীটজগতেও দেখা যায়। শুঁয়োপোকার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতির সৌন্দর্যে পর্যবসিত হয়। উদ্ভিদ-জগতেও সক্রিয় রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি যে শক্তি সবুজ অংশগুলির রঙিন হয়ে যাওয়ার সময়ে লক্ষিত হয়। শেষ পরিণতি বীজ—যার মধ্যে উদ্ভিদ তার সমস্ত বাহ্যিক আকার পরিহার করে অকিঞ্চিৎকর একটি ধূলিকণার মত আত্মগোপন করে থাকে। সামান্য ঐ কণিকার মধ্যেই কিন্তু নিহিত থাকে আর একটা সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টির বিপুল শক্তি। পাতা থেকে ফুল, ফুল থেকে বীজ, বীজ থেকে আবার অংকুর—এই তিন পর্যায়ে অস্তিত্বের তিনটি নিয়ম মেনে চলে উদ্ভিদ সুসংবদ্ধভাবে। সংকোচন এবং প্রসারণের ধারাবাহিকতা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই রয়েছে—এই তো মৌলিক সত্য। ছোট্ট অবস্থা থেকে পত্রে পুষ্পে বর্ণে সৌরভে নিজেকে মেলে ধরে বিপুল শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে আবার সেই শক্তি সংহত করে নিচ্ছে অকিঞ্চিৎকর গুটিকার মধ্যে।

গ্যেটে দেখেছিলেন, উদ্ভিদের এই যে পরিবর্তন, তা নিছক বাহ্যিক। মূলে তা অপরিবর্তনীয়। এই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসে এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে একটা উদ্ভিদ থেকেই বহু উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব।

এই ধারণা থেকেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্তনবাদের চিন্তাধারা এসে পৌঁছেছিল এক সময়ে। প্রকৃতির অ-আ-ক-খ বর্ণমালার মূল চাবিকাঠিই এই রূপান্তর।

এই চিন্তাধারা থেকেই গ্যেটে একটি মূল আদর্শানুগ উদ্ভিদ বা ur-pflanze উদ্ভিদের কল্পনা করেছিলেন—যা থেকে অদ্ভুত আকার সম্ভব।

বিস্ময়কর এই আবিষ্কারের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছিলেন গ্যেটে এইভাবে ঃ সব উদ্ভিদই যদি একই ছাঁদে না হয় তো তাদের উদ্ভিদ বলে চিনবো কি করে ? সহর্ষে তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে এমন সব উদ্ভিদও তিনি চিনে নেবেন যাদের উদ্ভিদ বলে পৃথিবীতে এর আগে কেউ কখনো কল্পনাও করেন নি।

এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, উদ্ভিদ সৃষ্টির গুপ্ত রহস্যর কাছা-

কার্ল লিন-য়ের স্মৃতিরক্ষার্থে।

উদ্ভিদদের শ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারে বংশবৃদ্ধি প্রবণতার সাহায্য নিতে গেলে কবিসুলভ প্রতিভার প্রয়োজন। লিন বা লিনিয়াসের মৃত্যুর আট বছর পর ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে সাঁইত্রিশ বছরের দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক যুবক কার্লবাদে উদ্ভিদ অভিযানে বেরিয়ে সহসা প্রচলিত পুরো পদ্ধতিটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। ইনিই জার্মানীর সবচেয়ে বড় কবি গ্যেটে।

গাছপালার মধ্যে আনমনাভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ উদ্ভিদ-জগতের আশ্চর্য প্রকৃতি তাঁর চোখ খুলে দিল—যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন মহাকবি। পরবর্তীকালে ইনি কবি হয়েও বিজ্ঞানের আসনে স মান পেয়েছেন। অথচ সমসাময়িক পণ্ডিতরা তাঁকে টিটকিরিই দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন ডারউইনকে তাঁর আঙ্গিক বিবর্তনবাদের জন্যে। সুবিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল গ্যেটেকে মনে করতেন ডারউইনের সহকর্মী। আঙ্গিক বিবর্তনবাদ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁদের অন্যতম প্রকৃতি-দার্শনিক।

লিপজিগ ইউনিভার্সিটিতেই গ্যেটের মন বিদ্রোহী হয়েছিল কড়া নিয়মশৃঙ্খলাবন্দী বিজ্ঞানের দশা দেখে। ইউনিভার্সিটিতেই পণ্ডিতদের ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণে তিতিবিরক্ত হয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে গ্যালভানিজম, মেসমেরিজম এবং ইলেকট্রিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুললেন। মিসটিসিজ্‌ম্‌ এবং অ্যালকেমি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন, কেন না ছেলেবেলা থেকে ম্যাগনেটিজম এবং ইলেকট্রিসিটির কাণ্ডকারখানা আর মেরুপ্রবণতা তাঁকে উদ্বেলিত করেছিল। ব্রুনো, স্পিনোজা প্রমুখ মনীষীর ধ্যানধারণা তাঁকে চঞ্চল করে। শেষ পর্যন্ত গ্যেটের বিশ্বাস জন্মায় যে বিজ্ঞানের সন্নিকটে আসতে পারে অকাল্ট—যা সজীব সত্তার ব্যাপার—নিষ্প্রাণ কতকগুলো ক্যাটালগ নয়। প্রকৃতির প্রতি সমবেদনা নিয়ে জ্ঞান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন—নইলে সজীব প্রাণীর মতই উদ্ভিদের বৃদ্ধিচক্রের সন্ধান পাওয়া যাবে না। বাগানে জঙ্গলে তিনি নিবিষ্ট হয়ে যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে পায়চারী করতেন প্রকৃতি রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধানে। পাদচারণা করতে করতে এইভাবেই তিনি একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন উদ্ভিদের সমস্ত অংশই তার পাতারই রকমফের—একটা গঠন বিভিন্ন গঠন আকারে সৃষ্টি করছে পুরো উদ্ভিটাকে। এই হল গিয়ে সুবিখ্যাত উদ্ভিদের রূপান্তর অথবা মেটামরফসিস অফ প্ল্যাণ্ট তত্ত্বের মূলভিত্তি। এতদিন এই সহজ সত্যটা অদৃশ্য থেকেছে তাঁর এবং তাবৎ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে—চকিতের মধ্যে সত্যটা ঝলসে উঠল তাঁর মস্তিষ্কে।

স্যার জর্জ ট্রেভেলিয়ান অবশ্য পরে লিখেছিলেন, গ্যেটে পাতা বলতে বোঁটা সংলগ্ন পাতাকে বোঝাননি। আরও একটা শব্দের দরকার যা দিয়ে বোঝানো

যায় উদ্ভিদের প্রতিটি দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে নিহিত এমন একটা মূল গঠন যা একটা অংশকে আরেকটা অংশে রূপান্তর করতে পারে। এরকম একটা শব্দ হল Phyllome (স্যার জর্জের ভাষায়)।

গোটের সুচিন্তিত মূল্যায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল Ernest Lehrs লিখিত 'ম্যান অব ম্যাটার' গ্রন্থে। গ্যেটে নাকি আর একটি প্রাকৃতিক মৌলিক সত্যর নামকরণ করেননি। যদিও তিনি সচেতন ছিলেন বিষয়টি সম্বন্ধে। তত্ত্বটির নামকরণ হওয়া উচিত আত্মত্যাগ। পত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফুল হয়ে—কিন্তু ফুল তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়েও নিছক একটা মুমূর্ষু দেহযন্ত্র—এ মৃত্যু যেন উচ্চতর আত্মিক সত্তায় বিলীন হওয়ার পূর্বাবস্থা। একই মূলতত্ত্ব কীটজগতেও দেখা যায়। শুঁয়োপোকার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতির সৌন্দর্যে পর্যবসিত হয়। উদ্ভিদ-জগতেও সক্রিয় রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি যে শক্তি সবুজ অংশগুলির রাঙিন হয়ে যাওয়ার সময়ে লক্ষিত হয়। শেষ পরিণতি বীজ—যার মধ্যে উদ্ভিদ তার সমস্ত বাহ্যিক আকার পরিহার করে অকিঞ্চিৎকর একটি ধূলিকণার মত আত্মগোপন করে থাকে। সামান্য ঐ কণিকার মধ্যেই কিন্তু নিহিত থাকে আর একটা সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টির বিপুল শক্তি। পাতা থেকে ফুল, ফুল থেকে বীজ, বীজ থেকে আবার অংকুর—এই তিন পর্যায়ে অস্তিত্বের তিনটি নিয়ম মেনে চলে উদ্ভিদ সুসংবদ্ধভাবে। সংকোচন এবং প্রসারণের ধারাবাহিকতা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই রয়েছে—এই তো মৌলিক সত্য। ছোট্ট অবস্থা থেকে পত্রে পুষ্পে বর্ণে সৌরভে নিজেকে মেলে ধরে বিপুল শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে আবার সেই শক্তি সংহত করে নিচ্ছে অকিঞ্চিৎকর গুটিকার মধ্যে।

গ্যেটে দেখেছিলেন, উদ্ভিদের এই যে পরিবর্তন, তা নিছক বাহ্যিক। মূলে তা অপরিবর্তনীয়। এই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসে এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে একটা উদ্ভিদ থেকেই বহু উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব।

এই ধারণা থেকেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্তনবাদের চিন্তাধারা এসে পৌঁছেছিল এক সময়ে। প্রকৃতির অ-আ-ক-খ বর্ণমালার মূল চাবিকাঠিই এই রূপান্তর।

এই চিন্তাধারা থেকেই গ্যেটে একটি মূল আদর্শানুগ উদ্ভিদ বা ur-pflanze উদ্ভিদের কল্পনা করেছিলেন—যা থেকে অযুত আকার সম্ভব।

বিস্ময়কর এই আবিষ্কারের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছিলেন গ্যেটে এইভাবে ঃ সব উদ্ভিদই যদি একই ছাঁদে না হয় তো তাদের উদ্ভিদ বলে চিনবো কি করে ? সহর্ষে তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে এমন সব উদ্ভিদও তিনি চিনে নেবেন যাদের উদ্ভিদ বলে পৃথিবীতে এর আগে কেউ কখনো কল্পনাও করেন নি।

এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, উদ্ভিদ সৃষ্টির গুপ্ত রহস্যর কাছা-

কাছি পেঁছেছি আমি। এর চাইতে সোজা ব্যাপার আর হয় না। মূল আদর্শানুগ উদ্ভিদ (আর্কিটাইপাল প্ল্যাণ্ট) হবে বিশ্বের বিচিত্রতম প্রাণী। প্রকৃতিও শেষ পর্যন্ত ঈর্ষা করবে আমাকে। মূল সূত্র অনুসারে একটা মডেল নিয়ে সীমাহীনভাবে যে কেউ এখন উদ্ভিদ আবিষ্কার করতে পারবে। একই মূলতত্ত্ব সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দুবছর এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা পর্যবেক্ষণ চালালেন গ্যেটে ইতালীতে—জার্মানীতে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ধ্যানধারণা বোধগম্য হয়নি সমসাময়িক তাত্ত্বিকদের। খুব দমে গেলেন তিনি। একটু একটু করে উৎসাহ ফিরে আসার পর লিখলেন 'অন দ্য মেটামরফসিস্ অফ প্ল্যাণ্টস্'—লিখলেন প্রকৃতির বিশাল বাগানে একটা মূল সত্যই অনুসৃত হয়েছে—নির্দিষ্ট কয়েকটা নিয়মের অধীন সেখানকার সব কিছুই।

প্রবন্ধটা কাটছাঁট কায়দায় লিখেছিলেন গ্যেটে। সমসাময়িক বিজ্ঞানরচনার কায়দা গ্রহণ করেননি। প্রতিটি ধারণার সিদ্ধান্ত টানেননি— পাঠকের নিজস্ব সিদ্ধান্তর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে সম্মুখীন হলেন বাধার। যে প্রকাশক তাঁর সব বই ছাপতেন, তিনি এটি প্রকাশ করতে চাইলেন না—বললেন, গ্যেটে সাহিত্যের মানুষ—বিজ্ঞানের নয়। অন্যত্র ছাপানোর পর আবার ধাক্কা খেলেন—উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এবং জনসাধারণ পাত্তাই দিল না তাঁকে।

গ্যেটের তখনকার মন্তব্য ছিল এই ঃ জনসাধারণের দাবী স্বক্ষেত্রেই থাকা উচিত প্রত্যেকের। কেউ চায় না যে বিজ্ঞান আর কবিতার মিলন ঘটুক। সাধারণ মানুষ ভুলে গেছে যে কবিতা থেকেই উন্নীত হয়েছে বিজ্ঞান।

এরপর গ্যেটে ভুল করলেন। প্রকাশিত বইয়ের কপি দিলেন স্বক্ষেত্রের বাইরের বন্ধুদের। এঁদের মন্তব্য মোটেই সংযত হয়নি।

সতীর্থ কবি এবং বন্ধু স্কিলারকে গ্যেটে সোৎসাহে তাঁর তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করে প্রতীকি উদ্ভিদের একটা পেন-স্কেচও দেখিয়েছিলেন। সাগ্রহে শোনার পর স্কিলার বলেছিলেন, 'এতো একট আইডিয়া—অভিজ্ঞতা তো নয়।'

মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল গ্যেটের। আইডিয়া মাত্রই যে সময় আর ক্ষেত্রের বাইরে এবং অভিজ্ঞতা মাত্রই যে সময় আর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমায়িত—এই দার্শনিক জ্ঞান জাগ্রত হল তাঁর মধ্যে। যুগপৎ আর পরম্পরা নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থাকে আইডিয়ার মধ্যে—এদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় অভিজ্ঞতা।

আঠারো বছর পরে কংগ্রেস অফ ভিয়েনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর গ্যেটের উদ্ভিদের রূপান্তর-তত্ত্ব উদ্ভিদ-সংক্রান্ত বই এবং লেখায় আবির্ভূত হতে থাকে। তিরিশ বছর পরে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা তা পুরোপুরি মেনে নেন। সুইজারল্যাণ্ডে আর ফ্রান্সে হতবাক হয়ে যান সেখানকার মানুষ। নিছক কল্পনা, শক্তি আর

উপলব্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক কাণ্ডকারখানার মধ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হল কি করে, ভেবে তাজ্জব হয়ে যান।

শেষ জীবনে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে আর একটা মূল আইডিয়ার সংযোজন করেন গ্যেটে। ডারউইনের এক প্রজন্ম আগেই উনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দুটো সুস্পষ্ট পথে বৃদ্ধির প্রবণতা আছে উদ্ভিদকুলের : খাড়াভাবে এবং পেঁচিয়ে। কাব্যিক ধারণায় খাড়াই বৃদ্ধিকে গ্যেটে বলেছিলেন পুরুষোচিত ; পেঁচিয়ে বৃদ্ধিকে বলেছিলেন স্ত্রীজনোচিত—যা কিনা প্রথম বৃদ্ধির সময়ে দেখা যায় না—পুষ্পিত এবং ফল উৎপাদনের সময় প্রকট হয়।

গ্যেটে বলেছিলেন, ব্যাপারটা যেন ম্যাজিকের মত। শেকড় যাচ্ছে তলায় আদ্রর্তা এবং অন্ধকার অভিমুখে। গুঁড়ি যাচ্ছে আকাশ অভিমুখে আলো আর বাতাসের দিকে। বিপরীত মেরুপ্রবণতা নিয়ে কাজ করে চলেছে একটা শক্তি—যা নিউটনের 'গ্র্যাভিটি' তত্ত্বের বিপরীত। গ্যেটে এই শক্তির নাম দিয়েছিলেন 'লেভিটি'।

Lehrs বলেছিলেন, আপেল কি করে মাটিতে পড়ে ব্যাখ্যা করেই খালাস হয়েছিলেন নিউটন, কিন্তু তার চাইতে অনেক কঠিন প্রশ্ন—আপেলটা উঁচুতে উঠল কি করে, তার জবাব দেন নি।

এই ধারণা থেকেই গ্যেটে মনে মনে একটা ছবির কল্পনা করেছিলেন। যেন, পৃথিবীটা একটা শক্তিক্ষেত্র পরিবৃত হয়ে রয়েছে—যে-শক্তি সব দিক দিয়েই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত।

Lehrs ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে দূরত্ব বাড়লেই গ্র্যাভিটি শক্তি হ্রাস পায়, কিন্তু লেভিটি শক্তি হ্রাস পায় পৃথিবীর বহিরাবরণ থেকে ভেতরের দিকে দূরত্ব বাড়লে—এই কারণে গ্র্যাভিটির প্রভাবে আপেল মাটিতে পড়ে। লেভিটির প্রভাবে আপেল মাটি থেকে ওপরে ওঠে।

লেভিটির প্রভাবে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভারী ভারী জিনিস শূন্যে ছিটকে যায় আচমকা—ঝড়ের সময়ে হাল্কা বস্তু দ্রুত নেমে আসে পৃথিবীর দিকে গ্র্যাভিটির প্রভাবে।

ডারউইনের আঙ্গিক বিবর্তনবাদের সাতাশ বছর আগে ১৮৩২য়ের ২২শে মার্চ দেহরক্ষা করেন গ্যেটে—তখন কিন্তু মহান কবি হিসাবেই তিনি সম্মান পেয়েছিলেন—বিজ্ঞানী হিসেবে নয়।

পরে একটা উদ্ভিদ-প্রজাতির নামকরণ হয়েছিল তাঁর নামে Goethea ; একটা খনিজ দ্রব্যেরও নামকরণ হয়েছিল তাঁর নামে—goethite ; বিজ্ঞানী হিসেবে নয়—সৌজন্য জানানোর জন্যেই এহেন নামকরণ। পরে, 'মর্ফোলজি' শব্দটা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব পান গ্যেটে। আজও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে যে বোট্যানিক্যাল

মরফোলজি প্রচলিত, তার ধারণাও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। এ ছাড়াও অনেক কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পাহাড়ের সৃষ্টি, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পদ্ধতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, মেক্সিকো উপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর সংযুক্তিকরণে উৎসাহ, বাষ্পীয় জাহাজ এবং উড়ুক্কু যন্ত্র নির্মাণের ইচ্ছা ; কিন্তু ডারউইনের আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত তাঁর উদ্ভিদের রূপান্তর তত্ত্ব আমল পায়নি—তার পরেও সম্যক উপলব্ধি ঘটেনি।

একশ বছর পরে রুডলফ স্টাইনার লিখেছিলেন, ডারউইন এবং গ্যেটের পর্যবেক্ষণে সাদৃশ্য থাকলেও মতাদর্শে পার্থক্য ছিল। ডারউইন মনে করেছিলেন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যেই তার প্রকৃতি নিহিত রয়েছে—নিত্য বা অপরিবর্তনীয় কিছুই নেই। গ্যেটে কিন্তু মনে করতেন, বৈশিষ্ট্যগুলো যেহেতু নিত্য বা অপরিবর্তনীয় নয়, পরিবর্তনশীল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর অভ্যন্তরে খুঁজতে হবে নিত্য বা অপরিবর্তনীয়কে।

সানন্দে বাড়ে উদ্ভিদরা

উদ্ভিদদের বস্তুদেহের অন্তরালে আধ্যাত্মিক সার আছে, গ্যেটের এই কাব্যিক ধারণাকে দৃঢ়তর ভূমিতে স্থাপন করেন লিপজিগ ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল ডক্টর এবং ফিজিক্সের প্রফেসর গুস্তাভ থিয়োডোর ফেচনার। ইনি ইলেকট্রিক্যাল কারেণ্টের পরিমাপ এবং রঙের উপলব্ধি সম্পর্কে চল্লিশ বছর ধরে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা ও গবেষণা করেছেন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার পর রেটিনায় পরবর্তী কোন 'ইমেজ' থাকে কিনা, তা দেখবার জন্যে এক নাগাড়ে সূর্য অবলোকন করতে গিয়ে একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন দৃষ্টিশক্তি লোপ পাচ্ছে তাঁর। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মুখে মুখোশ এঁটে অন্ধকার ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা বসে রইলেন পুরো তিনটে বছর।

তিন বছর পরে সহর্ষে লক্ষ্য করলেন, দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসছে। নদীর ধারে উৎফুল্লচিত্তে বেড়াতে বেড়াতে সহসা উপলব্ধি করলেন—ফুল আর গাছেদের মধ্যে রয়েছে যেন একটা আত্মিক সত্তা।

ফলে, ১৮৪৮ সালে লিখলেন 'নান্না, অর দ্য সোল-লাইফ অফ প্ল্যাণ্টস্' ; সতীর্থ পণ্ডিতরা ছুঁড়ে ফেলে দিল বইখানা। কিন্তু লুফে নিল জনগণ। আজও, পঁচাত্তর বছর পরেও বইখানা ছাপা হয় জার্মানীতে।

উদ্ভিদদের আত্মিক জীবন তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিজিক্সের প্রফেসারি ছেড়ে দিয়ে ফিলজফি নিয়ে পড়লেন ফেচনার এবং যে বছর 'নান্না' প্রকাশিত হয়, সেই বছরেই লিপজিগে চাকরী পেলেন দর্শন অধ্যাপনার। উদ্‌ভিদদের যে

স্বপ্নাতীত সংবেদনশীলতা আছে, এই তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটার আগেই লিখলেন মহাজাগতিক সমস্যা সংক্রান্ত 'লিটল বুক অফ লাইফ আফটার ডেথ'—যে বই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। 'কমপ্যারেটিভ অ্যানাটমি অফ অ্যাঞ্জেলস' বইখানা সমালেচনার ভয়ে লিখছিলেন 'ডক্টর মাইসেস' ছদ্মনামে।

'লিটল বুক'য়ে ফেচনার লিখেছিলেন, মানুষের জীবনে আছে তিনটি পর্যায়। গর্ভাধান থেকে জন্ম পর্যন্ত একটানা ঘুম, অর্ধজাগরণ—মানুষ যাকে বলে পার্থিব জীবন, এবং মৃত্যুর পর পূর্ণ সচেনতা।

'নান্না' গ্রন্থে ফেচনার লিখেছিলেন, সর্বত্র বিরাজিত এক সত্তাকে 'মানুষ যদি মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে কেন মানবে না ঈশ্বর সজীবতা দিয়েছেন উদ্ভিদ, পাথর কৃষ্ট্যাল এবং তরঙ্গকেও? একই শক্তি মনুষ্যদেহের মত প্রকৃতির সর্বত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে না কেন?

জগদীশ বোসের গবেষণা কি ধরনের হতে চলেছে, তা আঁচ করেই ফেচনার লিখেছিলেন, উদ্ভিদের জীবন আছে, আত্মা আছে, স্নায়ুতন্ত্রও আছে—যা কিনা তাদের পেঁচানো তন্তুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। আজকের যান্ত্রিক শারীরবৃত্তের সীমার বাইরে ফেচনার বলেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের এই আত্মিক স্নায়ুতন্ত্র গড়ে উঠেছে আলোক, মহাকর্ষ এবং আজও অজ্ঞাত অনেক শক্তির সমন্বয়ে, যা জালের মত ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

মাকড়শা যেমন জালের বাইরে কোনো কিছুর উপস্থিতি টের পায়, আত্মাও অনুভূতি গ্রহণ করে ঠিক সেইভাবে। উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র আছে বইকি, মানুষ তার অজ্ঞতার জন্যে আজও টের পায়নি—দোষটা উদ্ভিদের দেহগত ঘাটতির জন্যে মোটেই নয়।

শেকড় গেড়ে জাঁকিয়ে বসেছে বলে জন্তুদের মত উদ্ভিদদের চলাফেরার স্বাধীনতা কম থাকতে পারে, কিন্তু ডালপালা, পাতা আর শুঁয়ো নেড়ে তারা পশুর মতই আচরণ করে, শিকার পাকড়াও করে, ভয় পেলে সরেও যায়। এ সব কথাই ফেচনারের। তিনি আরও বলেন, পশুর মত উদ্ভিদরা ক্ষিদে-তেষ্টায় ছটফট করে না কে বলেছে? পশুরা সর্বদেহ দিয়ে খাদ্য অন্বেষণ করে, উদ্ভিদরা করে দেহের কিছু অংশ দিয়ে—চোখ, কান, নাক তাদের সাহায্য করে না—করে অনুভূতি।

উদ্ভিদেরাও পরস্পরের উপস্থিতি টের পায় নিশ্চয় অপূর্ব সুগন্ধর মাধ্যমে—যা কিনা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে সাধারণতঃ সহচর সহচরীর ক্ষেত্রে।

অন্ধকার ঘরে একজন মানুষ যেমন আরেকজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে পারে, ফুলেরাও তেমনি একে অপরকে চিনে নেয় গন্ধের তারতম্য বিচার করে। প্রতিটি গন্ধের মধ্যে থাকে এক একটি উদ্ভিদের নিজস্ব যান্ত্রিক সত্তার ছাপ।

গন্ধহীন ফুলেরা যেন জঙ্গলে ঘুরে বেরানো পশু, গন্ধযুক্তরা যেন পেটুক দামোদর।

মানুষের চরম লক্ষ্য কি নিঃশ্বাসের কার্বনিক অ্যাসিড দিয়ে উদ্ভিদের পুষ্টি, মৃত্যুর পর দেহটা দিয়ে উদ্ভিদের সার জোগানো নয়? পরিশেষে ফুল আর গাছেরা মানুষকে খেয়ে নিয়ে তার দেহাবশেষ মাটি, জল, বাতাস, রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়ে নশ্বর দেহটাকে আরো মহান আকার আর বর্ণের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে না? কথাগুলো জার্মান সাধু ফেচনারের।

ফেচনারের 'অ্যানিমিজম' (জান্তবতা?) সমসাময়িক সমালোচকদের এত ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন যে 'নান্না' লেখার দু-বছর পরে উনি অ্যাটমিক থিওরীর ওপর একটা বই প্রকাশ করেন—যে বইখানায় পার্টিকুল্ ফিজিক্সের জন্মের বহু আগে উনি লিখেছিলেন অ্যাটমই খাঁটি এনার্জির কেন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের নিম্নতম মৌলিক। পরের বছরই উনি প্রকাশ করলেন 'জেনদাভেস্তা' বইখানা—যে বইয়ের নাম তিনি প্রাচীন জোরোআসট্রিয়ানদের পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে পেয়েছিলেন। কৃষিকার্যের প্রথম পুস্তক বলা চলে মূল জেনদাভেস্তাকে। আমেরিকান ফিলজফার উইলিয়াম জেমস ফেচনারের এই বইটাকে বলেছিলেন 'এক বিস্ময়কর প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি'। 'মেণ্টাল এনার্জি' নামক চাঞ্চল্যকর এবং জটিল দর্শন সিগমণ্ড ফ্রয়েডকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল বলেই মনঃসমীক্ষণের বনেদ রচনা সম্ভব হয়েছিল।

অধিকাংশ দার্শনিকের মত নিছক কল্পনাবিলাসী ধারণা নিয়ে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি বাদ দিয়ে সে সব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ফেচনার।

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির দেহযন্ত্র নিয়ে 'নান্না' গ্রন্থে ফেচনার বলেছিলেন, পুরো ব্যাপারটা অতীব সুন্দর। পোকামাকড়কে ভুলিয়ে দেহযন্ত্রে এবং মধুর লোভ দেখিয়ে পরাগরেণুকে অ্যানথার থেকে স্টিগমায় নিয়ে যাওয়ার মত বুদ্ধি ক'টা সজীব প্রাণীর আছে?

ফেচনার সহর্ষে লক্ষ্য করেছিলেন, কি ভাবে উদ্ভিদের সংবেদনশীল শেকড়-প্রান্ত দিকভ্রান্ত হয় না, কিভাবে সূক্ষ্ম তন্তুগুলো শূন্যপথে আহার অন্বেষণে ধাবিত হয়।

ফেচনার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন চার্লস রবার্ট ডারউইনকে। রহস্যজনক একটা শক্তি যে উদ্ভিদদের বুদ্ধিমত্তা জোগাচ্ছে, ফেচনারের এই ধারণায় উদ্বেলিত হয় তিনি লেখেন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অফ স্পিসিস' (১৮৫৯) এবং জীবনের বাকী তেইশটা বছর ক্রমবিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠায় আর উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণে ব্যয় করেন।

'পাওয়ার অফ মুভমেণ্ট ইন প্ল্যান্টস' গ্রন্থে ডারউইন জোরের সঙ্গে লেখেন শেকড়ের ডগাটা নিম্নতর প্রাণীর মস্তিষ্কের মত কাজ চালায়। উদ্ভিদের যে স্নায়ুতন্ত্র আছে, এই তত্ত্বটা কিন্তু তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তাদের নড়াচড়া পশুদের নড়াচড়ার অনুরূপ।

ডারউইনের মৃত্যুর দশ বছর পর ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে একটা বাহান্ন পৃষ্ঠার উদ্ভিদ-তালিকা প্রকাশিত হয় এবং সাড়া জাগায় যুক্তরাষ্ট্রে। বইটায় মানুষের অজানা বহু উদ্ভিদেরই নাম ছিল। নাম 'নিউ ক্রিয়েশন ইন ফ্রুট্স্ অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স'।

যে আপেলের একদিক মিষ্টি আরেক দিক টক, যে প্যারাডক্স ওয়ালনাট কয়েক বছরের মধ্যে হু-হু করে বেড়ে উঠে পুরো একটা বাড়ী ঢেকে দিতে পারে, যে ডেজি'র পাপড়ি হয় দানবিক—এই ধরনের অনেক খবর ছিল বইখানায়।

ছ-হাজার মাইল পথ পরিক্রমা করে বইটা পেঁছোয় নেদারল্যাণ্ডে যাঁর কাছে, তিনি 'মিউটেশন' তত্ত্ব নিয়ে অনেক কাজ করেছিলেন। এঁর নাম লুথার বুরবাঙ্ক। বইটা হাতে পেয়েই প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়।

বুরবাঙ্কের বাগানে অনেক বিস্ময় থাকত। যেমন—একটা 'মাঙ্কি পাজ্ল্ ট্রি'—তলা দিয়ে মানুষ গেলেই মাথার ওপর খসে পড়ত বিশ পাউন্ড ওজনের বাদাম। বুরবাঙ্কের এই সব আবিষ্কারের গোপন তত্ত্ব কিন্তু কেউ জানতে পারেন নি—গবেষণাগার থাকত নাকি তাঁর 'মাথায়'।

আজকের ক্যালিফোর্নিয়ায় যত দানবিক শস্য জন্মায়—তার অর্ধেকের কৃতিত্ব প্রাপ্য বুরবাঙ্কের। ইনি এমন কুল উদ্ভাবন করেছিলেন, যার কোনোটা খেতে নাশপাতির মত, কোনোটার স্বাদ আনারসের মত।

বুরবাঙ্কের পদ্ধতি ধরতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে গেছিলেন আমেরিকার দুজন নামী উদ্ভিদবিজ্ঞানী—বেলী এবং ওয়েবলার। নতুন ধরনের উদ্ভিদ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা এঁরাও করেছিলেন—কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারেননি বুরবাঙ্কের 'মেথড'টা কি।

১৯০৬য়ের ১৮ই এপ্রিল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে যায় সানফ্রানসিসকো—মাটিতে মিশে যায় সান্তা রোসা। আগুনে ছারখার হয়ে যায় তল্লাটটা। কিন্তু বুরবাঙ্কের বিরাট গ্রীনহাউসের একটা কাঁচও ভাঙেনি। সবাই অবাক হয়ে গেলেও বুরবাঙ্ক হন নি। উদ্ভিদদের নিয়ে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার উনি করে চলেছেন, তার পেছনে আছে মহাবিশ্বের এবং প্রকৃতির শক্তিসমূহ—এই শক্তিগুলোই নাকি অটুট রেখেছে তাঁর গ্রীনহাউস।

লস এঞ্জেলসের ফিলজফিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট ম্যানলী হল লিখেছেন, বিশেষ কোন পন্থায় (যা কিনা উদ্ভিদের সহজাত নয়)

কোনো উদ্ভিদের যদি বৃদ্ধি ঘটাতে চাইতেন বুরবাঙ্ক, তিনি সেই উদ্ভিদটার সামনে নতজানু হয়ে বসে তার সঙ্গে কথা বলতেন। বুরবাঙ্ক তাঁকে বলেছিলেন, উদ্ভিদদের কুঁড়িটারও বেশী অনুভূতি কেন্দ্র আছে। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়র মত নয় বলে আমরা তাদের চিনতে পারি না। ওঁর কথা উদ্ভিদরা বুঝতে পারে কিনা বুর-বাঙ্ক তা জানেন না, তবে টেলিপ্যাথি জাতীয় কিছু মারফৎ তাঁর কথা তিনি তাদের কাছে পেঁৗছে দিতে পারেন।

হল লিখেছেন, বুরবাঙ্ক বিখ্যাত যোগী পরমহংস যোগানন্দকে বলেছিলেন কিভাবে কাঁটাহীন ক্যাকটাস তিনি বানিয়েছেন। এক বছর সময় লেগেছিল তাঁর। চিমটে দিয়ে হাজার হাজার কাঁটা তুলেছেন হাত থেকে। এক্সপেরিমেণ্ট চলার সময়ে ক্যাকটাসদের সঙ্গে ভালবাসার কথা বলতেন। বলতেন, ভয় কী। আত্মরক্ষার জন্যে কাঁটার দরকার নেই। আমি তোমাদের রক্ষে করব।

হল লিখেছেন, বুরবাঙ্কের ভালবাসার শক্তি ছিল অন্য সব শক্তির চেয়ে প্রবল—পুষ্টির জোগান দিয়ে প্রচুর ফলোৎপাদন সম্ভব ছিল এই ভালবাসার ফলেই। উদ্ভিদদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের মন জয় করতেন।

জন্মান্ধ জন্মবধির হেলেন কেলার বুরবাঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে 'আউট-লুক ফর দ্য ব্লাইণ্ড' গ্রন্থে লিখেছিলেন, উদ্ভিদরা যখন বুরবাঙ্কের সঙ্গে কথা বলে, উনি তা শোনেন।

উদ্ভিদরা যে তাদের গুপ্তরহস্য ব্যক্ত করতে পারে, তা বিশ্বাস করতেন অত্যাশ্চর্য কৃষি রসায়নবিদ জর্জ ওয়াশিংটন কারভার। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের ঠিক আগে তাঁর জন্ম। ক্রীতদাস রক্ত গায়ে নিয়েও তিনি হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে জনগণের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

ছেলেবেলায় হাঁটতে শিখেই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন কারভার। গাছ-গাছড়া কুড়িয়ে এনে অসুস্থ পশুর রোগ সারিয়ে দিতেন। জঙ্গলের মধ্যেই ছোট্ট একটা বাগান করেছিলেন। কাউকে কাছে আসতে দিতেন না। বলতেন, ওটা আমার বাগান হাসপাতাল—অসুস্থ গাছেদের রোগ সারাই। সিক্রেট গ্রীনহাউসে কুইকুই করে কথা বলতেন উদ্ভিদদের সঙ্গে—যে অভ্যেস বড় হয়েও থেকে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে সুস্থ উদ্ভিদ এনে দেখাতেন সবাইকে। সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত কি করে এটা সম্ভব। উনি বলতেন জঙ্গলের ছোটখাট প্রত্যেকেই কথা বলে আমার সঙ্গে—বাদ যায় না ফুলেরাও। আমি সব্বাইকে দেখি, ভালবাসি, শিখি।

হাইস্কুলের পড়া সাঙ্গ করে কারভার আওয়া স্টেট কলেজ অফ এগ্রিকালচারে পড়তে যান। শিক্ষক ওয়ালেসের ছ-বছরের নাতিকে নিয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে উদ্ভিদদের সঙ্গে কথা বলতেন। কারভারের মৃত্যুর দু-বছর পরে এই নাতিটিই যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হন।

বড় হয়ে অধ্যাপনা করার সময়ে ভোর চারটের সময়ে উঠে জঙ্গলে চলে যেতেন কারভার। ফিরে আসতেন অনেক অজানা উদ্ভিদ নিয়ে। লেকচার দিতেন সেই সব সম্পর্কে। বলতেন, প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় শিক্ষক। সবাই যখন ঘুমোয়, আমি তাদের কাছে শিখি। সূর্য ওঠার আগেই অন্ধকারে ঈশ্বর আমাকে বলে দেন আমার পরিকল্পনা কি ভাবে সফল করতে হবে।

সারাজীবনে অনেক অদ্ভুত উদ্ভাবন করেছেন কারভার—কিন্তু জগদীশ বোসের মত কোনোটারই পেটেন্ট নেন নি। আবিষ্কারের আইডিয়া আসত তাঁর মাথায় জঙ্গলে বিচরণের সময়ে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত। বলতেন, ঈশ্বরের দেওয়া জিনিস নিয়ে ব্যবসা করব কেন? এ সবই মানুষের মঙ্গলের জন্য। টমাস এডিসন আর হেনরী ফোর্ডের প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। দুজনেই মনে করতেন কারভার দেদার টাকা আনতে পারবে—কারভার কিন্তু বিচলিত হননি।

বুরবাঙ্কের মতই কারভারের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও একটা ধাঁধা হয়ে রয়েছে। এঁরা দুজনেই যেন জাদুবিদ্যা জানতেন। কারভার বলতেন, উদ্ভিদদের গুপ্ত রহস্য জানতে হলে তাদের ভালবাসতে হবে—গুপ্তরহস্য জানে কেবল তারাই।

একটি পাবলিক লেকচারে কারভার বলেছিলেন, কিভাবে আলবাসার পাহাড়ে গিয়ে কাদামাটির মধ্যে থেকে কয়েকশ প্রাকৃতিক রঙ উনি বার করে এনেছিলেন। মিশরবিদ্‌রা অবাক হয়ে গেছিলেন টুটেনখামেনের সমাধিতে পাওয়া অত্যাশ্চর্য নীলরঙের পুনরাবিষ্কার দেখে।

মৃত্যুর আগে একটি ফুল ছুঁয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে মৃদু হেসে কারভার বলেছিলেন—ফুলের মধ্যে দিয়ে আমি নীরব শক্তি অনন্তের সঙ্গে কথা বললাম।

তৃতীয় খণ্ড



ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীতাবিষ্ট

উদ্ভিদদের সুরবদ্ধ জীবন

শ্রীকৃষ্ণ নাকি সঙ্গীতসুধা দিয়ে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে গাছপালার বৃদ্ধি ঘটাতেন। তানসেন রাগসঙ্গীত গেয়ে বৃষ্টি ঝরিয়েছিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। তামিল সাহিত্যে এই ধারণার প্রমাণ আছে। ঝিঁঝিঁর গানে নাকি কুঁড়ি ফোটে, ফুল ফোটে, আখ ক্ষেতে ভাল ফলন দেখা যায়; সুরেলা সঙ্গীতেও ক্যাসিয়াফিস্টুলা-র সোনালী ফুলে মিষ্টি মধু উপচে পড়ে।

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর আন্নামালাই ইউনিভার্সিটিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর টি. সি. সিং জানতেন উদ্ভিদের এই গুপ্তরহস্য। ভারতীয় ইতিহাস আর দর্শনেও সুপণ্ডিত ছিলেন ইনি। উদ্ভিদের সন্নিকটে বেহালা বাজিয়ে তাদের অনেক বেশী লম্বা আর মজবুত করে তুলতে পেরেছিলেন। 'হাইড্রিলা ভার্টিসিলাটা' নামক জলজ উদ্ভিদ নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন ইনি।

সফল হওয়ার পর দোপাটি ফুলের গাছ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করেন। গায়িকা বান্ধবী গৌরীকুমারীকে বীণায় রাগসঙ্গীত বাজাতে বলেন প্রতিদিন সকালে পঁচিশ মিনিটের জন্যে। একমাস পরে গাছগুলিতে জল সিঞ্চন করতে থাকেন—কোনো আহার দেন নি। বীণা বাজনা শোনানো হয়নি, এমন কয়েকটা গাছকেও পাশে রেখে জল দেন। বীণার সুরামৃত নতুন প্রাণশক্তি জুগিয়েছিল যে গাছগুলিকে, তারা অন্যান্য গাছের চেয়ে পাতা জুগিয়েছিল শতকরা ৭২ ভাগ বেশী, উচ্চতায় বেড়েছিল শতকরা ২০ ভাগ বেশী।

এরপর কয়েক ধরনের টবে পোঁতা উদ্ভিদকে বাঁশী, বেহালা, হারমোনিয়াম আর বীণা-সঙ্গীত শুনিয়ে একই ফললাভ করেছিলেন ডক্টর সিং। বিহার এগ্রিকালচারাল কলেজের ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন, সন্দেহাতীতভাবে আমি প্রমাণ করেছি যে ছন্দোময় শব্দ-তরঙ্গ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফোটানো, ফল ধরানো এবং বীজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে গ্রামোফোনে লাউডস্পীকার মারফৎ চারুকেশী রাগসঙ্গীত বাজিয়ে ছ-রকমের ধানকে শতকরা ২৫ থেকে ৬০ ভাগ বেশী বাড়িয়ে তোলেন ডক্টর সিং মাদ্রাজে এবং পণ্ডিচেরীতে। মটর এবং দোক্তা-পাতাকেও বাড়িয়েছিলেন শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। পায়ে ঘুঙুর না বেঁধে মেয়েদেরকে দিয়ে ভারতনাট্যম নাচ নাচিয়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন মিকেলম্যাস্ ডেজী, সূর্যমুখী এবং পিটিউনিয়া ফুল গাছের। ওঁর মতে সম্ভবতঃ পায়ের তাল মাটির মধ্যে দিয়ে কম্পন সৃষ্টি করে ফুলগাছগুলোকে বাড়তে সাহায্য করেছিল।

১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়-নিবাসী জর্জ স্মিথ ডক্টর সিংয়ের গবেষণা

ব.ত্তান্ত শ্নে অনুপ্রাণিত হন। ইনি ছিলেন বট্যানিস্ট এবং কৃষি গবেষক। রেকর্ড প্লেয়ারে বাজনা বাজিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে একই ফললাভ করেন ইনি।

স্মিথকে এই বিস্ময়কর ব্যাখ্যা করতে বলা হলে তিনি বলেছিলেন, খ্ব সম্ভব শব্দশক্তি ভুট্টার আণবিক সক্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিল। চাষের ক্ষেতের কাছে থার্মোমিটার প্ঁতে রেখে দেখেছিলেন, অব্যাখ্যাতভাবে লাউডস্পীকারের ঠিক সামনের মাটি দু-ডিগ্রী বেশী গরম হয়েছিল। ঈষৎ উত্তপ্ত মাটিতে পোঁতা শস্যের পাতার কিনারাগ্লোও যেন সামান্য ঝলসে গিয়েছিল। অতিরিক্ত সঙ্গীত কম্পনের ফলেই বোধহয় পাতাদের এমনি অবস্থা হতে পারে। ওঁর এক ক্যানসাস নিবাসী বন্ধ্ বলেছিলেন, উচ্চ-কম্পনের আওয়াজ শ্নিয়ে গমের গ্দামে পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তিনি এবং সেই গমই পরে মাটিতে প্ঁতলে অন্য গমের চেয়ে দ্রত ব.দ্ধি পেয়েছিল।

স্মিথ একটা চিঠি পেলেন কানাডার কৃষিবিভাগের গবেষণা-শাখা থেকে। লিখলেন, পিটার বেলটন। বাদুড়রা মথ পোকাদের পরম শত্র্। পঞ্চাশ হাজার চক্র সমন্বিত যে আলট্রাসনিক শব্দ স.ষ্টি করে বাদুড়রা, সেই ধরনের যান্ত্রিক শব্দ স.ষ্টি করে শস্যক্ষেত্রে মথপোকাদের উপদ্রব নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

কানাডার অটোয়া ইউনিভার্সিটির মেজার্স এবং উঈনবার্গ গবেষকদ্বয় অনুপ্রাণিত হলেন স্মিথ আর সিংয়ের গবেষণাব.ত্তান্ত শ্নে। এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখলেন, অব্যাখ্যাতভাবে আলট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ উদ্ভিদদের এনজাইম অ্যাকটিভিটি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ বাড়িয়ে দেয়, বীজ সংখ্যাও ব.দ্ধি পায়। এঁরা দুজনেই তখন চিন্তা করলেন, অশ্রত শব্দ আলট্রাসনিক সাউণ্ডে যদি এই কাণ্ড সম্ভব হয়, তখন শ্রত শব্দ সনিক সাউণ্ডে বা গান বাজনায় শস্য ব.দ্ধি পাবে না কেন?

সফল হল এক্সপেরিমেণ্ট। ৫০০০ চক্র সমন্বিত গানবাজনায় সবচেয়ে ভাল বাড় দেখা গেল উদ্ভিদদের।

গবেষকদ্বয় কিন্তু হতভম্ব হলেন। মাপা বাজনায় এবং শ্রত শব্দ ধারায় উদ্ভিদরা দ্রত বাড়ে কেন, সেই কারণ অন্বেষণে ব্যর্থ হলেন। তাঁদের বিস্ময় লিখিত আকারে প্রকাশ পেল কানাডিয়ান জার্নাল অফ বট্যানি-তে। একটা সম্ভাব্য কারণ অবশ্য লিখলেন সবশেষে। উদ্ভিদকোষে নিশ্চয় অনুনাদী প্রতিক্রিয়া স.ষ্টি করে গান বাজনা—যার ফলে এনার্জি সঞ্চিত হয়ে উদ্ভিদের বিপাক ক্রিয়াকে সাহায্য করে।

ডেনভারের মিসেস ডরোথি রেটালাক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং বিতর্কিত এক্সপেরিমেণ্ট সিরিজ করলেন ১৯৬৮ সালে। একঘেয়ে বাজনা শ্নিয়ে এবং

বিরতি দিয়ে মেরে ফেললেন কয়েকটা উদ্ভিদকে—বেঁচে গেল কেবল আফ্রিকান ভায়োলেট—কারণটা বোঝা গেল না।

দুজন ছাত্র কিন্তু কৌতূহলী হয়েছিল। ডেনভারের রেডিও স্টেশনের বাজনা শুনিয়েছিল দু-দল উদ্ভিদকে। একটা দল শুনেছিল জগঝম্প মার্কা রক মিউজিক—তারা বাঁচেনি। আর একটা দল শুনেছিল সুললিত ধ্রুপদী মিউজিক—তারা হেলে পড়েছিল ট্রানজিসটার রেডিওর দিকে—একটা তো যেন পরম আবেগে জড়িয়ে ধরেছিল রেডিওটাকে।

১৯৬৯ সালে একই কায়দায় এক্সপেরিমেণ্ট করে একই ফললাভ করলেন মিসেস রেটালাক। রক মিউজিক শুনে হয় বেধড়ক লম্বা হল সূর্যমুখী উদ্ভিদরা, নয়তো ক্ষুদে ক্ষুদে পাতা সৃষ্টি করল, অথবা কোনো বাড় ঘটল না। কিন্তু মাত্র ছ-ফুট দূরে একই শ্রেণীর সূর্যমুখীরা ধ্রুপদী সঙ্গীত উপভোগ করে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন মিসেস রেটালাক। রক সঙ্গীত শুনে যেন আধমরা সূর্যমুখী বেশী জল পান করেও ধ্রুপদী সঙ্গীতাবিষ্ট সূর্যমুখীদের চেয়ে বাড়েনি।

'অ্যাসিড রক মিউজিক' শুনিয়ে আরও প্রকট হল উদ্ভিদদের বিতৃষ্ণা—সবকটা গাছই হেলে পড়ল সঙ্গীত-উৎসের বিপরীত দিকে। অ্যাসিড রক মিউজিকে তাল,লয় এমনই উদ্দাম এবং কান ঝালাপালা করা যে সূক্ষ্ম সূর্যমুখীরা যেন পাগল হবার উপক্রম হয়েছিল—পালাতে পারলে বাঁচে, এমনিভাবে উল্টো দিকে হেলে পড়েছিল!

এরপর প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী বাজনা শোনানোর ব্যবস্থা করলেন মিসেস রেটালাক। বাক অর্গান এবং রবিশঙ্করের সেতারে ভারতীয় রাগসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। রবিশঙ্করের সেতার শুনে ষাট ডিগ্রীরও বেশী হেলে পড়ে জমির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে গেল উদ্ভিদরা—সবচেয়ে কাছেরটা তো আলিঙ্গন করে বসল লাউডস্পীকারকে! পাশ্চাত্যের লোকসঙ্গীত আর জাজ বাজনা শুনিয়ে এতটা না হলেও, এর কাছাকাছি ফললাভ করলেন মিসেস রেটালাক।

সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলেন আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার। সঙ্গীতমুগ্ধ উদ্ভিদদের চেম্বারে পরিশ্রুত জলের বাষ্পীকরণ বেগ বেড়ে গেল নিস্তব্দ চেম্বারের বাষ্পীকরণের চেয়ে।

খবরের কাগজে এই নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হতেই সমালাচকরা এক যোগে গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিল মিসেস রেটালাকের। একি গবেষণা, না ছল-বিজ্ঞানের কারচুপি! বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানীদের উপহাস

করা হচ্ছে নাকি ?

ঠিক সেই সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার 'রেজিস্টার' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়লেন মিসেস রেটালাক। দুজন ডাক্তার বলেছেন কড়া রক মিউজিক বাজিয়ে ৪৩ জন বাদকের ৪১ জনই স্থায়ীভাবে বধির হয়ে গেছে! তরুণ তরুণীদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে সেদিন শিউরে উঠেছিলেন মিসেস রেটালাক।

মারিহুয়ানা সেবনে অবাস্তব কল্পচিত্র ভেসে ওঠে ধূমপায়ী এবং মারিহুয়ানা পত্র-সেবীদেব মানসচক্ষে। রক মিউজিকের প্রভাবটা তাহলে মারিহুয়ানা পত্রের ওপর কি রকম হওয়া উচিত—এই কল্পনায় অস্থির হয়েছিলেন দীর্ঘকেশ এক বাদক। মিসেস রেটালাকের এক্সপেরিমেণ্ট সংশয় জাগিয়েছিল ডেনভারের বহু রক সঙ্গীতের অন্তঃকরণে।

মিসেস রেটালাক কিন্তু এক্সপেরিমেণ্টের দার্শনিক তাৎপর্য অন্বেষণে হাতরাতে বসেছিলেন লাইব্রেরীর প্রাচীন পুঁথি। হাতে পড়েছিল 'বুক অফ সিক্রেট্‌স্ অফ এনক' বইখানা। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারকা পর্যন্ত প্রত্যেকের নিজস্ব 'দেবতা' আছে। গ্রীকরা হারমিস ট্রিসমেগিসটাসকে বলেছিল 'ত্রিবিধ মহত্তম'। মিশরীয় কলাশিল্প, বিজ্ঞান, জাদুবিদ্যা, পরাবিজ্ঞান এবং ধর্মের মূল উদ্ভাবক হিসেবে এঁকে সম্মান দেওয়া হয়। এহেন হারমিস বলেছেন, উদ্ভিদদের জীবন আছে, মন আছে, আত্মা আছে—পশু, মানব এবং ঊর্ধ্বস্তরের সত্তাদের মতই।

প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থ ঘেঁটে মিসেস রেটালাক উদ্ধার করলেন আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। সঙ্গীত সম্পর্ক-রচনা করে আছে সমস্ত সত্তা আর মানুষের প্রাণসত্তার মধ্যে—আকাশ আর পৃথিবীর সুরে সুর মিলিয়ে আছে এই সঙ্গীত। ফারাওয়ের আমলে মিশরের পুরোহিতরা সাতটা পবিত্র সুরকে উৎসর্গ করেছিলেন সাতটা গ্রহের উদ্দেশে। গ্রহ দেবতাদের শক্তি এভাবেই তারা আহরণ করতেন মানব কল্যাণে। খৃস্টানরাও গির্জেতে এত সপ্তসুরের সমন্বয় ঘটিয়েছেন স্তোত্র-পাঠের মধ্যে।

জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত রসায়ন অধ্যাপক ডোনাল্ড অ্যান-ড্রুজ মনে করতেন পরমাণুর একদম কেন্দ্রে রয়েছে সঙ্গীতের শব্দ। 'সিমফনি অফ লাইফ' নামে একটা বই লিখেছিলেন তিনি। পাঠকদের আমন্ত্রণ করেছিলেন একটা কল্পভ্রমণে। আঙুলের ডগার একটিমাত্র ক্যালসিয়াম অ্যাটমকে বিবর্ধিত করে তার মধ্যে যাত্রা হল শুরু। বেহালার চাইতেও অনেক গুণ বেশী তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা যাবে আটমের কেন্দ্রীণে। চার্চ মিউজিকের চাইতেও নাকি অনেক জটিল সেই সঙ্গীত—কান পেতে শুনলে তবে ঠাহর করা যায়। এ ছাড়াও আছে অনেক তাল কাটা সঙ্গীত—যা আধুনিক সুরকারদের সঙ্গীতে লক্ষণীয়।

ইংরেজ সুরকার এবং থিয়সফিস্ট সিরিল স্কট বলেছেন, এই বেসুরো সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই হল চিন্তার চেহারাকে ভেঙে দেওয়া। আধুনিক ভাবনায় যাকে বেসুরো বলা হয়, তাকে ভাঙতে হলে চাই বেসুরো সঙ্গীত। সুললিত সুর এত সূক্ষ্ম যে বেসুরো স্থূলতাকে স্পর্শও করতে পারে না। এই ধরনের অনেক অদ্ভুত কথা ইনি লিখেছেন তার 'মিউজিক, ইট্‌স্‌ সিক্রেট ইনফ্লুয়েন্স থ্রোআউট দ্য এজেস' কেতাবে।

সঙ্গীতের মাধ্যমে অনৈক্য ভেঙে ঐক্য আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন স্ট্র্যাভিনস্কি এবং স্কোনবার্গ। রাশিয়ান সুরকার আলেকজাণ্ডার স্ক্রিবিয়ান মনে করতেন মানব-কল্যাণে সঙ্গীতাকারে আত্মিক সমাচার প্রচার করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ঊর্ধ্বস্তরের সত্তায় বিশ্বাসী রাশিয়ান সিজার ফ্রাঙ্ক মানুষ এবং দেবগণের মধ্যে সঙ্গীতের সেতু রচনা করতে চেয়েছিলেন। উনি নিজেকে প্রথম ইউরোপীয় সুরকার মনে করতেন যিনি সুপ্রাচীন অকাল্ট রহস্যের সঙ্গে আধুনিক সুরশিল্পের সমন্বয়সাধন করেছিলেন। রুশবিপ্লবের দু-বছর আগে ইনি মারা যান। জীবনের শেষ পনেরো বছর ধরে লিখছিলেন Mysterium বইখানা—যে বইতে ইনি অর্কেস্ট্রা, সুগন্ধ, আর নয়নাভিরাম আলোক-সম্পাতের সমন্বয়ে মনের সীমাকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন যা কিনা হেলিওপোলিস এবং অন্যান্য অকাল্ট মন্দিরের পুরুৎরা কয়েক হাজার বছর আগে করেছেন।

জার্মান লেখক হ্যান্স কাইজার সঙ্গীতের সুর আর গাছের আকারের মধ্যে সুরের অষ্টকের কোনো প্রভাব আছে কিনা জানতে আগ্রহী হন। উনি লক্ষ্য করেন, একটা অষ্টকে যদি সব সুর মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হয়, এবং জ্যোতির্বিদ জোহান্স কেপলার যেভাবে সৌরজগৎ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাঁর Harmonid Mundi গ্রন্থে, ঠিক সেইভাবে গ্রহজগতের দেবগণকে যদি স্কেচ করা যায় তাহলে বৃক্ষপত্রের অনুরূপ আকার আঁকা যায়।

গ্যেটের মেটামরফসিস অফ প্ল্যাণ্ট্‌স্‌ তত্ত্বের সমর্থক কিন্তু কাইজারের এই মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। উদ্ভিদের মূল অংশ সঙ্গীতে গড়া—সাইকিক নার্ভ।

মানুষ তার সীমিত ইন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বহু কম্পন তরঙ্গের নগণ্য ভগ্নাংশ গ্রহণ করতে সক্ষম। নির্গন্ধ ডেজী হয়ত গোলাপের মতই সুগন্ধময়—গন্ধযন্ত্রের অক্ষমতার দরুন আমরা তা ধরতে পারি না। শব্দ-তরঙ্গ যে সঙ্গীত এবং জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছে, সে প্রমাণ যেদিন পাওয়া যাবে, সেদিন অনেক বিস্ময়কর দুনিয়া আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে।

উদ্ভিদ আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিজ্‌ম্‌

সঙ্গীত আর শব্দে উদ্ভিদ সাড়া দেয় কিভাবে আজও যেমন সুস্পষ্ট বোধগম্য

হয়নি, ঠিক তেমনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে তাদের প্রতিক্রিয়াও অনচ্ছ থেকে গিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের কাছে। অগণন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি তরঙ্গর কোনটি সজীব বস্তুর ক্ষতিকারক, আর কোনটি উপকারক, আজও সে ব্যাপারে তমিস্রায় রয়েছে মানুষ।

ময়রান ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক এবং জ্যোতির্বিদ। জাতে ফরাসী। সূর্যাস্তর সময় উনি লক্ষ্য করলেন 'মিমোসা পুদিকা' উদ্ভিদের পাতা মুড়ে যায় এমনভাবে যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা হল। সূর্যোদয়ের সময়ে 'মিমোসা পুদিকা' রাখলেন অন্ধকার কক্ষে—তা সত্ত্বেও পাতা খুলে গেল। সূর্যকে না 'দেখেও' যেন 'উপলব্ধি' করল 'মিমোসা পুদিকা'। বিষয়টা ফরাসী আকাদেমিতে বিবৃত করে সসংকোচে ময়রান বলেছিলেন, 'ব্রহ্মাণ্ডের কোনো অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে রয়েছে যেন উদ্ভিদরা'।

প্রায় আড়াইশ বছর পরে ময়রানের এই পর্যবেক্ষণের নতুন প্রমাণ হাজির করলেন ফ্লোরিডার সারাসোটা-স্থিত এনভায়রনমেণ্ট্যাল হেলথ্ অ্যাণ্ড লাইট রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের কর্মাধ্যক্ষ—ডক্টর জন অট। 'অজ্ঞাত এই শক্তি' পুরু মৃত্তিকা-স্তর ভেদ করে যেতে পারে কিনা জানবার জন্যে আগ্রহী হলেন ইনি। মাটিই একমাত্র বস্তু—যা ব্রহ্মাণ্ডের 'কসমিক রেডিয়েশন'কে রুখে দিতে পারে। তাই একটা খনির অন্ধকারে ৬৫০ ফুট নিচে নামলেন ৬টা মিমোসা নিয়ে। সূর্যাস্তর জন্যে আর অপেক্ষা না করে, পাতাল কক্ষের অন্ধকারে তৎক্ষণাৎ পাতা মুড়ে ফেলল মিমোসারা। এমন কি চারপাশে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে রাখা সত্ত্বেও পাতা আর খুলল না। ব্যাপারটার মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের হাত আছে, এই সিদ্ধান্তলাভ ছাড়া কিন্তু অন্ধকারেই রয়ে গেলেন অট। ময়রানের সময়ে অবশ্য অজ্ঞাত ছিল এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম্।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের সঙ্গে শব্দ তরঙ্গের—তফাৎ শুধু এক জায়গায় —বায়ু শূন্যতার মধ্যে দিয়ে প্রথমটি পরিভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু কিভাবে পারে আজও কেউ তা ব্যাখ্যা করতে পারে নি। অনেক বিজ্ঞানীই ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম্-য়ের ফিজিক্যাল প্রপার্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিভাবে তাকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানো যায় গবেষণা করেছেন। কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই চিন্তা করেছেন সজীব বস্তুর ওপর এই শক্তির প্রভাবটা সম্পর্কে।

প্রথম যিনি এই সম্পর্কে গবেষণা করলেন, তার নাম মেমব্রে—স্টকল্যাণ্ডের মানুষ। ১৭৪৬ সালে দুটো মেদিগাছকে ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটরের পাশে রেখে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন অন্য গাছগুলো যখন অংকুরিতই হল না—তাঁর মেদিগাছ দুটি তখন অংকুরিত হয়ে তিন ইঞ্চি শাখা মেলে ধরল।

১৭৪৯ সালে জাঁ নোলেট নামে এক ফরাসী পাদরী এবং ফিজিক্সের শিক্ষক

একজন জার্মান পদার্থবিদের কাছে শুনলেন, জলভর্তি ক্যাপিলারী টিউবে বিদ্যুৎ সঞ্চার করলে অবিরাম জল পড়ে। নইলে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে—ক্যাপিলারী টিউবে যা 'স্বাভাবিক'। এক্সপেরিমেণ্টটা পুনরনুষ্ঠিত করে নোলেট লিখলেন, প্রকৃতিসৃষ্ট হাইড্রলিক মেশিন এই জীবদেহের ওপরেও বৈদ্যুতিক প্রবাহ যে কোনোভাবেই হোক প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে বলা যায়।

বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে টেনে আনার বছর কয়েক আগেই নোলেট পরীক্ষা করে দেখালেন ধাতুপাত্রস্থ উদ্ভিদ ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটরের পাশে রাখলেই তার স্বেদনবেগ বৃদ্ধি পায়, বিদ্যুৎযুক্ত পাত্রে বীজ রাখলে স্বাভাবিকের চাইতে বাড় বৃদ্ধি পায়। এই এক্সপেরিমেণ্ট থেকেই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন নোলেট যে তড়িৎপ্রবাহ সজীব বস্তুর বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আবহমণ্ডলের তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে উদ্ভিদদের ফলবান করার কাজে এর পরেই এগিয়ে এলেন ১৭৭০ সালে ইটালীর প্রফেসর গার্ডিনি। তুরিনের একটি সন্ন্যাসী উদ্যানে ফলে ফুলে ভরে থাকত গাছপালা। চাঁদোয়ার মত তার বিছিয়ে দিলেন গাছগুলোর ওপর দিয়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু বৃক্ষ শুকিয়ে গেল এবং পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। গার্ডিনি তাজ্জব হয়ে গেছিলেন। তবে কি তড়িৎ প্রবাহ অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করার ফলে অক্কা পেল বৃক্ষরা ?

প্যারিসে দুজন যাত্রীসমেত একটা বেলুন ওড়ানো হয়েছিল এই সময়ে ১০ কিলোমিটার উচ্চতায় ২৫ মিনিটের আকাশ-ভ্রমণে। গার্ডিনি তাই শুনে বলেছিলেন বেলুনের সঙ্গে লম্বা তার ঝুলিয়ে আবহমণ্ডলের তড়িৎ প্রবাহ টেনে এনে নিচের কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানে তা সঞ্চার করলে পারলে বৃক্ষরা উপকৃত হবেই।

বিজ্ঞানমহলের সুধীবৃন্দ কিন্তু ফরাসী এবং ইতালীয় পরীক্ষানিরীক্ষার প্রতিবেদন শুনে উল্লসিত হন নি। তাঁরা কিন্তু তখনও অধিকতর আগ্রহী জড়-বস্তুর ওপর তড়িৎপ্রবাহের কার্যকারিতা দেখার বিষয়ে—সজীব বস্তুর ওপর নয়।

১৭৮৩ সালে আর একজন পাদরী অ্যাবি বার্থোলন একটা চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ রচনা করেও পণ্ডিতদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারলেন না। এই গ্রন্থে তিনি একটা অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দিয়েছিলেন। তড়িৎপ্রবাহনিরোধক একটা বস্তুর ওপর মালঞ্চের মালীকে দাঁড় করিয়ে তড়িৎপ্রবাহযুক্ত ঝারি থেকে জল সিঞ্চন করিয়েছিলেন উদ্ভিদে। অসাধারণ উচ্চতা লাভ করেছিল উদ্ভিদগুলো। ইলেকট্রোভেজিটোমিটার নামক একটা যন্ত্রের কথাও বলেছিলেন পাদরী বার্থোলন। অ্যান্টেনা মারফৎ আহমণ্ডলের বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে গাছের মধ্যে দিয়ে তা সঞ্চারিত করে দেওয়ার যন্ত্র। সবশেষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বার্থোলন বলেছিলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠ সার আকাশ থেকে সরাসরি নেমে

আসবে তড়িৎপ্রবাহ আকারে।

১৭৮০ সালের নভেম্বরে গ্যালভানি চমৎকৃত হলেন সজীব বস্তুর সঙ্গে ইলেক-ট্রিসিটির নিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করে। দৈবাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন, স্থির-তড়িৎ উৎপাদনকারী মেশিনের পাশে ব্যাঙের ছিন্নপদ রাখলে তা তিড়িক তিড়িক করে লাফিয়ে ওঠে। সবিস্ময়ে উনি মন্তব্য করেছিলেন, তবে কি তড়িৎপ্রবাহ প্রাণের বহিঃপ্রকাশ ? ওয়ার্কবুকে লিখেছিলেন, স্নায়ব পেশীগত ফোর্সকে উদ্দীপ্ত করতে পারে তড়িৎ-তরল।

পরের ছ-বছর এই-বিষয়ে গবেষণা করার সময়ে দৈবাৎ গ্যালভানি আবিষ্কার করলেন, তামার তারের সংস্পর্শে এলে তড়িৎপ্রবাহ ছাড়াই ব্যাঙের ছিন্নপদ নৃত্য-পর হয় ; শক্তিটা তাহলে প্রাণীজগতের কলাতন্তুর মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণশক্তির আকারে ; এই এনার্জির তিনি নামকরণ করলেন 'এনিম্যাল ইলেকট্রিসিটি '।

ডাচি অফ মিলানের ইউনিভার্সিটি অফ পাভিয়ার পদার্থবিদ ভোল্টা উত্তেজিত হলেন গ্যালভানির আবিষ্কারে। পুনরনুষ্ঠিত করলেন এক্স-পেরিমেণ্টটা। এগিয়ে গেলেন আরও এক ধাপ। দুটো বিভিন্ন ধাতু পাশা-পাশি রেখেও তড়িৎপ্রবাহ সঞ্জাত করা যায় আবিষ্কার করলেন। ইলেকট্রিসিটি তাহলে ব্যাঙের পা থেকে আসছে না, দুটো ভিন্নধর্মী ধাতু পাশাপাশি রাখলে এনার্জিটাকে উৎপন্ন করা যাচ্ছে। ইলেকট্রিক স্টোরেজ সেল-য়ের আদি পুরুষ তাঁর এই আবিষ্কার। জন্ম নিল কাইনেটিক ইলেকট্রিসিটি—প্রাকৃতিক বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির ওপর আর নির্ভর করতে হল না বিজ্ঞানীদের। এই আবিষ্কারের ফলে সজীব দেহস্থিত বিশেষ ভাইটাল এনার্জির যে ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন গ্যালভানি, তা মুছে গেল বিজ্ঞানীদের মন থেকে। গ্যালভানি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে একদিন হয়ত আবহমণ্ডলের বিবিধ উপাদানের সম্যক নিরূপণ সম্ভব হবে, প্রাণশক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ ঘটবে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাঁর এই আইডিয়া নাকচ করলেন। এ সম্পর্কে কাজ করতেও চাইলেন না।

গ্যালভানি যে খবরটা রাখতেন না, তা কিন্তু বছর কয়েক আগেই ঘটেছিল। লোডস্টোনের 'আত্মারূপী' বৈশিষ্ট্যগুলোকে লোহাজাতীয় ধাতুসমূহের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় গিলবার্টের এই ধারণাকে সম্বল করে হাঙ্গারীর হেলসাহেব তাঁর ছিনেজোঁক বাতব্যাধিকে নিরাময় করার অত্যাশ্চর্য একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন দুটিমাত্র ম্যাগনেটাইজড স্টীল প্লেটের সাহায্যে।

হেলসাহেবের বন্ধু ছিলেন ভিয়েনার ডাক্তার মেসমার। ম্যাগনেটিজম রোগ-নিরাময় করে দেখে তিনি আগ্রহী হলেন এবং ধারাবাহিক এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে গেলেন। ফলে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো যে 'পার্থিব এবং আকাশিক চুম্বক-

শক্তিকে অনুভব করার ক্ষমতা আছে সজীব বস্তু সমূহের। ১৭৭৯ সালে এই
ক্ষমতাকেই তিনি নাম দিলে 'এনিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌'। একটা থিসিসও
লিখলেন—নরদেহে গ্রহের প্রভাব। সুইস যাজক গ্যাসনার রুগীদের স্পর্শ করে
আরোগ্য করেন, এই খবর জানতে পেরে সেই কায়দা নিজেও রপ্ত করলেন এবং দাবী
করলেন তাঁর এবং কিছু ব্যক্তির মধ্যে চুম্বক শক্তি আছে অন্যের চাইতে বেশী।

মেসমারের সাফল্য দেখে কিন্তু ঈর্ষান্বিত হলেন তাঁর ভিয়েনাস্থিত বন্ধু-
ডাক্তাররা। তাঁরা যে রোগের নিদানে অক্ষম হতেন, নিরাময় করতে পারতেন না,
মেসমার তা সারিয়ে দিতেন। পরিণামে মেসমারকে বলা হল তিনি নাকি ডাকিনী
বিদ্যার স্মরণ নিয়েছেন, শয়তানের উপাসক হয়েছেন। দলবদ্ধভাবে তাঁরা কমিশন
গঠন করে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির তদন্ত করলেন। কমিশন রায় দিল তাঁর বিরুদ্ধে।
চিকিৎসার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল তাঁর কাছ থেকে। বহিষ্কৃত হলেন চিকিৎসক-
সমাজ থেকে। বায়োইলেকট্রিক্যাল এবং বায়োম্যাগনেটিক এনার্জি সম্পর্কিত
গবেষণার ফলে যে নবীন যুগের সূচনা ঘটত, তার দ্বার হল রুদ্ধ।

পশার হারিয়ে মেসমার চলে গেলেন প্যারিসে ১৭৭৮ সালে। সাধারণ
মানুষ উৎসাহিত হলেও সেখানেও কিছুদিন পরে ক্রুদ্ধ হল চিকিৎসক সমাজ।
তদন্তকারী কমিশন সেখানেও রায় দিল—মেসমারের এনিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-য়ের
নাকি আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। জনগণ উপহাস করল তাঁকে। হ্রাস পেল
জনপ্রিয়তা। অবসর নিলেন সুইজারল্যান্ডে। মারা গেলেন ১৮১৫ সালে।
মৃত্যুর একবছর আগে সমাপ্ত করে গেলেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মেসমেরিজ্‌ম্‌
সম্পর্কে।

আজকে ইলেকট্রিসিটি সংক্রান্ত বই ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ জানে
না ইলেকট্রিসিটি কী এবং তার কার্যকারিতা আজও রহস্য হয়ে রয়েছে বিজ্ঞানী-
দের কাছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের উপাদানসমূহ আজও অজ্ঞাত—যদিও
তার ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছে রেডিও, রাডার, টেলিভিশনে।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম যে সজীববস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল, তা নিয়ে আর
গবেষণা এগোলো না—যন্ত্রপাতিই তৈরী হল দেদার, অবশেষে ১৮৪৫ সালে
একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ব্যারন রাইকেনবাক আবিষ্কার করলেন যে বিশেষ কিছু
'সংবেদনশীল' মানুষ সমস্ত সজীববস্তু এবং চুম্বকের প্রান্ত থেকে বিকিরিত অদ্ভুত
একটা এনার্জিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই এনার্জির তিনি নাম দিলেন
'ওডাইল' বা 'অড'। তাঁর গবেষণা বৃত্তান্ত ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন উই-
লিয়াম গ্রেগরী। নামী ডাক্তার ছিলেন তিনি—নিযুক্ত হয়েছিলেন এডিনবরা
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন অধ্যাপকের পদে। ইংলণ্ডের সহকর্মীরা কিন্তু পাত্তাই
দিন না তাঁর উৎসাহকে।

রাইকেনবাক লিখেছিলেন, রহস্যময় এই অডিক ফোর্স মেসমার বর্ণিত এনিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-য়ের অনুরূপ অথবা তার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, এই শক্তির পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব। কোনো বস্তু স্পর্শ করলেই তিনি নাকি একটা অস্বস্তিকর সুরের অস্তিত্ব অনুভব করতেন।

অনেক বছর পরে উইলহেল্‌ম্‌ রাইক লিখেছিলেন, রাইকেনবাকের 'অড' আর প্রাচীন পুরুষদের 'ইথার' নামক সমতুল্য রহস্যময় এনার্জি আবিষ্কার করে প্রাচীন গ্রীকরা তার নাম দিয়েছিল 'অরগন'। রাইকের বিশ্বাস, অরগন এনার্জি মহাশূন্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত স্থান, স্পেশ এমন কি বায়ুশূন্যতায় পর্যন্ত অবস্থান করছে এবং এই মাধ্যমের মাধ্যমেই সঞ্চরমান রয়েছে আলোক-তরঙ্গ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ও মহাকর্ষ সম্পর্কিত তৎপরতা। সজীব এবং অজীব বস্তুর মধ্যের মূল সম্পর্ক সূত্র নাকি এই অরগন। সনাতনী বিজ্ঞানের লেখক হ্যালার্সি সরল কথায় পরে লিখেছিলেন, 'বলতে গেলে যাবতীয় সজীবতার মধ্যেই রয়েছে ইলেকট্রন প্রবাহ'।

কোষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর সুপ্রাচীন গ্রীক ধারণাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমর্থলাভ করল। গ্রীকরা বলেছিল, উদ্ভিদ, পশু এবং মানব সৃষ্টি হয়েছে একই মূল উপাদান দিয়ে। ক্রোমোজোম, জিন, ডি-এন-এ আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রাণের ওপর ইলেকট্রোম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-য়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তলিয়ে কেউ আর ভাবেন নি। কদাচিৎ দু-একজন কেবল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে উদ্ভিদের ওপর মহাজাগতিক শক্তিসমূহের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে।

আটলাণ্টিকের পরপারে উইলিয়াম রস ১৮৪৪ সালে তাঁর একটা আবিষ্কারের পেটেন্ট করিয়ে নিলেন। মার্কিন দপ্তর এই সম্পর্কে যে প্রতিবেদনটি ছাপে, তার নাম 'উদ্ভিদ সম্পর্কে গ্যালভানিক এক্সপেরিমেণ্ট'। রস প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, মৃদু তড়িৎ প্রবাহে বীজ অংকুরিত হয় অতি দ্রুত। উনি এই পদ্ধতির ব্যবসায়িক সাফল্য কল্পনা করেছিলেন বলেই পেটেণ্ট করিয়ে নিয়েছিলেন অবিলম্বে।

১৮৫৯ সালে লণ্ডনের 'গার্ডেনার্স ক্রনিক্‌ল্‌'-য়ে একটা রিপোর্ট ছাপা হল। শুষ্ক আবহাওয়ার পরে আসন্ন বজ্রগর্ভ ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিলেই নাকি স্কারলেট ভারবেনা পুষ্পেরা নিজেদের মধ্যে আলোর ঝলক বিনিময় করে। এই ঝলক ঝড় বিদ্যুৎ আসার আগে বেশী দেখা যায়—অন্য সময়েও দেখা যায়। গ্যেটের আবিষ্কার সমর্থিত হল অবশেষে। উনিও বলেছিলেন সন্ধ্যাসমাগমে ফ্ল্যাশ নিক্ষেপ করে ওরিয়েণ্ট্যাল পপি পুষ্পেরা।

শতাব্দীর শেষাংশে বাতাসে তড়িৎ সম্পর্কিত প্রকৃত ধ্যানধারণার নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটল জার্মানীতে। ফটো-ইলেকট্রিক সেল এবং আল্‌ট্রাভায়োলেট

রশ্মিমিটারের উদ্ভাবক দুই বিজ্ঞানী যাবতীয় অজীব বস্তুর বিকিরণ নিয়েও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আবহমণ্ডলের তড়িৎ নিয়ে এখন তাঁরা ব্যাপক গবেষণা শুরু করলেন। দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীর মৃত্তিকা থেকে তড়িতাবিষ্ট কণিকা বিরামবিহীনভাবে ধেয়ে যাচ্ছে আকাশপানে। এই কণিকারা হয় অ্যাটম বা মলিকিউল বাহিনী—ইকেলট্রন গ্রহণ বা বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে যাদের মধ্যে পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জের হেরফের ঘটছে!

পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নির্মল দিবসে ধরিত্রীর থাকে নেগেটিভ ইলেকট্রিক্যাল চার্জ—আবহমণ্ডলের থাকে পজিটিভ; তাই মাটি আর উদ্ভিদ থেকে ইলেকট্রন ধেয়ে যায় আকাশ পানে। মেরুপ্রবণতা পাল্টে যায় ঝড়ের সময়ে। পৃথিবী হয় পজিটিভ, মেঘের তলদেশের স্তর হয় নেগেটিভ। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পৃথিবী যতটা চার্জ হারায়, ঝড়ের সময়ে তা ফিরে পায়। কেন না, যে কোনো সময়ে গড়পরতা ৩০০০ থেকে ৪০০০ বৈদ্যুতিক ঝড় হয়েই চলেছে ভূগোলকে। তড়িৎ-ভারসাম্য বজায় থাকে এই কারণেই। এই কারণেই ঊর্ধ্বস্তরে ভোল্টেজ বা তড়িৎ-চাপ এত বেশী থাকে। বিপুল এই তড়িৎ-আধার থেকে প্রয়োজন মত আমরা তড়িৎসংগ্রহ করতে পারি না সঠিক জ্ঞানের অভাবে।

আবহমণ্ডলের তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে উদ্ভিদবৃদ্ধির কাজকর্ম শুরু হয় নতুন করে ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে। ঐ সময়ে ফিনিশ বৈজ্ঞানিক সেলিম লেমস্ট্রম চারটে অভিযান পর্ব পরিচালনা করেন ল্যাপল্যাণ্ড আর উত্তর নরওয়ের নিম্ন মেরু অঞ্চলে। মেরুআলোক আর ভূ-চুম্বকবিজ্ঞানে ইনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। ওঁর নিজস্ব অনুমিতি অনুযায়ী বিশ্বাস করতেন এই অক্ষাংশের বনভূমি-সমৃদ্ধি অরোরা বোরিয়ালিস নামক উদ্দাম বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যই সম্ভব হয়েছে—দীর্ঘ গ্রীষ্মদিবস এর মূলে নয়—যদিও জনমত তাই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সময় থেকেই জানা গেছে সূচ্যগ্র বস্তুই বিশেষ করে আবহমণ্ডলের বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। লাইটনিং কন্‌ডাকটরের উদ্ভাবন ঘটেছে এই তত্ত্ব থেকেই। লেমস্ট্রম যুক্তি দিয়ে বললেন, গাছপালার সূচ্যগ্র শীর্ষও অ্যাটমসফেরিক ইলেকট্রিসিটিকে টেনে নেয় লাইটনিং কন্‌ডাকটরের মত এবং ভারসাম্য বজায় রাখে বাতাস আর জমির তড়িৎ-প্রবাহে।

চিরহরিৎ ফারবৃক্ষদের বলয় পরীক্ষা করে উনি দেখেছিলেন, বার্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চ অরোরা আর সূর্যকলঙ্ক ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। উত্তর অভিমুখে যেতে যেতে দেখা যায়, এই বার্ষিক বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

পর্যবেক্ষণটাকে যাচাইও করেছিলেন লেমস্ট্রম। ধাতুর পাত্রে রেখেছিলেন কিছু ফুল; মাথার ওপর চাঁদোয়ার মত তার খাটিয়ে খুঁটি সংলগ্ন করেছিলেন মাটির সঙ্গে—স্ট্যাটিক জেনারেটর দিয়ে তড়িৎ সঞ্চালন করেছিলেন এই পাত্রে।

অন্যান্য পাত্রে ফুল রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশে এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন, ধাতুর পাত্রস্থিত ফুল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। যন্ত্রটাকে বাগানে বসানোর পর স্ট্রবেরীর উৎপাদন হয়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ এবং মিষ্টতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যব উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল এক তৃতীয়াংশ বেশী। 'ইলেকট্রোকালচার' গ্রন্থে লেমস্ট্রম এই তথ্য সন্নিবেশিত করেন। বইটা ছাপা হয় ১৯০২ সালে বার্লিনে।

এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় দু'বছর পরে এবং কৌতূহলী হন সুবিখ্যাত পদার্থবিদ্ এবং সাইকিক গবেষক স্যার অলিভার লজ। লজ খুব উঁচু খুঁটিতে তারের চাঁদোয়া খাটিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি করেন। বিঘে পিছু ময়দার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা চল্লিশ ভাগ হারে— সেই ময়দা থেকে তৈরী রুটিও হয় অন্য রুটির চেয়ে উৎকৃষ্ট।

লজের সহকর্মী জন নিউম্যান পৃথকভাবে কাজ করে ইংলন্ডের ইভ্স্হ্যামে গমের উৎপাদন বাড়ান শতকরা বিশ ভাগ। স্কটল্যাণ্ডের ডামফ্রিতে আলুর চাষেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করেন। সুগারবীটের চাষ করে দেখিয়ে দেন তাতে চিনির পরিমাণও বেশী। ফলাফল প্রকাশ করেন কোনো উদ্ভিদ সংক্রান্ত ম্যাগাজিনে নয়—নিউইয়র্কের ম্যাকগ্রহিল প্রকাশিত 'স্ট্যাণ্ডার্ড হ্যাণ্ডবুক অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্সের পঞ্চম সংস্করণে।

ফোর্স ফিল্ড, মানুষ আর উদ্ভিদ

ইঞ্জিনীয়াররা কিন্তু বাস্তববাদী। কোনো ব্যাপার আদৌ ঘটে কিনা, সেই সমস্যায় মস্তিষ্ক পীড়ন না করে তাঁরা ব্যাপারটা ঘটছে কেন এবং কি ভাবে, এই তত্ত্বানুসন্ধানেই ব্রতী হন। এই মনোভাবের অভাবেই বহু চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার অবহেলিত হয়েছে অতীতে।

জোসেফ মোলিটোরিস্জ্ ছিলেন হাঙ্গারীর উদ্বাস্তু। যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। ইলেকট্রো-অসমোসিস বিষয়টা তাঁর আগ্রহ জাগায়। একটা রেডউড বৃক্ষ তার বৃক্ষরসকে মাটি থেকে তিনশ ফুট উঁচুতে তুলে নিয়ে যেতে পারে—কিন্তু মনুষ্যনির্মিত একটা উৎকৃষ্ট সাকসন পাম্প তার একদশমাংশ উঁচুতে জল তুলতে পারে দেখে হতবুদ্ধি হন ভদ্রলোক। গাছ এবং তড়িতের মধ্যে তাহলে এমন কিছু আছে যা হাইড্রোডায়নামিক্স-য়ের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিচালিত ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে লেবু বাগানে এক্সপেরিমেণ্ট করলেন মোলিটোরিস্জ্। ইলেকট্রো অসমোসিস'য়ের আইডিয়াটা উনি পেয়েছিলেন অ্যাবি নোলেটের কাছ থেকে।

তাঁরই পদ্ধতি অনুযায়ী এক দিক থেকে কারেণ্ট চালিয়ে দেখলেন, লেবু গাছগুলো ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে, বিপরীত দিকে থেকে কারেণ্ট চালালে চারাগাছগুলো কুঁচকে যাচ্ছে। নিশ্চয় তাহলে উদ্ভিদমধ্যস্থ তড়িৎপ্রবাহকে কখনো উদ্বেলিত আবার কখনো ব্যাহত করছে বাইরের তড়িৎপ্রবাহ। অ্যাবি বার্থোলোনের বই পড়ে মোলিটোরিস্‌জ্‌ আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন। একটা কমলালেবু গাছের ছ-টা শাখায় তড়িৎ সঞ্চালন করলেন—অন্য ছ-টা শাখা স্পর্শও করলেন না। আঠারো ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল, তড়িতাবিষ্ট শাখা ছ-টার মধ্যে বৃক্ষরস অবাধে ছড়িয়ে পড়েছে—অন্য ছ-টায় তেমন হয়নি। কমলা চাষ বড় মেহনতী ব্যাপার। কেন না, সব কমলা পাকে না বলে হাতে করে পাকা ফল পাড়তে হয়। মোলিটোরিস্‌জ্‌ কমলা গাছে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলেন—পাকা কমলাগুলিই কেবল টুপ-টুপ করে খসে পড়ল—অনেক মেহনৎ বেঁচে গেল।

মোলিটোরিস্‌জ্‌ একট 'বৈদ্যুতিক ফুলের টব'ও উদ্ভাবন করেছিলেন। এই টবের ফুল সাধারণ ফুলের চাইতে দীর্ঘক্ষণ সজীব থাকত।

পেনসিলভানিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ডক্টর ল্যারি মুর 'ক্ষুদে আবহাওয়া' সৃষ্টি করেছিলেন ল্যাবোরেটরীতে। দীর্ঘ বর্ষা এবং সংক্ষিপ্ত ঝড়বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে উনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ শক্তিক্ষেত্রে উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি বাড়ে। বলেছিলেন, ফলাফলটা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও সম্ভাবনাটা থেকে যাচ্ছে।

ডক্টর জর্জ স্টার হোয়াইট 'কসমো-ইলেকট্রিক কালচার' নামে একটা বই লিখে বলেছিলেন, দেখা গেছে ফলের গাছ থেকে চকচকে লোহা আর টিনের টুকরো ঝুলিয়ে দিলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে।

টম্যাটো গাছে বড়দিনের ধাতব বৃক্ষ-বর্তুল ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি পাকা টম্যাটো লাভ করেছিলেন নিউজার্সির জেনকিন টাউননিবাসী ইঞ্জিনীয়ার র‍্যানডাল গ্লোভ্‌স্‌ হে।

সাউথ ক্যারোলিনার একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্‌ লী স্ক্রিবনার বীজদের ইলেকট্রনিক স্নানের আয়োজন করে করেছিলেন। অ্যালুমুনিয়াম টবের সঙ্গে তড়িৎ-সংযোজন করে দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যে রেখেছিলেন ভিজে দস্তা আর তামার কুচি। এই টবে পোঁতা বাটার-বীন বিস্ময়করভাবে ২২ ফুট উচ্চতায় পেঁছেছিল—যার স্বাভাবিক উচ্চতা হয় মোটে দু-ফুট। এই থেকেই স্ক্রিবনারের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে ইলেকট্রনই ফটোসিনথেসিসের আগে উদ্ভিদ-কোষের ক্লোরাফিলকে চুম্বক-ধর্মে ধর্মিত করে—ফলে ফোটনের পক্ষে সূর্যশক্তিকে আহরণ করা সহজতর হয়। এই ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-ই উদ্ভিদের ক্লোরাফিল কোষের মধ্যে অক্সিজেনের অণুকে আকর্ষণ করে।

সোভিয়েত দেশেও যে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা বীজ সিঞ্চনের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা

হয়েছিল, তার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায় ১৯৬৩ সালে। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত। কিন্তু সাফল্য সত্ত্বেও পদ্ধতিটা খারিজ হয়ে যায় সম্ভবতঃ নীতিগত কারণে। কৃষি-শিল্প যেন কৃত্রিম সারের ওপরেই নির্ভর করে পুরোপুরি যা কীটপতঙ্গের উৎপাত থেকেও রক্ষা করবে শস্যকে। ইঞ্জিনীয়ারদের বৈদ্যুতিক চাষের স্বপ্ন তাই বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন এবং সংশয়াচ্ছন্ন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তরের কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ম্যাক্‌কিবেন এই নীতির সমালোচনা করে বলেছিলেন ১৯৬২ সালে, 'ইলেকট্রম্যাগনেটিক এনার্জিই তো জীব ও উদ্ভিদের যাবতীয় কলাতন্তু ও বস্তুর মূল উপাদান। কল্পনাতীত সাফল্য সম্ভব যদি বৈদ্যুতিক চাষ নিয়ে গবেষণা হয়।' তাঁর আবেদনে কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেন নি।

ম্যাক্‌কিবেনের আগেই অবশ্য উদ্ভিদের ওপর ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-য়ের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক আনকোরা আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বেডফোর্ড কলেজের বটানী অধ্যাপক এল-জে অ্যানড্রুস মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উদ্ভিদ সাড়া দেয় কি ভাবে, তা নির্ণয় করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেললেন যে শেকড়রা চৌম্বক ক্ষেত্রে সাড়া দেয়। 'নেচার' পত্রিকায় এই সম্পর্কে একটা প্রবন্ধও লিখলেন (ম্যাগনেটোট্রপিজ্‌ম্‌—এ নিউ প্ল্যাণ্ট গ্রোথ রেসপন্স)। প্রায় একই সঙ্গে ক্রিলভ এবং তারাকানোভা নামে দুই রাশিয়ান দেখলেন চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে রাখলে টম্যাটো যতটা বাড়ে, ততটা বাড়ে না উত্তর মেরুর কাছে রাখলে। কারণটা কিন্তু দুজনেই ধরতে পারেন নি।

কানাডার লেথব্রিজস্থ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ডক্টর পিটম্যানের গবেষণার প্রকাশ পেল, নর্থ আমেরিকার যাবতীয় উদ্ভিদের শেকড় ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণে অবস্থান করে। ভ্রূণ প্রান্ত এবং দীর্ঘ অক্ষকে উত্তর মেরু কেন্দ্রমুখী করলে অঙ্কুরিত হওয়ায় বেগ বৃদ্ধি পায়।

কলোরাডোর ডেনভারস্থিত ইঞ্জিনীয়ার ডক্টর লেন কক্সও বৈদ্যুতিক চাষ সম্পর্কে আগ্রহী হন। চুম্বক-চূর্ণ বিবিধ খনিজের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি গাজর প্রভৃতির বৃদ্ধি দ্বিগুণ করে তোলেন। উৎসাহিত হয়ে ১৯৭০ সালে 'ইলেকট্রোকালচার কর্পোরেশনও সংগঠিত করেন। ক্রেতারা এসে বলে গেছিল, বৈদ্যুতিক চাষের ফলে দ্বিগুণ উৎপাদনই শুধু ঘটেনি, উৎপাদিত সব্জীর স্বাদও উৎকৃষ্ট হয়েছে। লেমস্ট্রম এবং স্যার অলিভার লজের গবেষণা সমর্থিত হল এইভাবে।

১৯২০র প্রারম্ভে জর্জ ল্যাকোর্ভাস্কি নাকে এক ইঞ্জিনীয়ার প্যারিসে বসবাসকালে বেশ কয়েকটা বই লেখেন। এঁর জন্ম রাশিয়ায়। ইনি লেখেন যে প্রাণের মূল বস্তু নয়—অবস্তু—কম্পনের সঙ্গে প্রাণ জিনিসটা সম্পর্কিত। সমস্ত সজীব

বস্তুই বিকিরণ নিক্ষেপ করে চলেছে। তরঙ্গ প্রেরক এবং গ্রাহক বেতার যন্ত্রের মতই প্রতিটা সজীব কোষ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক র‍্যাডিয়েটর। থিওরীটা সত্যিই বিপ্লবাত্মক।

এই থিওরী অনুযায়ী প্রতিটা সজীব কোষের কেন্দ্রন ইলেকট্রিক্যাল সার-কিটের অনুরূপ। দুটি প্রান্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জের ক্রমান্বয়ে দোলনের ফলে একটা চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে চলেছে। দোলনের ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে। সুস্থ কোষের বিকিরণের সাথে অণু-আক্রান্ত অসুস্থ কোষের বিকিরণের লড়াই লাগে। সুস্থ কোষের দোলন তখন বৃদ্ধি পায়—দোলন স্তব্ধ হলে কোষের মৃত্যু ঘটে। উপযুক্ত ফ্রিকোয়েন্সির বিকিরণ দিয়ে তাই ব্যাধির প্রতিকার সম্ভব। এসব কথা ল্যাকোভস্কি লিখে গেছেন তাঁর ১৯২৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে (লা সিক্রেট দ্য লা ভাই)।

১৯২৩ সালে একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণ করেন ল্যাকোভস্কি। অ্যাপারেটাস-টার নাম রেডিও-সেলুলো অজিলেটর। ক্যানসার সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদের গায়ে ফুঁড়ে দিয়ে ইনি টিউমার সৃষ্টি করেন এবং তাঁর অ্যাপারেটাসের বিকিরণ দ্বারা সেই টিউমার নিরাময় করেন।

ফলাফলটা কিন্তু ল্যাকোভস্কির তত্ত্বের সমর্থক। সুস্থ কোষের স্বাভাবিক দোলন বৃদ্ধি ঘটিয়ে তিনি ক্যানসার নিরাময় করলেন—যা কিনা রেডিয়াম বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। এঁরা বাইরের বিকিরণ দিয়ে ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করার পক্ষপাতী।

এই তত্ত্বের উন্নতিবিধান করতে গিয়ে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ল্যাকোভস্কি। কোষের সুস্থ দোলনের এনার্জিটার উৎস কোথায়? ইলেকট্রিক ব্যাটারী বা স্টীম ইঞ্জিনের মত এনার্জি ভেতর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে, এ তিনি মানতে পারলেন না। এনার্জিটা তাহলে আসছে বাইরে থেকে, অর্থাৎ মহা-জাগতিক বিকিরণ থেকে।

নতুন সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি নতুন এক্সপেরিমেন্ট করলেন—কৃত্রিম বিকিরণের যন্ত্র বরবাদ করলেন। ক্যানসার কোষ সমন্বিত উদ্ভিদ ঘিরে রাখলেন তামার তার দিয়ে। কয়েক হপ্তা পরে দেখলেন, ক্যানসার কোষ মিলিয়ে গেছে। ক্যানসার কোষ সমন্বিত যে উদ্ভিদের তামার তার দিয়ে ঘেরেন নি, তারা কিন্তু শুকিয়ে মারা গেছিল এই সময়ের মধ্যেই।

মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ থেকে সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গটিকে বেছে নিল কি করে অসুস্থ উদ্ভিদরা? এই সমস্যা নিয়ে এবার পড়লেন ল্যাকোভস্কি।

সব রকম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং ফ্রিকোয়েন্সির মহাজাগতিক বিকিরণসমূহের নাম দিলেন 'ইউনিভার্সন'। বললেন, তামার তারের মধ্যে দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে এসে

সঠিক তরঙ্গটি অসুস্থ কোষের বিকিরণকে খারিজ করে দিয়ে সুস্থ কোষের বিকিরণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্‌রা শূন্যস্থানের সম্পূর্ণ বায়ুহীনতাকে ইথার বলেছিলেন। ল্যাকোভস্কি বললেন, ইথার বস্তুহীনতা নয়—মহাজাগতিক রশ্মি-সমূহের মিলন স্থান। সর্ব পরিব্যাপ্ত এই ইউনিভার্সনের মধ্যে বস্তু রূপান্তরিত হয়ে বৈদ্যুতিক কণিকায় পর্যবসিত হচ্ছে।

ল্যাকোভস্কি বিশ্বাস করতেন, তাঁর এই নতুন ধারণা গৃহীত হলে তৎকালীন জটিলতম প্রাণ-প্রহেলিকার সমাধান ঘটবে—সেই সঙ্গে বোঝা যাবে টেলিপ্যাথি কি জিনিস, চিন্তা প্রক্ষেপণ সম্ভব কিনা এবং উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের বার্তা বিনিময়ের সম্ভাবনা।

১৯২৭য়ের মার্চে পত্রাকারে ল্যাকোভস্কি একটা রিপোর্ট পেশ করলেন ফরাসী আকাদমীতে সুবিখ্যাত জীব-পদার্থবিদ্‌ এবং ডায়াথার্মির* আবিষ্কর্তা প্রফেসর দ্য-আর্সোনভাল মারফৎ। প্রবন্ধটার নাম 'সজীবকোষের দোলনের ওপর আকাশিক তরঙ্গের প্রভাব'।

ল্যাকোভস্কি এক্সপেরিমেণ্টগুলো করেছিলেন জেরানিয়াম ফুলের গাছ নিয়ে। ১৯২৮য়ের মার্চে এই গাছগুলো তামার তার পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাড়ে চারফুটের মত অস্বাভাবিক উচ্চতায় বৃদ্ধি পেল, এমন কি শীতকালেও ফুলে ফুলে ছেয়ে রইল। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর এই সাফল্য দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন মানুষের চিকিৎসায় আবিষ্কারটার প্রয়োগ ঘটালে নতুন ধরনের নিরাময়-পন্থা উদ্ভাবিত হবে। তাই তিনি একটা উন্নত মানের সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করলেন—মাল্টি-ওয়েভ অসিলেটর। রেডিয়াম দহন, গলগণ্ড এবং বিবিধ ব্যাধি জনিত ক্যানসার-বৃদ্ধি ও যা দুরারোগ্য বলেই জানা ছিল—উনি কিন্তু তাঁর এই যন্ত্রের দৌলতে দুরারোগ্য এই বর্কট-বৃদ্ধি ও ঘা চমৎকারভাবে নিরাময় করলেন ফ্রেঞ্চ, সুইডিস এবং ইটালিয়ান ক্লিনিকে। নাৎসী-বিরোধী ছিলেন ল্যাকোভস্কি। তাই ১৯৪১ সালে চলে এলেন নিউইয়র্কে। নিউইয়র্ক হসপিট্যালের ফিজিও-থেরাপি ডিপার্টমেণ্টে তাঁর যন্ত্র দিয়ে আরোগ্য করা হ'ল আরথ্রাইটিস, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি বহু ব্যাধি। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৩ সালে। এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু রেডিও-বায়োলজির ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন তিনি। চিকিৎসক মহল কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং আজকে তাঁর মাল্টি-ওয়েভ অসিলেটরকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিষিদ্ধ করেছে চিকিৎসাক্ষেত্রে।

---

* হাই-ফ্রিকোয়েন্সির বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা শরীরের কলাতন্তু উত্তপ্ত করে যে চিকিৎসা, তার নাম ডায়াথার্মি।

ল্যাকোভস্কি যখন প্যারিসে গবেষণানিরত, তখন প্রফেসর লাণ্ডের নেতৃত্বে টেক্সাস স্টেট ইউভার্সিটির একদল গবেষক উদ্ভিদের প্রচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপে প্রয়াসী হন। দশ বছর ব্যাপী পর-পর এক্সপেরিমেণ্ট অনুষ্ঠিত করে লাণ্ড দেখিয়ে দিয়েছিলেন, উদ্ভিদ-কোষ বৈদ্যুতিক শক্তিক্ষেত্র, তড়িৎপ্রবাহ অথবা আবেগ বা তাড়না উৎপাদনে সক্ষম—জগদীশ বোস যাকে বলেছিলেন 'স্নায়ুতন্ত্র'। হাতেনাতে পরীক্ষা করে লাণ্ড দেখিয়েছিলেন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি হরমোন বা 'অক্সিনে'র জন্যে হয় না—বৃদ্ধির সূচনা করে বৈদ্যুতিক স্নায়ুতন্ত্র। বৃদ্ধি যেখানে ঘটছে বলে জানা গেছে, বৈদ্যুতিক শক্তিক্ষেত্র সেখানে অক্সিজেনকে তলব করে পাঠিয়ে দেয়। 'বায়োইলেকট্রিক ফিল্ডস্ অ্যাণ্ড গ্রোথ' শীর্ষক প্রায়-অজ্ঞাত অথচ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে লাণ্ড পরিবেশন করেছেন এইসব চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

মেসমার যখন 'এনিম্যাল ম্যাগনেটিজম্' নিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ করেন, অথবা রাইকেনবাক 'অডিক ফোর্স'-য়ের কথা বলেন, তখন বিকিরণ নির্ণয় করার কোনো ভাল পন্থা জানা ছিল না অধিকাংশ চিকিৎসকের। তাই সজীব কলাতন্তু যে শক্তি-কম্পন নির্গত করতে বা তাতে সাড়া দিতে পারে, এই ধারণা অবিশ্বাসের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছিল। একই দুর্দৈব ঘটেছিল ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা-সার্জন জর্জ ওয়াশিংটন ক্রিলের ক্ষেত্রে। ইনি ১৯৩৬ সালে 'ফেনোমেনা অফ লাইফ ঃ এ রেডিও-ইলেকট্রিক্যাল ইণ্টারপ্রিটেশন' নামে বইটা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত করে ক্রিল বলেছিলেন, সজীব প্রাণী বা উদ্ভিদ বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি, সঞ্চয় এবং ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। প্রোটোপ্লাজমের অতি-আণুবীক্ষণিক এ-হেন একক বা চুল্লীকে ক্রিল বলেছিলেন 'রেডিওজেন'। কংগ্রেস অফ দ্য আমেরিকান কলেজ অফ সার্জন্স-য়ের অধিবেশনে ক্রিল বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ব্যাধি প্রকট হওয়ার আগেই তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। তাঁকে কিন্তু উপহাস করা করা হয়েছিল।

সজীব কোষের ওপর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জির প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছিল টাইম-ল্যাপ্স ফটোগ্রাফির ম্যাজিকে। উদ্ভিদ বাড়ে খুব ধীরে। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের ব্যবধানে না লক্ষ্য করলে এই বৃদ্ধি অনুধাবন করা যায় না। ১৯২৭ সালে ইলিনয়ের এক তরুণ একটা আপেল গাছের মুকুলের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা ভাবলেন, নিয়মিত ব্যবধানে ছবি তুললেই তো কুঁড়ি ফোটার দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখা যাবে।

জন ন্যাশ অট্-য়র কর্মজীবন শুরু হল এইভাবে। টাইম-ল্যাপ্স ফটোগ্রাফির পথিকৃৎ ইনি। এঁর দৌলতেই আজ উদ্ভিদ-রাজ্যের বহু প্রহেলিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে।

উদ্ভিদের অসদাচরণ সংক্রান্ত জৈবিক কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে বহু গবেষকের সঙ্গে আলোচনা করেন ইনি। একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন। উদ্ভিদরা আলোক আর উত্তাপের প্রতিই কেবল নিরতিশয় সংবেদনশীল নয়, টি-ভি, এক্স-রে আর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রতিও বটে।

অট্-য়ের আবিষ্কার উদ্ভিদ-জগতের অনেক রহস্য সমাধানের পথ প্রশস্ত করেছে। মধ্য আফ্রিকার উদ্ভিদরা কেন এত প্রকাণ্ড হয়, তাও জানা যাচ্ছে।

বছর তিরিশ আগে ইংরেজ লেখক প্যাট্রিক সিঞ্জ 'প্ল্যাণ্টস উইথ পারসোনালিটি' নামে একটা বই লেখেন। উদ্ভিদদের দানবতার উৎস কি, সে সম্বন্ধে সন্তোষজনক তত্ত্ব কেউ উপস্থাপিত করতে না পারলেও আন্দাজ করা যেতে পারে যে অদ্ভুত আবহাওয়া, নিরবচ্ছিন্ন অতি-আর্দ্রতা এবং আলট্রা-ভায়োলেট তীব্রতা-সহ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা আর নিরক্ষীয় অবস্থান এর মূলে রয়েছে।

ইউরোপীয় আল্পস বনভূমিতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে গাছপালা হয় বামনাকৃতি, কিন্তু আফ্রিকার চাঁদের পাহাড়ে গুল্ম-ও হয় মহীরুহসম।

কেনিয়া-উগাণ্ডা সীমান্তে মরা আগ্নেয়গিরি মাউণ্ট এলগন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪ হাজার ফুট উঁচু। এখানে নীলফুলের গাছ লোবেলিয়া হয় তিরিশ ফুট উঁচু—যে-গাছ ইংলণ্ডে জন্মায় বামনাকারে। তুষার-ছাওয়া লোবেলিয়ার ফটো তোলেন সিঞ্জ। ইংলণ্ডের মাটিতে একই গাছ রোপণ করার পর দেখা গেল শীতের মনোরম আবহাওয়াতেও বাঁচল না।

ফরাসী রসায়নবিদ বার্থেলটের অনুমিতির সঙ্গে মিলে গেল সিঞ্জের ধারণা। বার্থেলট বলেছিলেন, আল্পস অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে তড়িৎপ্রবাহের উপস্থিতির জন্যেই গাছপালা সেখানে এত নিবিড়—মাটি অনুর্বর থাকা সত্ত্বেও। সিঞ্জ বর্ণিত পরিবেশ যদি গবেষকরা বানিয়ে নিতে পারেন, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাতেও দানববৃক্ষ উৎপাদন সম্ভব হবে।

টাইম-ল্যাপ্স ফটোগ্রাফি নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে অট্ আর একটা আবিষ্কার করে বসলেন। উনি দেখলেন ফটোসিনথেসিসের আলোকের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মৌলিক প্রতিক্রিয়া আছে। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তো সবুজ উদ্ভিদ আলোককে কেমিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তরিত করছে এবং অজৈব যৌগ পদার্থ থেকে জৈব যৌগ পদার্থ সংশ্লেষ করে নিচ্ছে, কার্বন ডায় অক্সাইড আর জলকে কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তর করে অক্সিজেন ত্যাগ করছে। এই সমস্যার সমাধান-সংকল্প নিয়ে কয়েক মাস ধরে ইলোডিয়া ঘাসের কোষমধ্যস্থ প্রবহমান প্রোটোপ্লাজমের আণুবীক্ষণিক ফটো তোলেন ইনি। ফটোসিনথেসিসের মূল প্রতিনিধির নাম ক্লোরোপ্লাস্ট—যার মধ্যে থাকে ক্লোরোফিল। সূর্যের আলোয় মেলে ধরলে এই ক্লোরোপ্লাস্টরা স্রোতাকারে এসে পরিচ্ছন্নভাবে নিজেদের সাজিয়ে

নেয় কোষের কিনারা ঘিরে। কিন্তু সূর্যালোক থেকে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি পরিশ্রুত করে বার করে দিলে, সেই সূর্যালোকে ক্লোরোপ্লাস্টরা স্রোতের মধ্যে থেকে বেরিয়ে জড়সড় চলৎশক্তিহীন অবস্থায় এক কোণে ভিড় করে থাকে। দিনের শেষে ক্লোরোপ্লাস্টরা মন্থরগতি হয়ে স্তব্দ হয়ে যায়। কৃত্রিম আলোক উগ্রতর করলেও আর সক্রিয় হয় না। কিন্তু পরের দিন তপনদেব দিগন্ত ছাড়িয়ে এলেই ফের স্রোতাকারে পরিভ্রমণ শুরু হয়।

অট্ তখন উপলব্ধি করলেন, ফটোকেমিস্ট্রির এ-হেন মূল সূত্রকে যদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বর্ণ-চিকিৎসার মাধ্যমে আলোকের রকমারি ফ্রিকোয়েন্সি মারফৎ মানবদেহের সুস্থতা আনয়ন সম্ভব—ঠিক যে ভাবে ওষুধ দিয়ে স্নায়ু আর মনের রোগ সারানো যায়—সেইভাবে।

১৯৬৪ সালে 'টাইম' ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ পড়ে উদ্ভিদ এবং মানুষের ওপর টি-ভি বিকিরণের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণায় হাত দেন অট্। পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীটি কিন্তু চিন্তাউন্মেষক। তিরিশটি ছেলেমেয়ের একনাগাড়ে ক্লান্তি, স্নায়ুদুর্বলতা, মাথা ধরা, নিদ্রাহীনতা এবং বমির কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে মার্কিন বিমান বাহিনীর দুজন চিকিৎসক যে ভাবেই হোক জেনেছিলেন তিরিশটি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকেই টেলিভিশন দেখে। কেউ কেউ দেখে ছুটির দিনে বারো ঘণ্টা থেকে বিশ ঘণ্টা, অন্যরা অন্য দিন দেখে তিন থেকে ছ-ঘণ্টা। ডাক্তাররা অবশ্য এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে টেলিভিশনের সামনে অনেকক্ষণ অলসভাবে বসে থাকাটাই রোগভোগের কারণ। অটের কিন্তু খটকা লেগেছিল। এনার্জি স্পেকট্রামের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির পরপারে কোনো ধরনের বিকিরণ এর মূলে নেই তো? বিশেষ করে রঞ্জন-রশ্মি?

ধারণাটা পরখ করার জন্যে একটা রঙিন টেলিভিশনের পিকচার-টিউবের আধখানা সিসের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল—বাকী আধখানা ভারি কালো ফটোগ্রাফিক কাগজ দিয়ে। সিসের চাদর রঞ্জন-রশ্মি আটকায়, ফটোগ্রাফিক কাগজ আটকায় দৃশ্যগ্রাহ্য এবং আলট্রা-ভায়োলেট আলো—আসতে দেয় অন্যান্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সিকে।

অট্ তিন থাকে একজোড়া করে বরবটি অংকুর রাখলেন সিসের চাদরের সামনে—অনুরূপ তিনজোড়া রাখলেন ফটোগ্রাফিক কাগজের সামনে। আরও ছ-টা টব রাখলেন গ্রীনহাউসে রাখা টেলিভিশন থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে—বাইরে।

তিন হপ্তা পরে দেখা গেল, সিসের চাদরের সামনে রাখা এবং পঞ্চাশ ফুট দূরে রাখা বরবটি অংকুরিত হয়েছে ছ-ইঞ্চি উচ্চতায়। কিন্তু ফটোগ্রাফিক কাগজের সামনে রাখা বরবটি অংকুর আঙুরলতার মত বিকৃত আকার ধারণ করেছে। কয়েকটার শেকড় অস্বাভাবিকভাবে মাটি ছেড়ে ওপর দিকে ছিটক

গেছে। টিভি বিকিরণ যদি এইভাবে রাক্ষুসে-উদ্ভিদ বানাতে সক্ষম হয়, ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তার প্রভাবটা কি হওয়া উচিত ?

কয়েক বছর পরে মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনা করার সময়ে অট্ জানতে পারেন, মহাকাশে জৈবাধারে রক্ষিত বরবটিও বিকৃত হয়েছে একইভাবে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ভারশূন্য অবস্থায় থাকার দরুন এমনটা হয়েছে। অটের ধারণা কিন্তু তা নয়। অজ্ঞাত মহাজগতিক বিকিরণের জন্যেই নাকি বিকৃত চেহারা নিয়েছে বরবটির শেকড়।

যেহেতু বিকিরণ নামছে সরাসরি মাথার ওপর দিক থেকে, অটের বিশ্বাস শেকড় পালায় মাটির তলায় বিকিরণের খপ্পর থেকে পরিত্রাণের আশায়।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের অতি-সক্রিয়তা বা অলসতা দূরীকরণের জন্য ডাক্তাররা 'শান্তি-বটিকা' খাওয়ান। অটের ধারণা টিভি বিকিরণের জন্যই এই সব অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে।

আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলোক কেন্দ্রীভূত করে জৈব ব্যবস্থাকে অতি-উদ্দীপ্ত করা সম্ভব, ঠিক সেই ভাবেই নাকি টিভি টিউবের মধ্যে দিয়ে বিশেষ এনার্জি বিকিরণ শরীরের ক্ষতিসাধন করছে বলে অটের বিশ্বাস। তফাৎ শুধু এক জায়গায়—আতস কাঁচ আলোককে একদিকে কেন্দ্রীভূত করে, টিভি বিকিরণ সবদিকে অবাধে ছুটে যায়।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ উদ্ভিদ-প্রাণীর ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, অটের এই বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল হলিউডে প্যারামাউণ্ট পিকচার্স প্রযোজিত একটি ছায়া ছবিতে টাইম-ল্যাপ্স পদ্ধতি দিয়ে ফুল ফোটানোর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার সময়ে। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি ক্ষমতাবলে নায়িকা গান গেয়ে ফুল ফোটাচ্ছে—এই দৃশ্য গ্রহণে সহায়তা করেন অট্। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করতে হবে বলে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির শরণ নিয়েছিলেন অট্ এবং উপকৃত হয়েছিলেন। ভালোভাবে বেড়েছিল সব কটা ফুল। আলট্রা ভায়োলেট সমন্বিত ফ্লোরেসেণ্ট টিউবটি কিন্তু টিভি সেট বা এক্স রে মেশিনের ক্যাথোড গানের অনুরূপ সূত্র অনুসারে নির্মিত বলে সন্দেহ হয় অটের। পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে, এই দুই ক্ষেত্রেই ভোল্টেজ এত কম যে ক্ষতিকারক বিকিরণ সম্ভব হয় না। পাঠ্যপুস্তকে নিশ্চয় ভুল লেখা আছে এই সন্দেহ নিয়ে কুড়িটা ক্যাথোড গান তিনি পর পর সাজিয়ে সামনে রাখেন অনেকগুলি বরবটি চারা। ক্যাথোডের নিকটস্থ চারাগুলো বামনাকৃতি নেয়—প্রান্তস্থিত চারাগুলো স্বাভাবিক থাকে। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সমন্বিত ফ্লেরেসেন্ট টিউবের ক্ষেত্রে মাঝের ফুলগুলো প্রান্তের ফুলের চেয়ে কিন্তু ভাল বেড়েছিল।

এরপরেই অট্ নতুন সমস্যা নিয়ে পড়লেন। আলোক-ফ্রিকোয়েন্সি কি

ক্যানসারজনিত বৃদ্ধির ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ?

সম্ভাবনাটার প্রথম সূত্র লাভ করেন নিউইয়র্ক নিবাসী একজন ক্যানসার গবেষকের নিদান শুনে। ইনি পনেরোজন ক্যানসার রুগীকে চশমা খুলে রেখে যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক আলোয় থাকতে বলেছিলেন—কৃত্রিম আলো, এমন কি টেলিভিশনের সামনেও বসা চলবে না। গ্রীষ্ম অবসানে চোদ্দজন একবাক্যে বলেছিল তাদের টিউমার আর বাড়ে নি।

ইতিমধ্যে ফ্লোরিডার এক শীর্ষস্থানীয় চক্ষু বিশেষজ্ঞর কৌতূহল জাগ্রত করে ফেলেছিলেন অট্। চোখের রেটিনার ঠিক তলায় একটা কোষস্তরের সঙ্গে দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু স্নায়ুউত্তেজনাহারক ওষুধের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এই কোষস্তরে। অট্‌কে তিনি অনুরোধ করলেন টাইম-ল্যাপ্স ফটোগ্রাফি দিয়ে এখানে ওষুধের কোনো বিষক্রিয়া হয় কিনা তা লক্ষ্য করার জন্যে। বিশেষ উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় অট্ দেখলেন, নীল আলোয় রেটিনা-কোষের রঞ্জকে অস্বাভাবিক সক্রিয়তা লক্ষিত হয়, লাল আলোয় কোষ-প্রাচীর চৌচির হয়ে যায়। আরও দেখলেন একটানা সমান তাপমাত্রায় কোষকে আহার্য দিলে কোষ বিভাজন শুরু হয় না, কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় আহার্য জোগালে ষোল ঘণ্টার মধ্যেই কোষ বিভাজন শুরু হয়ে যায়।

আরও দেখা গেল, সূর্যাস্তের ঠিক আগেই কোষমধ্যস্থ রঞ্জক-দানার সক্রিয়তা হ্রাস পায়, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে পরের দিন সকালে। অটের তখন মনে পড়েছিল ইলোডিয়া ঘাসে ক্লোরোপ্লাস্টের অনুরূপ কার্যাবলী। সম্ভবতঃ উদ্ভিদ আর প্রাণীর মূল কার্যধারায় আরও সাদৃশ্য আছে—আজও যা মানুষ কল্পনাও করে উঠতে পারেনি।

অট্ তখন বলেছিলেন, সূর্যালোকেই বসুমতীর যাবতীয় প্রাণের বিকাশ। সূর্যালোকের আলোক-বর্ণালীর সঙ্গে একই 'সুরে' নিশ্চয় বাঁধা আছে ক্লোরো-প্লাস্ট আর রেটিনার রঞ্জক-দানা। বলেছিলেন, 'উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে ফটোসিন-থেসিস আলোক-শক্তিকে গাছবৃদ্ধির মূল কারণে রূপান্তরিত করে, উদ্ভিদ-জীবনের বাইরেও এর কার্যকারিতা আছে দেখা যাচ্ছে—প্রাণী-জীবনের বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও হরমোন বা কেমিক্যাল সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ মারফৎ এর একটা ভূমিকা রয়েছে।'

কোষ-আচরণ আরও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে অট্ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ব্যাধির সূচনায় অপুষ্টি বা অতিপুষ্টি যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ আলোক এবং বিকিরণের অব্যবস্থা।

১৯৭০ সালে মার্কিন দেশের এক বিজ্ঞান প্রগতির অধিবেশনে ডক্টর মেরণ অটের গবেষণাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। উদ্ভিদ আর প্রাণীর ওপর বিকিরণের

দেহজ প্রতিক্রিয়া মেনে নিয়েছিলেন। উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কলকারখানায়, অফিস-বাড়ী-স্কুল-দোকানঘরে ফ্লোরেসেণ্ট লাইটের ঢালাও ব্যবহারে। অট্ তো এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন বরবটির ওপর এই আলোর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া। মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনাটা কেউ ভেবেছে?

১৯৬০য়ের শেষাংশে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস। কৃতিত্বদান করা হয় অট্‌কে। ইলেকট্রনিক বস্তুসমূহের বিকিরণ থেকে পরিত্রাণের পথ তো তিনিই দেখিয়েছেন। অট্ কিন্তু কৃতিত্বদান করেন উদ্ভিদদের—আলোর পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

অটের স্বীকৃতি লাভের পর গ্যালভানি এবং মেসমারের ধারণাকে এখন সবাই সমর্থন করেন। এঁরা দুজনেই বলেছিলেন, সমস্ত সজীব বস্তুর মধ্যেই বৈদ্যুতিক বা চুম্বক ধর্ম অছে। বৈদ্যুতিক চাষের প্রবক্তারাও এখন আর অবহেলিত নন।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির দার্শনিক অধ্যাপক নরথ্রোপ এবং শারীরবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্যাক্সটন বার্ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, প্রাণ-পদ্ধতির মূল সংগঠক হ'ল বৈদ্যুতিক শক্তিক্ষেত্র। ছ-মাস অন্তর মানবদেহের কোষ নতুন করে সৃষ্ট হয়ে চলেছে—কিন্তু সঠিক অবস্থান সঠিকই থেকে যাচ্ছে।

তত্ত্বের সমর্থনে প্রাণীদেহ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে জরায়ুর মধ্যে ডিম্ব কখন আসছে, তার সঠিক মুহূর্ত চুলচেরাভাবে পরিমাপ করার পন্থা আবিষ্কার করেন ডক্টর ল্যাঙম্যান।

বার্ সাহেব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখলেন, বীজের মধ্যে একটা জিন্-ও যদি পালটে যায়, বীজের চারধারের 'লাইফ-ফিল্ডে'র ভোল্টেজ প্যাটার্ন বিলক্ষণ পাল্টে যায়। তাঁর আর একটা আবিষ্কার চাষীদের কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। বীজের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় ভাবী-উদ্ভিদটি কতটা স্বাস্থ্যবান এবং বলিষ্ঠ হবে।

সজীব বস্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সহনশীল হয়েও সবচেয়ে কম নড়াচড়ার ক্ষমতা রাখে উদ্ভিদরা। তাই ইয়েল চত্বরে এবং কানেকটিকাটের গবেষণাগারে গাছেদের লাইফ-ফিল্ডের চার্ট প্রণয়ণ করেন বার্ সাহেব। লক্ষ্য করলেন, চান্দ্র-চক্র এবং সূর্যকলঙ্কের সাথে লাইফ-ফিল্ড সম্পর্কিত তো বটেই, প্রতি তিনমাস এবং ছ-মাস একই চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অব্যাখ্যাতভাবে। চন্দ্রকলা অনুসারে শস্য রোপণের দীর্ঘ-উপহাসিত ধারণার সমর্থন কিন্তু বার্‌সাহেবের এই পর্যবেক্ষণ।

এঁর এক ছাত্র লিওনার্ড র‍্যাভিজ পরে মনঃসমীক্ষক হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে বার-প্রবর্তিত পন্থায় সম্মোহনের পরিমাপ করেছিলেন ইনি। তাঁর বিস্ময়কর

সিদ্ধান্তটা এই ঃ সব মানুষই বেশীর ভাগ সময়, এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছে।

মানুষের লাইফ ফিল্ডের একটানা চার্ট এঁকে দেখা গেছে ভোল্টেজের উত্থান পতনের সঙ্গে তা মিলে যায় ; ভাল থাকলে শীর্ষদেশ, খারাপ থাকলে উপত্যকা। অগ্রিম চার্ট এঁকে তাই কয়েক হপ্তা আগে থেকেই বলা যায় উত্থান এবং পতন কখন কখন ঘটবে। জৈব-ছন্দের তত্ত্ব হাজির করে বহুপূর্বেই কিন্তু ডক্টর উইলহেল্‌ম্‌ ফ্লাইয়েজ সিগমণ্ড ফ্রয়েডকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন আত্ম-সমীক্ষার ব্যাপারে।

সোভিয়েত দেশের স্টেট কমিটি ফর ইনভেনসন্স অ্যাণ্ড ডিসকভারিজ স্পেশ্যাল ডিপ্লোমা দান করে তিন গবেষককে তাঁদের একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ। এঁরা প্রমাণ করে দেন যে কোষগণ বিশেষ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রশ্মি আকারে পরস্পরের মধ্যে 'বার্তাবিনিময়' করতে পারে।

একই টিশু কালচার দুটো বদ্ধ আধারে রাখা হয়েছিল। মাঝে ছিল কাঁচের প্রাচীর। একটার মধ্যে মারাত্মক ভাইরাস ঢুকিয়ে কোষ-কলোনী মেরে ফেলা হয়। দ্বিতীয় কলোনীর মধ্যে কিন্তু তিলমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু যেই কাঁচের প্রাচীর তুলে নিয়ে তার জায়গায় কোয়ার্ট্‌জ্‌ প্রাচীর বসানো হ'ল এবং প্রথম কলোনীতে আবার মারাত্মক ভাইরাস প্রবেশ করানো হ'ল, বিস্মিত সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের চোখের সামনে দ্বিতীয় কলোনীর পরিণাম ঘটল প্রথম কলোনীর অনুরূপ। অথচ ভাইরাসের পক্ষে প্রতিবন্ধক ভেদ করে যাওয়া সম্ভব ছিল না কোন মতেই। আবার অনুষ্ঠিত হল এক্সপেরিমেণ্ট। এবার প্রথম কলোনীতে প্রবেশ করানো হ'ল রাসায়নিক বিষ অথবা মারাত্মক বিকিরণ—মারা গেল দুটো কলোনীই। প্রতিক্ষেত্রেই কে বধ করল দ্বিতীয় কলোনীকে ?

সাধারণ কাঁচ নিজের ভেতর দিয়ে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি যেতে দেয় না, কিন্তু কোয়ার্টজ্‌ কাঁচ যেতে দেয়। রহস্যের চাবিকাঠি এইখানেই খুঁজে পেলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মনে পড়ে গেল গারউইট্‌স্‌চ্‌ তত্ত্বগতভাবে বলেছিলেন পেঁয়াজ-কোষ আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি নির্গত করতে পারে। ফটোমাল্‌টিপ্লায়ারে পরিবর্ধিত একটি ইলেকট্রনিক চক্ষুর সাহায্যে তাঁরা চলমান টেপের ওপর এনার্জি-লেভেল নথিভুক্ত করলেন এবং দেখলেন টিশুকালচার যখন স্বাভাবিক, তখন মানব-চোখে অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট জ্যোতি স্থির থাকে ; সংক্রমণের সঙ্গে কলোনীর সংগ্রাম শুরু হলেই বিকিরণ তীব্রতর হয়।

মস্কো সংবাদপত্রে এই গবেষণা বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় এবং বলা হয় ফ্যানট্যাসটিক মনে হলেও সংক্রামিত কোষগণ-বিকিরিত আলট্রা-ভায়োলেট বিকিরণ তীব্রতর উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে 'সংবাদ বহন' করে নিয়ে যায় দ্বিতীয় কলোনীতে—

—ঠিক যেভাবে মর্সকোড মারফৎ ডট এবং ড্যাস দ্বারা শব্দ প্রেরিত হয়—সেই-রকম সংকেত পৌঁছোয় দ্বিতীয় কলোনীতে—সংকেত ভেঙে যেভাবেই হোক মানে করে নেয় দ্বিতীয় কলোনী।

দ্বিতীয় কলোনীর মৃত্যুর ধরন প্রতি ক্ষেত্রেই হয়েছিল হুবহু প্রথম কলোনীর মৃত্যুর অনুরূপ। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন মুমূর্ষু কোষের পাঠানো সংকেতের সান্নিধ্যে সুস্থ কোষ রাখা অতীব বিপজ্জনক। দ্বিতীয় কলোনী যেন মুমূর্ষু প্রথম কলোনীর হুঁশিয়ার সংকেত পেয়ে অনস্তিত্ব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নতুন ব্যূহসজ্জা করতে গিয়ে নিজেদের মারণ-পরিবেশ নিজেরাই গড়ে তুলল।

এইভাবেই গারউইট্‌স্‌চ্‌-য়ের চমকপ্রদ গবেষণা সমর্থন করল তাঁরই দেশের মানুষ পঞ্চাশ বছর পরে। একই সঙ্গে আর একজন অখ্যাত সহযোগীর কীর্তি-কলাপও স্বীকৃতি পেয়েছিল। এঁর নাম সীমন কিরলিয়ান। বার্‌ এবং র‍্যাভিজ নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন মানুষ এবং উদ্ভিদ বেষ্টিত ফোর্স ফিল্ডের। কিরলিয়ান ফিল্মের ওপর অত্যাশ্চর্য ছবি গ্রহণ করলেন এই ফোর্স ফিল্ডের।

উদ্ভিদ ও মানবদেহের জ্যোতির্বলয় রহস্য

১৯৫০ সাল। ক্রাসনোডার, রাশিয়া। সন্ধ্যা সমাগত।

ক্ষুদে গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছেন সীমন ডেভিডোভিচ কিরলিয়ান এবং তাঁর স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা। কিরলিয়ানের নেশা ফটোগ্রাফি, পেশায় কিন্তু ইলেক-ট্রিসিয়ান। নাৎসী আক্রমণের দু-বছর আগে এই সব যন্ত্রপাতি তিনি উদ্ভাবন করেন এবং লেন্স বা ক্যামেরা ব্যতিরেকে মানব চোখে অদৃশ্য সজীব বস্তু-প্রক্ষিপ্ত বিচিত্র দ্যুতির ফটোগ্রাফ নেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

টোকা পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকলেন এক আগন্তুক। মস্কো থেকে আসছেন তিনি। ব্রীফকেস খুলে বার করলেন ভিজে তুলোয় মোড়া একই রকমের দেখতে দুটি বৃক্ষপত্র। অদ্ভুত শক্তিধারায় ছবি তুলতে পারেন নাকি কেবল কিরলিয়ান দম্পতি। এই খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন তিনি। পাতা দুটো তুলে দিলেন কিরলিয়ান দম্পতির হাতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী।

সরকারী স্বীকৃতি লাভের আশায় উৎসাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পাতা দুটোর গা থেকে ছিটকে পড়া শক্তি ধারার ফটো তুললেন বটে কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না কিছুতেই। একটা পাতার শক্তি-বিচ্ছুরণের চমৎকার ছবি উঠলেও অন্যটার ক্ষেত্রে উঠল দুর্বল প্রতিচ্ছায়া। বারবার চেষ্টা করেও সাফল্য-লাভ ঘটল না।

শুকনো মুখে পরের দিন ছবিগুলো বৈজ্ঞানিককে দেখাতেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। কে বললে ব্যর্থ হয়েছেন কিরলিয়ান দম্পতি? ফটোর মারফৎ প্রমাণ করে দিয়েছেন একটি পাতা তোলা হয়েছে অসুস্থ গাছ থেকে, আর একটি সুস্থ গাছ থেকে। বাহ্যতঃ অসুস্থতা প্রকট না হলেও উদ্ভিদের এনার্জি ফিল্ডে তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে—ধরা পড়েছে ফটোয়!

উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষকে ঘিরে সব সময়ে একটা শক্তি-আবরণ রয়েছে, যা প্রোটোপ্লাজমতুল্য, পরমাণুর চাইতেও মিহি। অণু এবং পরমাণু দিয়ে গড়া নিরেট দেহকেও ভেদ করে পরিব্যাপ্ত রয়েছে এই আবরণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে সাধুসন্ত এবং দার্শনিকদের দিব্যচোখে তা দৃশ্যমান। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি-বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই জ্যোতির্বলয় প্রত্যক্ষ করেন—প্রাচীন পটে মুনিঋষীদের মাথা ঘিরে তা আঁকাও থাকে। কিরলিয়ান এই জ্যোতির্বলয়ের ফটো তুলেছিলেন ফিল্মের ওপর। যার ফটো তুলতে হবে, ফিল্ম অথবা প্লেটকে সরাসরি চেপে ধরেন তার ওপর। তারপর সেই বস্তুর মধ্যে দিয়ে চালনা করেন ইলেকট্রিক কারেন্ট। কারেন্ট আসে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি স্পার্ক-জেনারেটর থেকে সেকেন্ডে ৭৫,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ইলেকট্রিক্যাল পাল্স হিসাবে। জ্যোতির অথবা জ্যোতির অনুরূপ কিছু একটার ফটো তুলেছেন কিরলিয়ান এইভাবে।

দুই ইলেকট্রোডের মাঝে ফিল্মের মধ্যে গাছের পাতা চেপে ধরে যেন স্বপ্ন-লোকের দৃষ্টিবিভ্রমকে সম্ভব করে তুলেছিলেন কিরলিয়ান। ক্লেয়ারভয়ান্টরা বা অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া যে পুঁচকে তারকাধূলির মত আলোক বিন্দু ছাওয়া অতি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কেউ দেখতে পায়নি। বিস্ময়কর সেই মাইক্রো-ইউ-নির্ভাসকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। সাদা, নীল, এমন কি লাল, হলদে অগ্নিচ্ছটা ছবিতে ধরা পড়েছিল, পাতার মধ্যেকার যেন বহুসংখ্যক প্রণালীর ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে নির্গত হচ্ছে বিচিত্র লেলিহান আলোকচ্ছটা। পাতাটাকে বিকৃত করলে, পাতা ঘিরে এই ফোর্স-ফিল্ড বা নির্গমনসমূহও আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে আসে—যেন মৃত্যু ঘটছে বৃক্ষপত্রের। মাইক্রোসকোপ এবং অপ-টিক্যাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই আলোকময়তার পরিবর্ধনসাধনও ঘটিয়েছিলেন কিরলিয়ান দম্পতি। শক্তিরশ্মিসমূহ এবং ঘূর্ণায়মান অগ্নিবর্তুলসম আলোক-পুঞ্জ যেন উদ্ভিদের গা থেকে ছিটকে এসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে মহাশূন্যের দিকে।

বিবিধ 'অজীব' পদার্থ এমন কি ধাতুর মুদ্রার ছবিও তুলেছিলেন কিরলিয়ান-দ্বয়। দেখা গিয়েছিল, প্রতিটার দ্যুতির প্যাটার্ন বিভিন্ন। সবচেয়ে কৌতূহলো-দ্দীপক হল, দু-কোপেক মুদ্রার কিনারায় নিরবচ্ছিন্ন জ্যোতি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু মানুষের আঙুলের ডগা থেকে যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতো শক্তিধারা ভলকে ভলকে বিস্ফোরিত হচ্ছে—ঠিক যেন অতি-ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরিমালা সাজানো

—ঠিক যেভাবে মর্সকোড মারফৎ ডট এবং ড্যাস দ্বারা শব্দ প্রেরিত হয়—সেই-রকম সংকেত পৌঁছোয় দ্বিতীয় কলোনীতে—সংকেত ভেঙে যেভাবেই হোক মানে করে নেয় দ্বিতীয় কলোনী।

দ্বিতীয় কলোনীর মৃত্যুর ধরন প্রতি ক্ষেত্রেই হয়েছিল হুবহু প্রথম কলোনীর মৃত্যুর অনুরূপ। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন মুমূর্ষু কোষের পাঠানো সংকেতের সান্নিধ্যে সুস্থ কোষ রাখা অতীব বিপজ্জনক। দ্বিতীয় কলোনী যেন মুমূর্ষু প্রথম কলোনীর হুঁশিয়ার সংকেত পেয়ে অনস্তিত্ব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নতুন ব্যূহসজ্জা করতে গিয়ে নিজেদের মারণ-পরিবেশ নিজেরাই গড়ে তুলল।

এইভাবেই গারউইট্স্চ্-য়ের চমকপ্রদ গবেষণা সমর্থন করল তাঁরই দেশের মানুষ পঞ্চাশ বছর পরে। একই সঙ্গে আর একজন অখ্যাত সহযোগীর কীর্তি-কলাপও স্বীকৃতি পেয়েছিল। এঁর নাম সীমন কিরলিয়ান। বার্ এবং র‍্যাভিজ নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন মানুষ এবং উদ্ভিদ বেষ্টিত ফোর্স ফিল্ডের। কিরলিয়ান ফিল্মের ওপর অত্যাশ্চর্য ছবি গ্রহণ করলেন এই ফোর্স ফিল্ডের।

উদ্ভিদ ও মানবদেহের জ্যোতির্বলয় রহস্য

১৯৫০ সাল। ক্রাসনোডার, রাশিয়া। সন্ধ্যা সমাগত।

ক্ষুদে গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছেন সীমন ডেভিডোভিচ কিরলিয়ান এবং তাঁর স্ত্রী ভ্যালেণ্টিনা। কিরলিয়ানের নেশা ফটোগ্রাফি, পেশায় কিন্তু ইলেক-ট্রিসিয়ান। নাৎসী আক্রমণের দু-বছর আগে এই সব যন্ত্রপাতি তিনি উদ্ভাবন করেন এবং লেন্স বা ক্যামেরা ব্যতিরেকে মানব চোখে অদৃশ্য সজীব বস্তু-প্রক্ষিপ্ত বিচিত্র দ্যুতির ফটোগ্রাফ নেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

টোকা পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকলেন এক আগন্তুক। মস্কো থেকে আসছেন তিনি। ব্রীফকেস খুলে বার করলেন ভিজে তুলোয় মোড়া একই রকমের দেখতে দুটি বৃক্ষপত্র। অদ্ভুত শক্তিধারায় ছবি তুলতে পারেন নাকি কেবল কিরলিয়ান দম্পতি। এই খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন তিনি। পাতা দুটো তুলে দিলেন কিরলিয়ান দম্পতির হাতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী।

সরকারী স্বীকৃতি লাভের আশায় উৎসাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পাতা দুটোর গা থেকে ছিটকে পড়া শক্তি ধারার ফটো তুললেন বটে কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না কিছুতেই। একটা পাতার শক্তি-বিচ্ছুরণের চমৎকার ছবি উঠলেও অন্যটার ক্ষেত্রে উঠল দুর্বল প্রতিচ্ছায়া। বারবার চেষ্টা করেও সাফল্য-লাভ ঘটল না।

শুকনো মুখে পরের দিন ছবিগুলো বৈজ্ঞানিককে দেখাতেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। কে বললে ব্যর্থ হয়েছেন কিরলিয়ান দম্পতি? ফটোর মারফৎ প্রমাণ করে দিয়েছেন একটি পাতা তোলা হয়েছে অসুস্থ গাছ থেকে, আর একটি সুস্থ গাছ থেকে। বাহ্যতঃ অসুস্থতা প্রকট না হলেও উদ্ভিদের এনার্জি ফিল্ডে তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে—ধরা পড়েছে ফটোয়!

উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষকে ঘিরে সব সময়ে একটা শক্তি-আবরণ রয়েছে, যা প্রোটোপ্লাজমতুল্য, পরমাণুর চাইতেও মিহি। অণু এবং পরমাণু দিয়ে গড়া নিরেট দেহকেও ভেদ করে পরিব্যাপ্ত রয়েছে এই আবরণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে সাধুসন্ত এবং দার্শনিকদের দিব্যচোখে তা দৃশ্যমান। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি-বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই জ্যোতির্বলয় প্রত্যক্ষ করেন—প্রাচীন পটে মুনিঋষীদের মাথা ঘিরে তা আঁকাও থাকে। কিরলিয়ান এই জ্যোতির্বলয়ের ফটো তুলেছিলেন ফিল্মের ওপর। যার ফটো তুলতে হবে, ফিল্ম অথবা প্লেটকে সরাসরি চেপে ধরেন তার ওপর। তারপর সেই বস্তুর মধ্যে দিয়ে চালনা করেন ইলেকট্রিক কারেণ্ট। কারেণ্ট আসে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি স্পার্ক-জেনারেটর থেকে সেকেণ্ডে ৭৫,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ইলেকট্রিক্যাল পাল্স হিসাবে। জ্যোতির অথবা জ্যোতির অনুরূপ কিছু একটার ফটো তুলেছেন কিরলিয়ান এইভাবে।

দুই ইলেকট্রোডের মাঝে ফিল্মের মধ্যে গাছের পাতা চেপে ধরে যেন স্বপ্ন-লোকের দৃষ্টিবিভ্রমকে সম্ভব করে তুলেছিলেন কিরলিয়ান। ক্লেয়ারভয়াণ্টরা বা অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া যে পুঁচকে তারকাধূলির মত আলোক বিন্দু ছাওয়া অতি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কেউ দেখতে পায়নি। বিস্ময়কর সেই মাইক্রো-ইউ-নির্ভাসকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। সাদা, নীল, এমন কি লাল, হলদে অগ্নিচ্ছটা ছবিতে ধরা পড়েছিল, পাতার মধ্যেকার যেন বহুসংখ্যক প্রণালীর ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে নির্গত হচ্ছে বিচিত্র লেলিহান আলোকচ্ছটা। পাতাটাকে বিকৃত করলে, পাতা ঘিরে এই ফোর্স-ফিল্ড বা নির্গমনসমূহও আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে আসে—যেন মৃত্যু ঘটছে বৃক্ষপত্রের। মাইক্রোসকোপ এবং অপ-টিক্যাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই আলোকময়তার পরিবর্ধনসাধনও ঘটিয়েছিলেন কিরলিয়ান দম্পতি। শক্তিরশ্মিসমূহ এবং ঘূর্ণায়মান অগ্নিবর্তুলসম আলোক-পুঞ্জ যেন উদ্ভিদের গা থেকে ছিটকে এসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে মহাশূন্যের দিকে।

বিবিধ 'অজীব' পদার্থ এমন কি ধাতুর মুদ্রার ছবিও তুলেছিলেন কিরলিয়ান-দ্বয়। দেখা গিয়েছিল, প্রতিটার দ্যুতির প্যাটার্ন বিভিন্ন। সবচেয়ে কৌতূহলো-দ্দীপক হল, দু-কোপেক মুদ্রার কিনারায় নিরবচ্ছিন্ন জ্যোতি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু মানুষের আঙুলের ডগা থেকে যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতো শক্তিধারা ভলকে ভলকে বিস্ফোরিত হচ্ছে—ঠিক যেন অতি-ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরিমালা সাজানো

রয়েছে আঙুলের অগ্রভাগে।

মস্কো-অফিসারের কাছে কিরলিয়ান দম্পতি এই পরীক্ষা দেওয়ার পরেও দশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। খ্যাতি অর্জন করেছেন রাশিয়ায় তারপর।

১৯৬০ সালে সোভিয়েত জনশিক্ষা বিভাগের ডক্টর লেভ ফেডোরোভ গবেষণা-অনুদান প্রদান করেন কিরলিয়ানদের চিকিৎসা শাস্ত্রে আলোকচিত্র মাধ্যমে নতুন ধরনের নিদান-পদ্ধতির স্বীকৃতি স্বরূপ। এরপরেই দেহ রাখেন ফেডোরোভ। মস্কোর উৎসাহও আবার নিভু-নিভু হতে থাকে, মাথাচাড়া দেয় তাত্ত্বিক অবিশ্বাসীরা।

আগ্রহ ফিরে আসে নতুন করে একজন সাংবাদিক লেখনী চালনা করার পর। তীব্র ভর্ৎসনা করে লেখেন বেলোভ, 'ছিঃ, ছিঃ, কিরলিয়ানদের আবিষ্কারের পর পঁচিশটা বছর কেটে গেল, এখনো মন্ত্রণালয় থেকে 'অর্থ' বরাদ্দ হল না।'

ওষুধ ধরল। ১৯৬৬ সালে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে চিকিৎসা শাস্ত্রে 'জৈবশক্তি' আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা হল। 'ইলেকট্রোবায়োলুমিনেসেন্স' সম্পর্কে সোচ্চার হলেন মস্কোর এক বায়োফিজিসিস্ট।

সোভিয়েত আগ্রহ যখন ক্রমবর্ধমান, তার তিন চার বছর পরে মার্কিন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ঐ দেশেরই দুই সাংবাদিক। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'লৌহ যবনিকার অন্তরালে অতীন্দ্রিয় আবিষ্কার' শীর্ষক বইখানা টনক নড়িয়ে ছাড়ল উন্নাসিক মার্কিন বিজ্ঞানীদের। এঁরাই কিন্তু উইলহেলম রাইকের ১৯৩৯ সালের পরমাশ্চর্য আবিষ্কারকে জালিয়াতি বলেছিলেন। উদ্ভিদ আর মানুষের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করেছিলেন রাইক ঃ নাম দিয়েছিলেন অরগন।

কিরলিয়ানরা বলেছিলেন, দেহজ-অ-বৈদ্যুতিক ধর্ম বৈদ্যুতিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে ফিল্মে চালান হচ্ছে। রাশিয়ার প্রফেসর ভ্লাডিমির ইনিউর্সিচন আর এক ধাপ এগোলেন ; বললেন, কিরলিয়ান যে জৈবদ্যুতির ফটো তুলেছেন, তা প্রাণীদেহের বৈদ্যুতিক অবস্থার ফলে সৃষ্ট হচ্ছে না, হচ্ছে 'বায়োলজিক্যাল প্লাজমা বডি'র (জৈবিক প্লাজমা দেহ) জন্য। প্রাচীন ব্যক্তিরা একেই বলেছিলেন 'ইথিরিক' বা 'অ্যাসট্রাল' বডি (আকাশিক দেহ)।

অধুনা পদার্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী প্লাজমা হল গিয়ে একটা তাড়িৎ-নিরপেক্ষ নিবিড় আয়নায়িত-গ্যাস (ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, হাইলি আয়নাইজ্‌ড্ গ্যাস), যার মধ্যে আছে আয়ন, ইলেকট্রন এবং নিরপেক্ষ কণিকাসমূহ—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'পদার্থের চতুর্থ অবস্থা' (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থার পরের অবস্থা)। ১৯৪৪ সালে একজন রুশীয়, ভি-এস গ্রিসচেনকো, প্যারিস থেকে এই নামেই একটা বই প্রকাশ করেন। সেই বছরেই 'মাইটোজেনিক

রেডিয়েশনে'র আবিষ্কর্তা এ-জি গুরউইট্স্চ্ তাঁর বিশ বছরের সাধনা বই আকারে প্রকাশ করেন। বইটার নাম 'থিওরী অফ বায়োলজিক্যাল ফিল্ড'।

ইনিউসচিন যুক্তি দেখিয়ে বললেন, এই 'বায়োপ্লাজমিক' দেহই হল 'বায়োলজিক্যাল' ফিল্ডের মূল ভিত্তি। এর নিজস্ব গোলকধাঁধাসম গতিপ্রকৃতি আছে, যা রক্তমাংসের দেহের এনার্জি প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু 'বায়োপ্লাজমিক' দেহ ছন্নছাড়া নয়, নিজস্ব মেরুপ্রবণতা আছে এবং নিজস্ব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডও আছে।

লস এঞ্জেলস্স্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইন্সটিটিউটের প্রফেসর থেলমা মস্ আগে ছিলেন ব্রডওয়ের অভিনেত্রী। ইনিউসচিনের ল্যাবোরেটরীতে সর্বপ্রথম আমেরিকান হিসেবে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি দেখতে তিনি এলেন, কিন্তু মস্কো থেকে তাঁকে দেখবার অনুমতি দেওয়া হল না। ইনিউসচিন অবশ্য অনেক কথাই তাঁকে বলেছিলেন। মানবদেহের বিশেষ জায়গার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ ধরা পড়ে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফিতে—রোগ নিদানে যার প্রয়োজন হতে পারে। সবচেয়ে স্পষ্ট ফটো ওঠে বিকেল চারটের সময়ে—সবচেয়ে অস্পষ্ট মাঝরাতে। থেলমা মস্ খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছিলেন, পাশ্চাত্যের অকাল্ট সাহিত্যে যাকে বলা হয় জ্যোতির পুঞ্জ বা 'আকাশিক দেহ'—এ কি তাই? স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন ইনিউসচিন—'হ্যাঁ।'

নরদেহের প্রতিরূপ এই যে শক্তিদেহ, প্রাচীন দার্শনিক প্রাচ্যের মুনি এবং থিয়সফিষ্টরা যাকে বলেছেন আকাশিক দেহ, তা একটা ম্যাগনেটিক অঞ্চল; স্থূলদেহ এবং মহাজাগতিক শক্তিসমূহের মধ্যেকার সেতুবন্ধন—প্রাণের ধারা যার মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছোচ্ছে স্থূলদেহে। এই শক্তিদেহের মাধ্যমেই টেলিপ্যাথিক এবং ক্লেয়ারভয়্যান্ট প্রক্ষেপণ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন ধরেই এই শক্তিদেহকে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন।

মস্ যখন আলমা আটা-য় ইনিউসচিনের ল্যাবোরেটরীতে, ঠিক সেই সময়ে আর একজন আমেরিকান মস্কোয় ভিক্টর আডামেন্কোর ইণ্টারভিউ নিচ্ছিলেন। এই মার্কিন ভদ্রলোকটির নাম মণ্টেগু উলমান—নিউইয়র্ক সিটির একটি চিকিৎসা কেন্দ্রের ডিরেক্টর।

উলমানের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল একটা চমকপ্রদ সংবাদে। চুম্বকক্ষেত্রে 'বায়োপ্লাজমা' রাখলে ঝটিতি সরে সরে যায় এবং নরদেহের কয়েকশ পয়েণ্টে কেন্দ্রীভূত হয়—যে পয়েণ্টগুলির সঙ্গে মিলে যায় সুপ্রাচীন চৈনিক পদ্ধতি আকুপাংচার পয়েণ্ট।

হাজার হাজার বছর আগে নরচর্মের ওপর সাতশ পয়েণ্টের মানচিত্র রচনা করেছিলেন চীনদেশের মানুষ। এই পয়েণ্টগুলোর ওপর দিয়েই প্রাণশক্তি প্রবহমান

রয়েছে আঙুলের অগ্রভাগে।

মস্কো-অফিসারের কাছে কিরলিয়ান দম্পতি এই পরীক্ষা দেওয়ার পরেও দশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। খ্যাতি অর্জন করেছেন রাশিয়ায় তারপর।

১৯৬০ সালে সোভিয়েত জনশিক্ষা বিভাগের ডক্টর লেভ ফেডোরোভ গবেষণা-অনুদান প্রদান করেন কিরলিয়ানদের চিকিৎসা শাস্ত্রে আলোকচিত্র মাধ্যমে নতুন ধরনের নিদান-পদ্ধতির স্বীকৃতি স্বরূপ। এরপরেই দেহ রাখেন ফেডোরোভ। মস্কোর উৎসাহও আবার নিভু-নিভু হতে থাকে, মাথাচাড়া দেয় তাত্ত্বিক অবিশ্বাসীরা।

আগ্রহ ফিরে আসে নতুন করে একজন সাংবাদিক লেখনী চালনা করার পর। তীব্র ভর্ৎসনা করে লেখেন বেলোভ, 'ছিঃ, ছিঃ, কিরলিয়ানদের আবিষ্কারের পর পঁচিশটা বছর কেটে গেল, এখনো মন্ত্রণালয় থেকে 'অর্থ বরাদ্দ হল না।'

ওষুধ ধরল। ১৯৬৬ সালে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে চিকিৎসা শাস্ত্রে 'জৈবশক্তি' আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা হল। 'ইলেকট্রোবায়োলুমিনেসেন্স' সম্পর্কে সোচ্চার হলেন মস্কোর এক বায়োফিজিসিস্ট।

সোভিয়েত আগ্রহ যখন ক্রমবর্ধমান, তার তিন চার বছর পরে মার্কিন বিজ্ঞানী-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ঐ দেশেরই দুই সাংবাদিক। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'লৌহ যবনিকার অন্তরালে অতীন্দ্রিয় আবিষ্কার' শীর্ষক বইখানা টনক নড়িয়ে ছাড়ল উন্নাসিক মার্কিন বিজ্ঞানীদের। এঁরাই কিন্তু উইলহেলম রাইকের ১৯৩৯ সালের পরমাশ্চর্য আবিষ্কারকে জালিয়াতি বলেছিলেন। উদ্ভিদ আর মানুষের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করেছিলেন রাইক ঃ নাম দিয়েছিলেন অরগন।

কিরলিয়ানরা বলেছিলেন, দেহজ-অ-বৈদ্যুতিক ধর্ম বৈদ্যুতিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে ফিল্মে চালান হচ্ছে। রাশিয়ার প্রফেসর ভ্লাডিমির ইনিউসাচিন আর এক ধাপ এগোলেন ; বললেন, কিরলিয়ান যে জৈবদ্যুতির ফটো তুলেছেন, তা প্রাণীদেহের বৈদ্যুতিক অবস্থার ফলে সৃষ্ট হচ্ছে না, হচ্ছে 'বায়োলজিক্যাল প্লাজমা বডি'র (জৈবিক প্লাজমা দেহ) জন্য। প্রাচীন ব্যক্তিরা একেই বলেছিলেন 'ইথিরিক' বা 'অ্যাসট্রাল' বডি (আকাশিক দেহ)।

অধুনা পদার্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী প্লাজমা হল গিয়ে একটা তাড়িৎ-নিরপেক্ষ নিবিড় আয়নায়িত-গ্যাস (ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, হাইলি আয়নাইজ্‌ড্‌ গ্যাস), যার মধ্যে আছে আয়ন, ইলেকট্রন এবং নিরপেক্ষ কণিকাসমূহ—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'পদার্থের চতুর্থ অবস্থা' (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থার পরের অবস্থা)। ১৯৪৪ সালে একজন রুশীয়, ভি-এস গ্রিসচেনকো, প্যারিস থেকে এই নামেই একটা বই প্রকাশ করেন। সেই বছরেই 'মাইটোজেনিক

রেভিয়েশনে'র আবিষ্কর্তা এ-জি গ্যুরউইট্স্চ্ তাঁর বিশ বছরের সাধনা বই আকারে প্রকাশ করেন। বইটার নাম 'থিওরী অফ বায়োলজিক্যাল ফিল্ড '।

ইনিউসাচিন যুক্তি দেখিয়ে বললেন, এই 'বায়োপ্লাজমিক' দেহই হল 'বায়োলজিক্যাল' ফিল্ডের মূল ভিত্তি। এর নিজস্ব গোলকধাঁধাসম গতিপ্রকৃতি আছে, যা রক্তমাংসের দেহের এনার্জি প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু 'বায়োপ্লাজমিক' দেহ ছন্নছাড়া নয়, নিজস্ব মেরুপ্রবণতা আছে এবং নিজস্ব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডও আছে।

লস এঞ্জেলস্স্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইন্সটিটিউটের প্রফেসর থেলমা মস্ আগে ছিলেন ব্রডওয়ের অভিনেত্রী। ইনিউসাচিনের ল্যাবোরেটরীতে সর্বপ্রথম আমেরিকান হিসেবে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি দেখতে তিনি এলেন, কিন্তু মস্কো থেকে তাঁকে দেখবার অনুমতি দেওয়া হল না। ইনিউসচিন অবশ্য অনেক কথাই তাঁকে বলেছিলেন। মানবদেহের বিশেষ জায়গার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ ধরা পড়ে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফিতে—রোগ নিদানে যার প্রয়োজন হতে পারে। সবচেয়ে স্পষ্ট ফটো ওঠে বিকেল চারটের সময়ে—সবচেয়ে অস্পষ্ট মাঝরাতে। থেলমা মস্ খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছিলেন, পাশ্চাত্যের অকাল্ট সাহিত্যে যাকে বলা হয় জ্যোতির পুঞ্জ বা 'আকাশিক দেহ'—এ কি তাই ? স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন ইনিউসাচিন—'হ্যাঁ।'

নরদেহের প্রতিরূপ এই যে শক্তিদেহ, প্রাচীন দার্শনিক প্রাচ্যের মুনি এবং থিয়সফিষ্টরা যাকে বলেছেন আকাশিক দেহ, তা একটা ম্যাগনেটিক অঞ্চল ; স্থূল-দেহ এবং মহাজাগতিক শক্তিসমূহের মধ্যেকার সেতুবন্ধন—প্রাণের ধারা যার মধ্যে দিয়ে এসে পেঁছোচ্ছে স্থূলদেহে। এই শক্তিদেহের মাধ্যমেই টেলিপ্যাথিক এবং ক্লেয়ারভয়্যান্ট প্রক্ষেপণ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন ধরেই এই শক্তিদেহকে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন।

মস্ যখন আলমা আটা-য় ইনিউসাচিনের ল্যাবোরেটরীতে, ঠিক সেই সময়ে আর একজন আমেরিকান মস্কোয় ভিক্টর আডামেন্কোর ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন। এই মার্কিন ভদ্রলোকটির নাম মণ্টেগু উলমান—নিউইয়র্ক সিটির একটি চিকিৎসা কেন্দ্রের ডিরেক্টর।

উলমানের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল একটা চমকপ্রদ সংবাদে। চুম্বকক্ষেত্রে 'বায়োপ্লাজমা' রাখলে ঝটিতি সরে সরে যায় এবং নরদেহের কয়েকশ পয়েণ্টে কেন্দ্রীভূত হয়—যে পয়েণ্টগুলির সঙ্গে মিলে যায় সুপ্রাচীন চৈনিক পদ্ধতি আকুপাংচার পয়েণ্ট।

হাজার হাজার বছর আগে নরচর্মের ওপর সাতশ পয়েণ্টের মানচিত্র রচনা করেছিলেন চীনদেশের মানুষ। এই পয়েণ্টগুলোর ওপর দিয়েই প্রাণশক্তি প্রবহমান

মনে করতেন তাঁরা। শক্তির ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই সব পয়েণ্টেই ছুঁচ ঢুকিয়ে দিতেন তাঁরা। নরদেহের যে সব বিন্দু থেকে সবচেয়ে বেশী আলো ছিটকে পড়ে বলে দেখা গেছে কির্‌লিয়ান ফটোগ্রাফিতে, চৈনিক আকুপাংচার পয়েণ্টের সঙ্গে যেন তা মিলে যায়।

ইনিউসচিনের 'বায়োপ্লাজমা বডি' তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি আডামেন্‌কো অকাট্য প্রমাণের অস্তিত্ব না থাকায়। তাই তিনি দৃশ্যগ্রাহ্য নির্গমনকে বলেছিলেন 'সজীব বস্তু থেকে ইলেকট্রনের শীতল নির্গমন'।

যুক্তরাষ্ট্রের এ-হেন 'ইলেকট্রনের শীতল নির্গমনে'র অনুবাদ করা হয়েছে 'নভোবস্তুদের ছটামণ্ডল' বলে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণকালে দৃষ্ট সূর্যের আলোকমণ্ডল যেন।

কিয়েভের ইলেকট্রোফিজিয়লজিস্ট ডক্টর আনাটোলি পর্ডাসবায়াকিন চমৎকৃত হয়েছিলেন সূর্যপৃষ্ঠে কোনোরকম পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বায়োপ্লাজমায় তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে—অথচ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে মহাজগতিক কণিকাদের সময় লাগে দুদিনেরও বেশী।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা বিশ্বাস করেন এই বায়োপ্লাজমিক বডির মধ্যে দিয়েই মানুষ উদ্ভিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

আরও একজন মার্কিন প্যারাসাইকলজিস্ট রাশিয়ায় ছুটেছিলেন কির্‌লিয়ান ফটোগ্রাফির টানে। এঁর নাম ডক্টর স্ট্যানলী ক্রিপনার। নিউইয়র্কস্থিত স্বপ্ন গবেষণাগারের ডিরেক্টর। রাশিয়ায় গিয়ে শুনলেন, লেনিনগ্রাদের একটি সামরিক প্রতিষ্ঠানের নিউরোফিজিয়লজিস্ট জেনাডি সার্জিয়েভ কির্‌লিয়ান ফটো তুলেছেন নিনা কুলাজিনা নামে এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্না মহিলার। নিনা ওপর ওপর হাত বুলিয়ে, কিছু না ছুঁয়েই, পেপার ক্লিপ, দেশলাই, সিগারেট এবং আরও অনেক বস্তু টেবিলের ওপর রেখে সরাতে পারত।

সার্জিয়েভের ফটোয় দেখা গেল, নিনা যখন এই কাণ্ড করে, যা কিনা সাইকোকাইনেটিক কাণ্ডকারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তার দেহ ঘিরে থাকা 'বায়োপ্লাজমিক ফিল্ড' ফুলে ওঠে এবং নিয়মিত ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকে। আরও আছে। নিনার চোখ থেকে তখন যেন দ্যুতি-রশ্মি তীব্রবেগে বেরিয়ে আসে।

১৯৭১ সালের শরৎকালে বিশ্বের অন্যতম কৃষ্ট্যাল বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম টাইলারকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানানো হল কির্‌লিয়ান ফটোগ্রাফির তদন্তের জন্য। টাইলার জাতে আমেরিকান। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তুবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ।

মস্‌ আর উলম্যানকে যেমন সোভিয়েত গবেষণাগারে ঢুকতে দেওয়া হয়নি,

টাইলারকেও সেইভাবে গবেষণাগার পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হল না। তবে উনি আডামেন্কোর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে জটিল টেকনিক্যাল রিপোর্ট পেশ করে বলেছিলেন, সোভিয়েত গবেষণার নকল করা দরকার মার্কিন দেশে। কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হবে মেডিক্যাল এবং প্যারাসাইকলজিক্যাল তদন্ত কার্যে।

থেলমা মস্-ই কিন্তু প্রথম আমেরিকান যিনি কিরলিয়ান ধরনের ছবি তুলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। ছাত্র কেনড্যাল জনসনের সঙ্গে মিলেমিশে যে যন্ত্র বানিয়েছিলেন তা দিয়ে সর্বপ্রথম বৃক্ষপত্রের রঙিন ছবি তোলেন আমেরিকায়। মানুষের আঙুল থেকে এনার্জি বিচ্ছুরণের ছবির মতই দেখা গিয়েছিল আমেরিকান মুদ্রা ঘিরে লাল-সাদা-নীল জ্যোতির খেলা।

নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কে হেনরী সি মন্টিয়েথ নামে এক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার থাকতেন। বাড়ীতে বসে দুটো ছ-ভোল্টের ব্যাটারী, মোটর গাড়ীর রেডিওকে পাওয়ার জোগানোর একটা ভাইব্রেটর আর মোটরপার্টসের দোকান থেকে কিনে আনা একটা ইগ্নিশন কয়েল দিয়ে একটা যন্ত্র তৈরী করেন। রাশিয়ানদের মত মনটিয়েথও দেখেন, সজীব পাতা থেকে সুন্দর এবং রকমারি নির্গমন ফটোয় ধরা পড়ে—মামুলি তত্ত্ব দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। আরও তাজ্জব হলেন যখন দেখলেন, মরা পাতা থেকে বড় জোর একটানা একটা দ্যুতি বেরোয়। ৩০,০০০ ভোল্টেজের সামনে ফেলে দিলে মরা পাতা থেকে কোনো বিচ্ছুরণই ধরা পড়ে না ফিল্মে। জল দিয়ে স্নান করিয়েও কিছু হয় না। সজীব পাতা কিন্তু জ্বল জ্বল করতে থাকে স্ব-নির্গমনের দৌলতে।

জ্যোতির্বলয় বস্তুটাকে পাগলামি বলে মনে করতেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা। তাই এই নিয়ে খামোকা তদন্ত করেননি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধ হওয়ার পর স্ট্যানলী ক্রিপনার টাকাকড়ি জুটিয়ে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির প্রথম পাশ্চাত্য সম্মেলন করলেন। মানবদেহের জ্যোতির্বলয়ও রইল সম্মেলনের আলোচনা সূচীতে। ১৯৭২ সালের বসন্তকালে দলে দলে বিজ্ঞানীরা জড়ো হলেন ম্যানহাট্টানে। মস্ এবং জনসনের চাঞ্চল্যকর পাতার ফটো দেখানো হল আলপিন ফোটানোর আগে এবং পরে। কিরলিয়ান কায়দায় তোলা ফটোতে দেখা গেল, আলপিন-বিদ্ধ আহত পাতার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা রক্ত-লাল শক্তি-পুষ্করিণী জমেছে। আলপিন বিঁধোনোর আগে কিন্তু এই জায়গার রঙ ছিল উজ্জ্বল আকাশী এবং পাটল বর্ণ।

মানুষের ক্ষোভ-আবেগ অথবা সাইকিক অবস্থার সঙ্গে আঙুলের ডগা থেকে বিচ্ছুরণের সম্পর্কে-রহস্য আরও ঘনীভূত হ'ল যখন মস্ দেখলেন তাঁর নিজের এবং জনসনের আঙুলের ছবি পালটে যাচ্ছে দিনে দিনে, এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

পাতার ছবিও পালটায় অন্য পাতার ছবির তুলনায়, তাই মস্ ধরে নিয়েছিলেন, যে-ফ্রিকোয়েন্সিতেই ছবি তোলা হোক না কেন, আমরাও সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হচ্ছি, অনুনাদ সৃষ্টি করছি বস্তুর একটা বিশেষ দিকের সঙ্গে। তাই গোটা ছবি কখনোই উঠছে না—বিভিন্ন দিকের তথ্য আলাদাভাবে ধরা পড়ছে।

টাইলার বলেছিলেন, মানুষের আঙুলের ডগা বা গাছের পাতা থেকে বিচ্ছুরণ বা এনার্জি আসলে আসছে কঠিন বস্তুটা নির্মিত হওয়ার আগে যা ছিল—তা থেকে। যা থেকে আসছে, তা বস্তুর অন্য একটা স্তর হতেও পারে। এই মূল জিনিসটা একটা 'হলোগ্রাম' সৃষ্টি করছে, গাছের পাতার সামঞ্জস্যপূর্ণ এনার্জি প্যাটার্ণ নির্মাণ করছে। এই ফোর্স ফিল্ডই বস্তু সংগঠন করে নির্দিষ্ট আকার তৈরী করছে।

টাইলার বলেছিলেন, আকারের খানিকটা কেটে নিলেও হলোগ্রাম তখনও থেকে যাবে। গাছের পাতার ক্ষেত্রে রাশিয়ানরাও ঠিক তাই প্রমাণ করেছিলেন। ছবিটা ছাপা হয়েছিল জার্নাল অফ প্যারাফিজিক্সে (ডাউনটাউন,, উইল্টশায়ার)। রাশিয়ান কিরলিয়ান ফটোতে দেখা গিয়েছিল গাছের পাতার একটা দিক কেটে নেওয়া সত্ত্বেও কাটা জায়গায় যেখানে কিছু নেই, সেখানে নিখোঁজ পত্রাংশের বহিরেখা ঠিকই দেখা যাচ্ছে।

ইথেল লোচ ছিলেন নিউজার্সির রোগ সারানোর ওঝা। বিশ্রামকালে তাঁর নখের ডগাতে দেখা গেছে ঘন নীল দ্যুতি—রোগ সারানোর সময়ে এই নীল দ্যুতির সঙ্গে মিলেমিশে আঙুলের ডগা ফুঁড়ে ছিটকে এসেছে গাঢ় কমলা আর টকটকে লাল শিখা। দুটো ছবিই 'অসটিওপ্যাথিক ফিজিসিয়ান' নামক মেডিক্যাল জার্নালে ছাপা হয়েছিল। কিরলিয়ান ফটোর দৌলতেই দেখা গেছে রোগ সারানোর প্রক্রিয়া অন্তে ওঝাদের আঙুলের ডগার বিচ্ছুরণ বেশ কমে গেছে। প্রক্রিয়াকালে যেন প্রচুর শক্তি রুগীর শরীরে প্রবেশ করায় শক্তি বিচ্ছুরণ হ্রাস পেয়েছে ঠিক তারপরেই। গ্যালভানি এবং মেসমারের এনিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্ তত্ত্ব সমর্থিত হল এই ভাবেই।

বাফেলোর রোজারী হিল কলেজের (নিউইয়র্ক) অন্যতম প্রফেসর জুস্টা স্মিথ ছিলেন একাধারে ক্যাথোলিক সন্ন্যাসিনী এবং বায়োকেমিস্ট। উনি জানতেন এনজাইম সক্রিয়তা বাড়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে, কমে আলট্রা-ভায়োলেট আলোয়। একজন ওঝার ক্ষেত্রে দেখলেন, সে যখন ভাল মেজাজে থাকে, তখন হাতের শক্তি বিচ্ছুরণ ট্রিপসিন নামক প্যানক্রিয়েটিক এনজাইমের সক্রিয়তা বাড়িয়ে দেয় এমনভাবে যার সঙ্গে তুলনা চলে ৮০০০ থেকে ১৩,০০০ গস্-য়ের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রতিক্রিয়ার। স্বাভাবিকভাবে মানুষ থাকে 0.5 গস্ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে।

মিসটার জুস্টা স্মিথ এখনো এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যাচ্ছেন। উনি জানতে চান ওঝারা অন্যান্য এনজাইম ক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে পারে কিনা। সেক্ষেত্রে আবিষ্কারটা সুস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ কাজে আসবে।

আজ আর কোনো সন্দেহই নেই যে আমেরিকান সমর্থিত রাশিয়ান গবেষণা উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ও আবেগের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করবে। জয় হোক কিরলিয়ান টেকনিকের।

প্রথম কিরলিয়ান সম্মেলনের সাফল্য দেখে দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকা হল নিউইয়র্কের টাউন হলে ১৯৭৩য়ের ফেব্রুয়ারীতে। গ্রীক মনঃসমীক্ষক ডক্টর জন পিয়েরাকোস কতকগুলো বিস্ময়কর ড্রইং সবার সামনে হাজির করলেন। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের চারধারে যে জ্যোতি তিনি দেখেছেন, তার ড্রইং। মনের রুগীদের ক্ষেত্রে এই জ্যোতির ওপর তিনি খবরদারি করতে পারতেন। মানুষ দেহের জ্যোতি যে রোগ নিদানে সাহায্য করেছে অনেক ডাক্তারকে, এই খবর ছেপে বেরোলো ডাক্তার শাফিকা ক্যারাগুলার গ্রন্থ 'ব্রেকথ্রু ইন ক্রিয়েটিভি'তে (১৯৬৭)। ডাক্তারদের নামধাম তিনি গোপন করে গিয়েছিলেন। পিয়েরাকোসই একমাত্র চিকিৎসক যিনি সর্বসমক্ষে স্বীকার করেন মানবজ্যোতি রোগ নিরূপণে তাঁকে সাহায্য করে।

পিয়েরাকোস অধিকাংশ রুগীর চারধারে তিনটে সুস্পষ্ট স্তর দেখেছিলেন এবং ছবি এঁকে ছিলেন। প্রথমটা গাঢ়, এক ইঞ্চির ষোল ভাগের একভাগ থেকে আরম্ভ করে আট ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত পুরু; চামড়ার গা ঘেঁসে থাকে; স্বচ্ছ কৃস্ট্যালাকৃতি। দ্বিতীয়টা চওড়া গাঢ় নীল স্তর, যেন স্তূপীকৃত লোহা-কুচি, সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হয় যেন ডিম্বাকারে মুড়ে রয়েছে দেহ। তৃতীয়টা, হাল্কা নীলের কুয়াশা—উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে রুগী সুস্থ থাকলে, তখন তা কয়েক ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই কারণেই সুখী আমোদী মানুষদের আমরা বলি ঝলমলে।

অসুস্থ রুগীদের সান্নিধ্যে উদ্ভিদের শক্তিক্ষেত্র দারুণভাবে চোট পায়—বলেছেন পিয়েরাকোস। পাঁচ ফুট দূর থেকে আচমকা বিকট চেঁচিয়ে উঠলে ক্রিসানথিমাম ফুলের শক্তিক্ষেত্র সংকুচিত হয়, নীল আকাশী রঙ ফিকে হয়ে আসে, ধুকধুকুনি (স্পন্দন) তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। প্রতিদিন দু-ঘণ্টার জন্যে সজীব উদ্ভিদকে গলাবাজ রুগীদের তিন ফুট দূরে রেখে দিলে তলার পাতাগুলো ঝরে যেতে থাকে, তিন দিনেই শুকিয়ে গিয়ে উদ্ভিদটা মারা যায়। এই এক্স-পেরিমেণ্ট হয়েছিল পিয়েরাকোসের অফিসে ডক্টর টমাসের সহযোগিতায়।

প্রতি মিনিটে এনার্জি ফিল্ডের স্পন্দন সংখ্যা থেকেই নাকি মানুষটার ভেতরের অবস্থা বোঝা যায়। বৃদ্ধ বয়েসে স্পন্দন অনেক মৃদু, ঘুমের সময়েও মৃদু।

পাতার ছবিও পালটায় অন্য পাতার ছবির তুলনায়, তাই মস্ ধরে নিয়েছিলেন, যে-ফ্রিকোয়েন্সিতেই ছবি তোলা হোক না কেন, আমরাও সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হচ্ছি, অনুনাদ সৃষ্টি করছি বস্তুর একটা বিশেষ দিকের সঙ্গে। তাই গোটা ছবি কখনোই উঠছে না—বিভিন্ন দিকের তথ্য আলাদাভাবে ধরা পড়ছে।

টাইলার বলেছিলেন, মানুষের আঙুলের ডগা বা গাছের পাতা থেকে বিচ্ছুরণ বা এনার্জি আসলে আসছে কঠিন বস্তুটা নির্মিত হওয়ার আগে যা ছিল—তা থেকে। যা থেকে আসছে, তা বস্তুর অন্য একটা স্তর হতেও পারে। এই মূল জিনিসটা একটা 'হলোগ্রাম' সৃষ্টি করছে, গাছের পাতার সামঞ্জস্যপূর্ণ এনার্জি প্যাটার্ণ নির্মাণ করছে। এই ফোর্স ফিল্ডই বস্তু সংগঠন করে নির্দিষ্ট আকার তৈরী করছে।

টাইলার বলেছিলেন, আকারের খানিকটা কেটে নিলেও হলোগ্রাম তখনও থেকে যাবে। গাছের পাতার ক্ষেত্রে রাশিয়ানরাও ঠিক তাই প্রমাণ করেছিলেন। ছবিটা ছাপা হয়েছিল জার্নাল অফ প্যারাফিজিক্সে (ডাউনটাউন,, উইল্টশায়ার)। রাশিয়ান কিরলিয়ান ফটোতে দেখা গিয়েছিল গাছের পাতার একটা দিক কেটে নেওয়া সত্ত্বেও কাটা জায়গায় যেখানে কিছু নেই, সেখানে নিখোঁজ পত্রাংশের বহিরেখা ঠিকই দেখা যাচ্ছে।

ইথেল লোচ ছিলেন নিউজার্সির রোগ সারানোর ওঝা। বিশ্রামকালে তাঁর নখের ডগাতে দেখা গেছে ঘন নীল দ্যুতি—রোগ সারানোর সময়ে এই নীল দ্যুতির সঙ্গে মিলেমিশে আঙুলের ডগা ফুঁড়ে ছিটকে এসেছে গাঢ় কমলা আর টকটকে লাল শিখা। দুটো ছবিই 'অসটিওপ্যাথিক ফিজিসিয়ান' নামক মেডিক্যাল জার্নালে ছাপা হয়েছিল। কিরলিয়ান ফটোর দৌলতেই দেখা গেছে রোগ সারানোর প্রক্রিয়া অন্তে ওঝাদের আঙুলের ডগার বিচ্ছুরণ বেশ কমে গেছে। প্রক্রিয়াকালে যেন প্রচুর শক্তি রুগীর শরীরে প্রবেশ করায় শক্তি বিচ্ছুরণ হ্রাস পেয়েছে ঠিক তারপরেই। গ্যালভানি এবং মেসমারের এনিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্ তত্ত্ব সমর্থিত হল এই ভাবেই।

ব্যফেলোর রোজারী হিল কলেজের (নিউইয়র্ক) অন্যতম প্রফেসর জুস্টা স্মিথ ছিলেন একাধারে ক্যাথোলিক সন্ন্যাসিনী এবং বায়োকেমিস্ট। উনি জানতেন এনজাইম সক্রিয়তা বাড়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে, কমে আলট্রা-ভায়োলেট আলোয়। একজন ওঝার ক্ষেত্রে দেখলেন, সে যখন ভাল মেজাজে থাকে, তখন হাতের শক্তি বিচ্ছুরণ ট্রিপসিন নামক প্যানক্রিয়েটিক এনজাইমের সক্রিয়তা বাড়িয়ে দেয় এমনভাবে যার সঙ্গে তুলনা চলে ৮০০০ থেকে ১৩,০০০ গস্-য়ের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রতিক্রিয়ার। স্বাভাবিকভাবে মানুষ থাকে ০.৫ গস্ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে।

সিসটার জুস্টা স্মিথ এখনো এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যাচ্ছেন। উনি জানতে চান ওঝারা অন্যান্য এনজাইম ক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে পারে কিনা। সেক্ষেত্রে আবিষ্কারটা স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ কাজে আসবে।

আজ আর কোনো সন্দেহই নেই যে আমেরিকান সমর্থিত রাশিয়ান গবেষণা উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ও আবেগের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করবে। জয় হোক কিরলিয়ান টেকনিকের।

প্রথম কিরলিয়ান সম্মেলনের সাফল্য দেখে দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকা হল নিউইয়র্কের টাউন হলে ১৯৭৩য়ের ফেব্রুয়ারীতে। গ্রীক মনঃসমীক্ষক ডক্টর জন পিয়েরাকোস কতকগুলো বিস্ময়কর ড্রইং সবার সামনে হাজির করলেন। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের চারধারে যে জ্যোতি তিনি দেখেছেন, তার ড্রইং। মনের রুগীদের ক্ষেত্রে এই জ্যোতির ওপর তিনি খবরদারি করতে পারতেন। মানুষ দেহের জ্যোতি যে রোগ নিদানে সাহায্য করেছে অনেক ডাক্তারকে, এই খবর ছেপে বেরোলো ডাক্তার শাফিকা ক্যারাগুলার গ্রন্থ 'ব্রেকথ্রু ইন ক্রিয়েটিভি'তে (১৯৬৭)। ডাক্তারদের নামধাম তিনি গোপন করে গিয়েছিলেন। পিয়েরাকোসই একমাত্র চিকিৎসক যিনি সর্বসমক্ষে স্বীকার করেন মানবজ্যোতি রোগ নিরূপণে তাঁকে সাহায্য করে।

পিয়েরাকোস অধিকাংশ রুগীর চারধারে তিনটে সুস্পষ্ট স্তর দেখেছিলেন এবং ছবি এঁকে ছিলেন। প্রথমটা গাঢ়, এক ইঞ্চির ষোল ভাগের একভাগ থেকে আরম্ভ করে আট ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত পুরু; চামড়ার গা ঘেঁসে থাকে; স্বচ্ছ কৃস্ট্যালাকৃতি। দ্বিতীয়টা চওড়া গাঢ় নীল স্তর, যেন স্তূপীকৃত লোহা-কুচি, সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হয় যেন ডিম্বাকারে মুড়ে রয়েছে দেহ। তৃতীয়টা, হাল্কা নীলের কুয়াশা—উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে রুগী সুস্থ থাকলে, তখন তা কয়েক ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই কারণেই সুখী আমোদী মানুষদের আমরা বলি ঝলমলে।

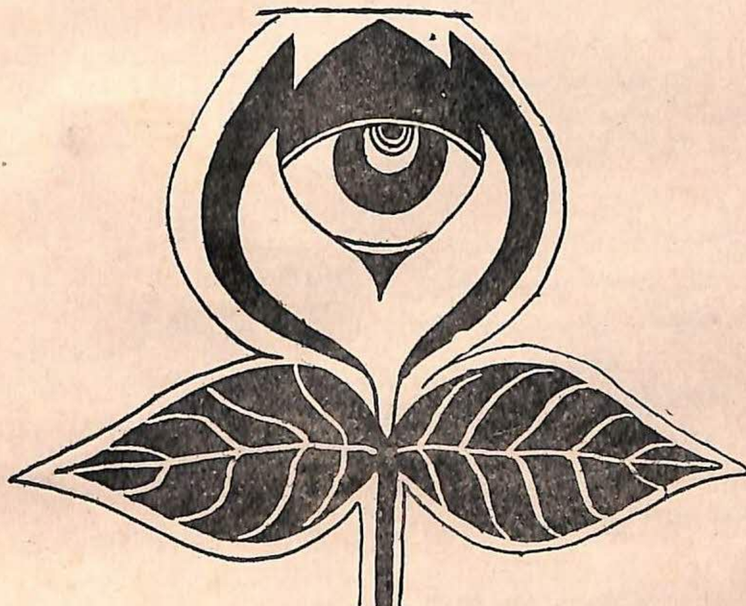
অসুস্থ রুগীদের সান্নিধ্যে উদ্ভিদের শক্তিক্ষেত্র দারুণভাবে চোট পায়—বলেছেন পিয়েরাকোস। পাঁচ ফুট দূর থেকে আচমকা বিকট চেঁচিয়ে উঠলে ক্রিসানথিমাম ফুলের শক্তিক্ষেত্র সংকুচিত হয়, নীল আকাশী রঙ ফিকে হয়ে আসে, ধুকধুকুনি (স্পন্দন) তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। প্রতিদিন দু-ঘণ্টার জন্যে সজীব উদ্ভিদকে গলাবাজ রুগীদের তিন ফুট দূরে রেখে দিলে তলার পাতাগুলো ঝরে যেতে থাকে, তিন দিনেই শুকিয়ে গিয়ে উদ্ভিদটা মারা যায়। এই এক্স-পেরিমেণ্ট হয়েছিল পিয়েরাকোসের অফিসে ডক্টর টমাসের সহযোগিতায়।

প্রতি মিনিটে এনার্জি ফিল্ডের স্পন্দন সংখ্যা থেকেই নাকি মানুষটার ভেতরের অবস্থা বোঝা যায়। বৃদ্ধ বয়েসে স্পন্দন অনেক মৃদু, ঘুমের সময়েও মৃদু।

একই শক্তিক্ষেত্র সমুদ্রের ওপরেই বহু মাইল ওপর পর্যন্ত দেখেছেন পিয়েরা-কোস। তার ড্রইংও করেছেন। সবচেয়ে মৃদু থাকে মধ্যরাত্রে। সবচেয়ে বাড়ে দুপুরে। রুডলফ স্টাইনার কি এই কারণেই বলেছিলেন, পৃথিবী গ্রহটা কেমিক্যাল ইথারে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় ?

যাই হোক, থেলমা মসের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, গবেষণাটার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেই রাশিয়ান এবং আমেরিকান সরকার এত গোপনতা অবলম্বন করেছেন।

চতুর্থ খণ্ড



মাটির সন্তান

মাটি ঃ প্রাণের উপাদান

আমরা সবাই মাটির সন্তান। উদ্ভিদ, পশু, মানুষ—মাটিতেই মিশে যাচ্ছে জীবনান্তে—স্বাস্থ্যকর মাটিই উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষকে সুস্থ রাখছে।

মিশৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি-বিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম অ্যালব্রেক্ট বলেছেন, এ ব্যাপারে গরুরা মানুষদের চেয়েও ধীমান। যে ঘাস নাইট্রোজেন সারের দৌলতে সবুজ এবং দীর্ঘ, গরুরা সে ঘাস মুখে নেয় না—আশপাশের ছোট ঘাস খায়। বায়োকেমিস্টের চাইতে বড় বিশেষজ্ঞ তারা, ঠিক চিনে নেয় বেশী পুষ্টি কোথায়।

ফ্রান্সের জাতীয় পশু-বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ডক্টর আঁদ্রে ভয়সিন ইউকেইনে গিয়ে দেখেছিলেন, ফ্রান্স থেকে আমদানী বড় ঘোড়াগুলো সেখানকার পেল্লায় ঘাস খেয়ে কয়েক পুরুষের মধ্যেই কসাক ঘোড়ার মত ছোট হয়ে গেছে।

ডক্টর রবার্ট ম্যাকক্যারিসন ভারত সরকারের পুষ্টি গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। উত্তর কাশ্মীরের গিলগিট অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে তিনি দেখেন সেখানকার হুঞ্জা সম্প্রদায় একটানা ১২০ মাইল হাঁটতে পারে পাহাড়ি পথে, বরফ ঢাকা সরোবরে দুটো ফুটো করে এক ফুটো থেকে আরেক ফুটো পর্যন্ত সাঁতরে যেতে পারে বরফের তলা দিয়ে। বাঁচে অনেকদিন, শরীর থাকে নীরোগ। বুদ্ধি-মত্তাও তাদের সাধারণের চাইতেও বেশী। অথচ একই ভৌগলিক অবস্থানে থেকেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের শরীর বা বুদ্ধি এত ভাল নয়।

হুঞ্জা সম্প্রদায় নিজেদের আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট-য়ের বংশধর বলে দাবী করে। এদের আহার অতি সাধারণ। সব্জী, শস্য, ফলমূল, ছাগদুগ্ধ এবং মাখন। একই খাবার ইঁদুরদের খাইয়ে আশ্চর্য ফল পেয়েছিলেন ম্যাক্‌ক্যারিসন। দীর্ঘদিন সুস্থদেহে বেঁচেছিল তারা। মেরে ফেলার পরেও দেহ ব্যবচ্ছেদ করে ব্যাধির চিহ্ন দেখা যায় নি।

প্রতিবেদনটা প্রকাশিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চে।

ম্যাক্‌ক্যারিসন গিলগিটে পেঁছানোর আগেই আলবার্ট হাওয়ার্ড নামে এক তরুণ মাইকলজিস্ট এবং কৃষিবক্তা উদ্ভিদের অসুখবিসুখের কারণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। বারবাডোস্থিত কৃষি-দপ্তরে সংযুক্ত ছিলেন ইনি। ভারত সরকার তাঁকে বাংলার কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রে ইম্পিরিয়েল বট্যানিস্ট নিযুক্ত করেন। রাসায়নিক-সার-নামক বিষ না দিয়ে স্বাস্থ্যবান উদ্ভিদ সম্ভব কিনা গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখেন ভারতীয়রা পশু এবং উদ্ভিদের জঞ্জাল সার হিসেবে মাটিতে দেয়। বলদরা সেই উর্বর জমিতে থেকে কখনো অসুখে ভোগে না।

ফলাফল প্রকাশ করেন তিনি ১৯১৯ সালে। বলেন, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি

পেলেই পশু এবং উদ্ভিদের রোগ আর হবে না। এ সম্পর্কে ইন্দোরে তিনি উদ্ভিদ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এবং তুলোর চাষে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। উৎপাদন বেড়েছিল তিনগুণ, কোনো ব্যাধিও দেখা যায়নি তুলো ক্ষেতে।

যুদ্ধের সময়ে লেডী ইভ 'জীবন্ত মাটি' নামে একটা বই প্রকাশ করেন ইংলণ্ডে—সেখানে তখন খাদ্যের অভাবে রেশনিং চলছে। হাওয়াডর্ আর ম্যাক্-ক্যারিসনের যুক্তি তাঁর মনে ধরেছিল। পচা পাতা আর অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে তৈরী সার দেওয়া মাটিতে বৃদ্ধি পাওয়া গাছপালার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবান সেই উদ্ভিদ আহার করার পর মানুষ আর পশুর সুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না।

হাওয়ার্ডকে অনুসরণ করেছিলেন ফ্রেণ্ড স্কাইক্স্—বৃটেনের এক চাষী এবং অশ্বপালক। তিনি দেখেছিলেন, বিশেষ শস্য বা বিশেষ পশুকে আলাদা ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। মিলিয়ে মিশিয়ে রাখলে তা ঘটে না। 'ইকলজি'র শব্দটি আজকাল সবাই জানে—কিন্তু তিনি জানতেন না। অথচ 'ইকলজি'র ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন অভিজ্ঞতা থেকে। ডি-ডি-টি প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন পৃথিবী-কাঁপানো র‍্যাচেল কার্সন লিখিত 'সাইলেণ্ট স্প্রিং' বইখানা প্রকাশিত হওয়ার দশ বছর আগেই। এই বইতে কার্সন লিখেছিলেন, বিষ প্রয়োগ করলে প্রকৃতি বাধা দেবেই। সেই বাধা অতিক্রম করার জন্যে আরো কড়া বিষের প্রয়োগ করা হবে। মানুষের পরিণতিটা তখন কি হবে?

লেডী ব্যালফোর এবং অন্যান্যদের নিয়ে 'মাটি সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রেণ্ড স্কাইকস্ যাতে মাটি, উদ্ভিদ, পশু আর মানবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে—পরিমাণ বাড়াতে গিয়ে গুণকে বিসর্জন দেওয়া না হয়। সাফোক অঞ্চলে মাটি গবেষণা করে 'মাটি সংঘ' বলেছিল, অ্যাটম বোমার আবিষ্কারে মানুষ ভয় পেয়েছে। তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয়ে চলেছে মাটির—যে মাটির ওপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব।

বৃটেনে 'মাটি সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু আগে পেনসিলভানিয়ায় একটি স্বাস্থ্য পত্রিকার সম্পাদক জে-জে রোডেল অ্যালবার্ট হাওয়ার্ডের গবেষণা বৃত্তান্ত পড়ে উদ্বুদ্ধ হন এবং আমেরিকানদের এ সম্পর্কে অবহিত করতে সচেষ্ট হন। হাওয়ার্ডের একখানা বই নিজে প্রকাশ করেন এবং পেনসিলভানিয়ায় খানিকটা জমির ওপর চাষবাস করেন। আমেরিকানদের তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মাটি জিনিসটা জীবন্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটির তলায় গিজ গিজ করছে বিবিধ প্রাণী। কেঁচোরা মাটি খেয়ে বার করে দিয়ে উর্বর মাটি সৃষ্টি করছে। অ্যারিস্টট্ল্ কেঁচোদের বলেছেন 'মাটির অন্ত্র'। এই অন্ত্র না থাকলে

মাটি শক্ত হয়ে যেত, মাটির ধমনী শুকিয়ে গেছে মনে হত।

মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৮১ সালে চার্লস ডারউইন 'ভেজিটেবল মোল্ডস্ অ্যাণ্ড আর্থওয়াম' বইটা লেখেন। বলেছিলেন, কেঁচো না থাকলে উদ্ভিদ-জগৎ শুকিয়ে যেত। ফি-বছরে প্রতি তিন বিঘে অঞ্চলে একটা কেঁচোর পরিপাক যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চালান হয় দশ টনেরও বেশী শুকনো মাটি। তখন কিন্তু তাঁর বই স্কুল পাঠ্যও করা হয়নি। রাসায়নিক সার ও কীট নাশক প্রয়োগে কৃষি-ক্ষেত্রের সমৃদ্ধির বদলে যে সর্বনাশ হচ্ছে, কেউ জানতেও পারেনি। কেঁচো মারা গেলে মাটি ভাল থাকবে কি করে ?

মাটির অবস্থা এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি বইখানায় স্যার ই জন রাসেল লিখেছিলেন, এক গ্রাম মাটিতে খামার বাড়ীর সার প্রয়োগ করলে ২৯,০০০,০০০ ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায়। রাসায়নিক সারে তার সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তিন বিঘে উর্বর মাটিতে সিকি টনেরও বেশী জীবাণু থাকে। মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ মাটিকে উর্বর করে তোলে। এ ছাড়াও আছে আরো জীবাণু এবং অতি-ক্ষুদ্র প্রাণকণিকা। অনেক ফানগাস্‌কে রহস্যজনক পন্থায় গ্রহণ করে সবুজ উদ্ভিদ। অতীব স্বাস্থ্যবান ফরাসী আঙুর লতার শেকড়ে এই ফানগাস্ পেয়েছিলেন হাওয়ার্ড। কৃত্রিম সার না দেওয়া সত্ত্বেও এই আঙুরের রস ছিল উৎকৃষ্টতম।

কেমিক্যাল, উদ্ভিদ এবং মানুষ

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিকোলাস নামে এক আমেরিকান সাউথ ক্যারোলিনায় কয়েক-শ বিঘে জমি কিনে চাষআবাদ করে প্রচুর উৎপাদন করেন। মাটিতে কোনো কৃত্রিম সার দেন নি। শস্যোৎপাদন এক সময়ে কমে আসতেই নতুন জমিতে চাষ আবাদ শুরু করেন। নতুন জমি যখন আর পাওয়া গেল না, সংসারে অলক্ষ্মী ঢুকল।

নিকোলাসের ছেলে টেনেসিতে গিয়ে ছ-হাজার বিঘে জমি কিনে চাষ আবাদ করে লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। আবার জমি যখন বন্ধ্যা হল, তাঁর ছেলে চলে গেলেন অ্যালবামায়। ছ-হাজার বিঘে জমি কিনে চাষআবাদ করলেন এবং প্রচুর উৎপাদন ঘটালেন। এঁর ছেলে গেলেন আরও পশ্চিমে আরকানসাসে—তিন হাজার বিঘে জমির ওপর শুরু হল চাষবাস।

চার পুরুষে চারবার জমি বদল করলেন নিকোলাস পরিবার। এইভাবেই পড়ে থাকা মার্কিন মহাদেশে এত শস্য উৎপাদন করেছেন আমেরিকানরা।

শেষোক্ত নিকোলাস একদিন একটা ম্যাগাজিনে পড়লেন, উর্বর জমিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক খাদ্য যারা খায়, তাদের হৃদ্‌রোগ হয় না।

কিন্তু প্রাকৃতিক খাদ্যটা কী ? উর্বর মাটি কাকে বলে ?

ম্যাগাজিন সম্পাদক জে-জে রোডেল কিন্তু নিজে ডাক্তার ছিলেন না। তবে কি হাতুরে ?

যাই হোক, রোডেল, হাওয়ার্ড এবং ম্যাকক্যারিসনের উপদেশ মতো জমিতে রাসায়নিক সার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন নিকোলাস। তিরিশ বছর পরে দেখা গেল তাঁর তিন হাজার বিঘে জমির চাষআবাদ সত্যিই চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো।

নিকোলাস নিজে কিন্তু ডাক্তার ছিলেন। ভাল পশার ছিল। হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিরিশ বছর রাসায়নিক সারবিহীন জমির খাদ্য খেয়ে আর তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়নি।

তখন উনি বুঝলেন, বিষাক্ত জমির 'আবর্জনা' খাদ্য খেয়েই মরতে বসেছিলেন তিনি। স্যার লায়োনেল পিকটন লিখিত 'পুষ্টি এবং মাটি' শীর্ষক বইখানা পড়ে বুঝলেন, হৃদরোগ, ক্যানসার এমন কি ডায়াবেটিসও হবে না যদি বিষমুক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উর্বর মাটি থেকে সংগ্রহ করে খাওয়া যায়।

জৈব খনিজ, যেমন ভিটামিন, সুষম সমানুপাতে প্রাকৃতিক খাদ্যের মধ্যে থাকে। ভিটামিন নিজে পুষ্টি নয়, কিন্তু ভিটামিন ছাড়া শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিকে কাজে লাগাতে পারে না। সুষম অর্থে কলাতন্তু যে সমস্ত পুষ্টি কাজে লাগায়, তার সবগুলিই যেন একযোগে কোষের কাছে লভ্য হয়। উত্তম পুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য যে ভিটামিনের প্রয়োজন, তা অবশ্যই যেন প্রকৃতিজাত হয়।

প্রকৃতিজাত ভিটামিন আর সংশ্লিষ্ট ভিটামিনের তফাৎ অনেক। তফাৎটা রাসায়নিক নয়, জৈবিক বা প্রাণবর্ধক গুণবত্তার অভাব থাকে কৃত্রিম ভিটামিনে। ব্যাপক স্বীকৃতি না পেলেও এই তত্ত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ডক্টর ফিফার। ইনি নিজে বায়োকেমিস্ট এবং বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও অলোকদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি রুডলফ স্টাইনারের ভক্ত। ডক্টর নিকোলাসের দৃঢ় বিশ্বাস, ফিফার পদ্ধতি দ্বারাই উদ্ঘাটিত করা সম্ভব প্রকৃতিজাত ভিটামিন, খনিজ এবং এনজাইম কেন কৃত্রিম ভিটামিন, খনিজ এবং এনজাইমের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

নিউইয়র্কের স্প্রিং-ভ্যালীতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার আগে ফিফার স্বদেশে (সুইজারল্যাণ্ডে) 'সংবেদনশীল ক্রস্ট্যাল করার পদ্ধতি' উদভাবন করেছিলেন উদ্ভিদ, পশু এবং মানুষের সূক্ষ্মতর ডাইনামিক (প্রাণবন্ত) ফোর্স-সমূহ পরখ করার জন্যে—যা তখনো পর্যন্ত কোনো ল্যাবোরেটরীতে সম্ভব হয়নি। ডক্টর স্টাইনার ফিফারকে অনুরোধ করেছিলেন এমন একটা বিকারক বা পদার্থের অস্তিত্ব জানবার জন্য ব্যবহৃত বস্তু (রিএজেণ্ট) উদভাবন করা হোক যা সজীব বস্তুর 'আকাশিক আকার প্রদানকারী শক্তিসমূহ'কে উদঘাটন করতে পারবে। সোডিয়াম সালফেট এবং আরও অনেক কেমিক্যাল নিয়ে কয়েক মাস টেস্ট করার

পর ফিফার দেখলেন, সজীব বস্তুর নিষ্কাষণ কপার ক্লোরাইডে দেওয়ার পর চোদ্দ থেকে সতেরো ঘণ্টা ধরে তা যদি বাষ্পাকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হলে এমন ক্রিস্ট্যাল প্যাটার্নের উদ্ভব ঘটবে, যার সঙ্গে সেই সজীব বস্তুটার (উদ্ভিদের) প্রকৃতিগত তো বটেই, গুণগত মিলও থাকবে। ফিফারের মতে যে আকারপ্রদান-কারী শক্তিসমূহ উদ্ভিদকে নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে, ক্রিস্ট্যাল প্যাটার্নের মধ্যেও সেই শক্তিসমূহ নিজেদের মিলিয়ে দেবে।

ফিফার প্রতিষ্ঠিত স্প্রিংভ্যালীস্থিত ল্যাবোরেটরীর বর্তমান ডিরেক্টর দেখিয়েছেন, সুস্থ তেজীয়ান উদ্ভিদের ক্রিস্ট্যাল প্যাটার্ন যত সুসমঞ্জস ও সুন্দর হয়, অসুস্থ দুর্বল উদ্ভিদের তেমনটা হয় না।

স্যাবার্থ বলেন, ফিফারের পদ্ধতি যাবতীয় সজীব বস্তুর অন্তর্নিরূঢ় গুণ নির্ণয় করতে পারে। জনৈক বনরক্ষক দুটো বিভিন্ন পাইন বৃক্ষের দুটো বীজ পাঠিয়েছিলেন ফিফারের কাছে। ফিফার তাদের ক্রিস্ট্যাল প্যাটার্ন দেখে বলেছিলেন একটা গাছ সুস্থ—আরেকটা গুরুতর অসুস্থ। পরের ডাকেই গাছদুটোর বিবর্ধিত ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বনরক্ষক। দেখা গেছিল, একটার কাণ্ড ঋজু, আর একটার বক্র—তক্তা বানাতে কোনো কাজেই লাগবে না।

জীবন্ত মাটি, উদ্ভিদ আর খাদ্য থেকে প্রাণ কিভাবে স্পন্দিত হয়, সহজতর একটা টেস্ট মারফৎ তা দেখিয়েছিলেন ফিফার। প্রাণের গুপ্তরহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। প্রকৃতিজাত ভিটামিন সি'র প্রাণশক্তির প্যাটার্ন অনেক জোরদার কৃত্রিম ভিটামিন সি'র প্রাণশক্তি প্যাটার্নের চেয়ে। রুডল্‌ফ্‌ স্টাইনারের ভক্ত রুডল্‌ফ্‌ হউস্চকা বলেছেন, ভিটামিন জিনিসটা কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড নয় যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা যাবে, 'মূলতঃ তা মহাজাগতিক আকার প্রদান-কারী শক্তিসমূহ'।

মৃত্যুর আগে একটা পুস্তিকায় ফিফার বলেছিলেন, ১৫০ বছর আগে গ্যেটে একটা পরম সত্যকথা বলে গেছেন—'অংশসমূহের যোগফলের চাইতে সম্পূর্ণটা অনেক বেশী'। ফিফার তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, একটা বীজ-বিশ্লেষণে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ, আদ্রর্তা এবং ভিটামিন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জৈবিক মূল্য বা জেনেটিক পটভূমিকা পুরোপুরি উদ্ধার হয় না।

আধুনিক টিনের খাবারে মৌলিক পদার্থের এবং এনজাইমের অপসারণ ঘটানো হয় যাতে খাবার অনেকদিন টেঁকে। নিকল্‌স্‌ বলেছেন, প্রাণটাকেই সরিয়ে নেওয়া হয় যাতে খাবার বেঁচেও থাকবে না, মরেও যাবে না।

আজকাল 'এনরিচ্‌ড্‌' সাদা পাঁউরুটির খুব চল হয়েছে। কিন্তু এ থেকে ভিটামিন আর খনিজদ্রব্যগুলো বার করে নেওয়ার পর যা পড়ে থাকে, তা কাঁচা স্টার্চ ছাড়া কিছুই নয়—যে বস্তু ব্যাকটিরিয়াও আহার করবে না।

মাখনের বদলে সস্তা মারগারিন আবিষ্কার করেছিলেন একজন ফরাসী ভদ্রলোক। ফরাসী ভদ্রলোক। তার মধ্যেও ঘাটতি ছিল ভিটামিন এ আর ডি'র। দেশের লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

নিকল্‌স্‌-য়ের মতে সাদা চিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক খাদ্য। অধিকাংশ ভাল বস্তুই সরিয়ে নেওয়া হয়। থাকে শুধু কার্বোহাইড্রেট আর ক্যালোরী যা প্রচুর পরিমাণে অন্য খাবারে পাই।

টেবল্‌ সল্ট আর একটা বিষ। রিফাইন করা এই লবণ বেশী পরিমাণে দীর্ঘদিন খেলে রক্তের উচ্চচাপ এবং হৃদ্‌রোগ হয়।

বিশ্বের প্রাচীনতম অ্যালকেমিস্ট—উদ্ভিদ

একটা মৌলিক বস্তুকে আর একটা মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়, মধ্যযুগীয় অ্যালকেমিস্টরা বলতেন। তাঁদের কিন্তু বিদ্রূপ করা হয়েছিল। এখন বোধহয় আর করা যাবে না। সজীব উদ্ভিদদের দৌলতেই তা করা যাবে না।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লুই কারভ্রান নামে ব্রেটনের একটি স্কুল বালক লক্ষ্য করছিল, মুরগী অভ্র খুঁটে খায়, অথচ সেই মুরগী জবাই করার পর তার পাকস্থলীতে অভ্রর কোনো কুচি পাওয়া যায় না; কিন্তু যে ডিম পাড়ে, তাতে থাকে ক্যালসিয়মের খোলা—এক কণা ক্যালসিয়াম না খাওয়া সত্ত্বেও। বহু বছর পরে কারভ্রান এই তাজ্জব ব্যাপারটার সমাধান করেছিল। মুরগীরা একটা মৌলিক পদার্থকে রূপান্তরিত করে আর একটা মৌলিক পদার্থে।

যে কোনোভাবেই হোক, মুরগী ক্যালসিয়াম উৎপাদন করে নিজের শরীরের মধ্যে, কারভ্রানের মাথায় এই ধারণা ঢোকবার পর মনে হল রসায়ন শাস্ত্রে যা কিছু শেখানো হচ্ছে তাঁর পর্যালোচনা দরকার। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক ল্যাভয়সার বলেছিলেন, 'ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে না, কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে না'।

আপাতঃ নিশ্ছিদ্র এই তত্ত্বে প্রথম ছিদ্র দেখা গেল রেডিও অ্যাকটিভিটি আবিষ্কারের পর। দেখা গেল, প্রায় কুড়িটা মৌলিক পদার্থ ভেঙে গিয়ে একেবারে অন্য জিনিস হয়ে যাচ্ছে। যেমন, রেডিয়াম থেকে আসছে তড়িৎ, উষ্ণতা, আলো, এবং সীসা, হিলিয়াম ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ।

তরুণ গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং বায়োলজিস্ট কারভ্রান শুধু ওট বা যই খাইয়ে রাখলেন মুরগীদের। পরে তাদের ডিম আর পুরীষ পরীক্ষা করে দেখলেন, তা থেকে ক্যালসিয়াম বানিয়ে নিচ্ছে মুরগী। ওটে-ও কিন্তু পটাসিয়াম থাকে খুব বেশী।

আরও গবেষণা চালিয়ে কারভ্রান এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ডিমের মধ্যেই চুন

সৃষ্ট হয়ে চলেছে। এ তথ্য প্রকাশ পেল অ্যাটম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা অবহিত হওয়ার অনেক আগে।

এক বন্ধুর কাছে কারব্র্যান শুনলেন, ১৬০০ খৃস্টাব্দ নাগাদ জ্যান ব্যাপিস্টা হেলমণ্ট নামে এক ফ্লেমিশ কেমিস্ট একটা উইলো চারা রোপণ করেছিলেন ২০০ পাউন্ড মাটি ভর্তি একটা টবে, তারপর পাঁচ বছর বৃষ্টির আর পরিশ্রুত জল ছাড়া গাছটাকে আর কিছু দেন নি। পাঁচ বছর পরে গাছটাকে টব থেকে সরিয়ে নিয়ে ওজন করে দেখলেন গাছের ওজন বেড়েছে ১৬৪ পাউণ্ড, কিন্তু মাটির ওজন মোটা মুটি একই থেকে গেছে। তবে কি জলকে কাঠ, ত্বক আর শেকড়ে রূপান্তরিত করেছে চারাগাছটা? অবাক হয়েছিলেন হেলমণ্ট।

আর একটা উদ্ভিজ্জ বিশৃঙ্খলতা কৌতূহল জাগ্রত করেছিল কারব্র্যানের। এক জাতীয় স্পেনীয় শৈবাল মাটির সংস্পর্শে না থেকে তামার তারের ওপর বৃদ্ধি পায়। পুড়িয়ে ফেলার পর ছাইয়ের মধ্যে তামার অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়নি—আয়রন অক্সাইড এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ছাড়া। সবগুলোই যেন বাতাস থেকে এসেছে।

হেনরী স্পিণ্ডলার নামে আর একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক চমৎকৃত হয়েছিলেন 'ল্যামিনেরিয়া' নামে এক ধরনের ছত্রাকের আয়োডিন উৎপাদনের ক্ষমতা দেখে। মনের ধাঁধা কাটাতে গিয়ে লাইব্রেরীর ধুলোভর্তি তাক থেকে পেলেন অর্ধ-বিস্মৃত একটি নাম। জার্মান গবেষক ভোগেল বীজ পুঁতে কাঁচের বেলজার চাপা দিয়ে রেখেছিলেন—পরিশ্রুত জল ছাড়া কিছু দেন নি। মাস কয়েক পরে প্রাপ্তবয়স্ক উদ্ভিদগুলো পুড়িয়ে দেখেছিলেন, বীজে যত গন্ধক ছিল, তার দ্বিগুণ পরিমাণ গন্ধক রয়েছে ছাইয়ে। ভোগেলের পরেই দুজন ইংরেজ লঈস আর গিলবার্টও ইংলণ্ডের একটি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রে (রোথামস্টেড) আবিষ্কার করেছিলেন উদ্ভিদরা যেন মাটিতে যত মৌলিক পদার্থ থাকে, তার চাইতেও বেশী টেনে নিতে পারে।

রোথামস্টেড গবেষকরা একটা ক্লোভার ক্ষেতে বছরে দু-তিনবার পাতা কেটে এবং প্রতি চতুর্থ বছরে বীজ-রোপণ করেছিলেন—কোনো সার দেন নি জমিতে। যত পরিমাণ পাতা কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ততটা পরিমাণ ফেরৎ দিতে হলে হিসেব করে দেখা গিয়েছিল জমির ওপর ফেলতে হত ৫,৭০০ পাউণ্ড চুন, ২,৭০০ পাউণ্ড ম্যাগনেশিয়া, ৪,৭০০ পাউণ্ড পটাশ, ২,৭০০ পাউণ্ড ফসফোরিক অ্যাসিড এবং ৫,৭০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন। সব মিলিয়ে দশ টনেরও বেশী। এত খনিজ এল কোত্থেকে?

রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার সংকল্প নিয়ে স্পিণ্ডলার আরও বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেলেন হ্যানোভেরিয়ান ব্যারন হীরজীলের লেখা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত

একটা বই। বিপ্লবাত্মক এই গ্রন্থের নাম 'অজৈব বস্তুদের উৎস'। হীরজীল এই বইতে প্রমাণ করেছিলেন যে সজীব উদ্ভিদরা মাটি আর বাতাস থেকে বস্তু সংগ্রহ করছে না—নিজেরা সৃষ্টি করে চলেছে বিরামবিহীনভাবে। সারা জীবনে কয়েক-শ এক্সপেরিমেণ্ট করে হীরজীল দেখিয়েছেন, পরিশ্রুত জলে যে-বীজ অংকুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায়, সেই বীজের মধ্যে গোড়ায় যত পরিমাণ পটাশ, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর গন্ধক থাকে, তা পরে অব্যাখ্যাতভাবে বেড়ে যায়। বস্তু সংরক্ষণের নিয়ম অনুসারে পরিশ্রুত জলে বর্ধিত বীজে ঠিক যতটুকু খনিজ থাকে, উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার পর ঠিক ততটুকু খনিজ উদ্ভিদেও থাকা উচিত—হীরজীল কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। শুধু যে খনিজ ছাই বেড়েছে তা নয়, পোড়ানোর সময়ে উড়ে যাওয়া নাইট্রোজেনও বেড়ে গেছিল উদ্ভিদের প্রতিটি অংশে।

আরও একটা আবিষ্কার করেছিলেন হীরজীল। মনে হয় উদ্ভিদরা যেন অ্যালকেমিক্যাল কায়দায় ফসফরাসকে গন্ধকে, ক্যালসিয়ামকে ফসফরাসে, ম্যাগনেসিয়ামকে ক্যালসিয়ামে, কার্বনিক অ্যাসিডকে ম্যাগনেসিয়ামে এবং নাইট্রোজেনকে পটাশিয়ামে রূপান্তর করতে পারে।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হীরজীলের রচনাবলী নীরবে উপেক্ষিত হয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে। অনেক বই বিক্রীও হয় নি।

স্পিণ্ডলার তাঁর সতীর্থদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন হীরজীলের এক্সপেরিমেণ্টসমূহে। এঁদের অন্যতম ছিলেন পিয়েরি বারাঙ্গার—প্যারিসের সুবিখ্যাত ইকোলি পলিটেকনিকের প্রফেসর এবং ডিরেক্টর। হীরজীলের এক্সপেরিমেণ্টগুলো ইনি যাচাই করেছিলেন। ফলে, সমর্থিত হয়েছিল হীরজীলের এক্সপেরিমেণ্ট এবং প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে পারমাণবিক বিজ্ঞান বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছে।

১৯৫৮ সালে সুইজারল্যাণ্ডের ইন্সটিটিউট জেনেভয়স-য়ে বিস্তর বৈজ্ঞানিকের সামনে বারাঙ্গার উপস্থাপিত করেন তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল।

১৯৫৯ সালে 'সায়েন্স এট ভাই'য়ের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিশ্বাস করতেই হবে যে উদ্ভিদরা অ্যালকেমিস্টদের গুপ্তরহস্য জানে। প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনেই তারা মৌলিক পদার্থদের রূপান্তর করে চলেছে।

১৯৬৩ সালে অকাট্যভাবে বারাঙ্গার প্রমাণ করে দিলেন যে ম্যাঙ্গানিজ সল্ট সলিউশনে মটরশুঁটি বীজের অংকুরণ ঘটালে ম্যাঙ্গানিজ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তার বদলে আবির্ভূত হয় লোহা। প্রক্রিয়াটার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে দেখলেন অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে চন্দ্রকলার প্রভাবও আছে রূপান্তরকরণের ক্ষেত্রে।

বারাঙ্গারের গবেষণার গুরুত্ব বোঝা যাবে নিউক্লিয়র সায়েণ্টিস্টদের বক্তব্য থেকে। এ'রা বলেন, মৌলিক পদার্থদের স্থায়িতা বজায় রাখতে গেলে যে বিপুল সংলগ্নীকরণ শক্তি'র প্রয়োজন, অ্যালকেমিস্টরা তা উৎপাদন করতে অক্ষম বলেই এক মৌলিক পদার্থকে আরেক মৌলিক পদার্থতে রূপান্তর করতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও কিন্তু উদ্ভিদরা নিরবচ্ছিন্নভাবে মৌলিক পদার্থ রূপান্তরকরণ করে চলেছে এমন কৌশলে যার হদিশ বিজ্ঞান আজও পায়নি—বৃহৎ এই কর্মকাণ্ডের জন্য আধুনিক পরমাণু চূর্ণীকরণের মেশিনের দরকারই হচ্ছে না। ঘাসের হিলহিলে পাতাও যে কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে, তা নিউক্লিয়র পদার্থবিদ নামক ইদানীংকালের অ্যালকেমিস্টরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

বারাঙ্গার বলেছেন, কিছু উদ্ভিদ শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য মৌল সৃষ্টি করতে পারে। এই থেকেই আবার পারমাণবিক বা সাবঅ্যাটমিক রূপান্তর-করণের উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে যার নকল আমরা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকা ছাড়া ল্যাবোরেটরীতে করতে অপারগ। উদ্ভিদ থেকে অ্যালকালয়েড এবং অন্যান্য যে সব জিনিস নিষ্কাষণ করি, সাধারণ তাপমাত্রায় তাদের সংশ্লেষণ করাও সম্ভব নয় ল্যাবোরেটরীতে।

কারভ্র্যান জমি নিয়ে পড়েছিলেন বলে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে তাজ্জব হয়ে গেছিলেন। ১৯৬০ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত 'ম্যাগনেসিয়াম অ্যাণ্ড লাইফ' বইটায় তিনি পড়েছিলেন, যে জমিতে শস্য-চাষ হয়, সে-জমির ম্যাগনেসিয়াম নিয়ে নেয় উদ্ভিদ। সেক্ষেত্রে হাজার হাজার বছর ধরে কৃষিকাজের পর জমিগুলো ম্যাগনেসিয়াম-শূন্য হয়ে যেত। কিন্তু সারা পৃথিবীর কোথাও তা হয়নি—উর্বরতা কমেনি। এর কারণ, উদ্ভিদ ক্যালসিয়াম থেকে ম্যাগনে-সিয়াম, নাইট্রোজেন থেকে কার্বন বানিয়ে নিচ্ছে—জমির যা প্রয়োজন, তা ঠিক জুগিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়কর, নয় কী?

১৯৬২ সালে কারভ্র্যান তাঁর 'জৈবিক রূপান্তরপ্রাপ্তি' বইখানা প্রকাশ করেন। এর পরেও আরও কয়েকখানা বই লিখে সজীব প্রাণীদের নতুন একটা দিক তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। পরিষ্কার বলেন, যাঁরা কৃষিকার্যে কেবলমাত্র রসায়ন-শাস্ত্রের দিকটাই ভাবছেন, তাঁরা কঠোর আঘাত প্রাপ্তির জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন। রসায়নবিদ্-নির্দিষ্ট খাদ্য খেয়ে মানুষ আর পশু বেশীদিন টি'কে থাকবে না। ল্যাভয়সার যা বলেছেন, তা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় পর্যন্ত নির্ভুল, কিন্তু সজীব জীবের সমস্ত ক্রিয়াই রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক ভুলটা এইখানেই। তাহলে তো প্রাণ জিনিসটাকেও রাসায়নিক বলে মেনে নিতে হয়। বস্তুর জৈবিকধর্ম অপর্যাপ্তভাবে নিরূপিত হয়ে আসছে রাসায়নিক বিশ্লেষণ মারফৎ।

'বস্তুর প্রকৃতি' গ্রন্থে রুডল্ফ্ হউস্চকা হীরজীল এবং কারভ্র্যানের

আইডিয়াকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। প্রাণকে রসায়নের মাধ্যমে বুঝতে গেলে বিরাট ভুল করা হবে। প্রাণ নিছক কয়েকটা মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয়নি—হয়েছে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির আগেই। বস্তু হল প্রাণের তলানি। বস্তুর আগে প্রাণ, কে জানে তা চিরন্তন আধ্যাত্মিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কিনা ?

স্টাইনারের 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে'র সমর্থক হউস্চকা বলেছিলেন, মৌলিক পদার্থ বলতে আমরা যা বুঝি, তা তো মড়ার দল, প্রাণ-আকৃতির অবশিষ্টাংশ। উদ্ভিদ থেকে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আর কার্বন বার করতে পারেন যে কোনো কেমিস্ট, কিন্তু এই সব বা অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে উদ্ভিদ তৈরী করতে পারেন না। যা বেঁচে আছে, তা মারা যেতে পারে। মড়া কখনো সৃষ্ট হয় না।

হীরজীলের এক্সপেরিমেণ্ট অনুকরণ করে হউস্চকা দেখিয়েছিলেন, বস্তুহীন পরিবেশে উদ্ভিদ যেমন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক তেমনি বস্তুকে ফের আকাশিক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে স্পন্দিত লয়ে—প্রায়শঃ চন্দ্রকলার সঙ্গে যোগসাজসে।

সত্তর বছর বয়েসে প্যারিসে কারভ্রান উদ্ভিদসংক্রান্ত বেস্টসেলার গ্রন্থের (সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যাণ্টস্) যুগ্ম লেখককে বলেছিলেন, শক্তিশালী এনার্জি-সমূহ সক্রিয় রয়েছে বীজ অংকুরণের ক্ষেত্রে—এই শক্তিবর্গই এনজাইম সংশ্লেষণ ঘটাচ্ছে সম্ভবতঃ বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে—নিজেদের মধ্যেই। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা যদিও বলেন, কেবলমাত্র উষ্ণতা আর জল বীজ-অংকুরণে প্রয়োজন হয়, কারভ্রান বলেন এর পেছনে আছে চান্দ্রশক্তিসমূহ।

'যেহেতু আমরা একটা ব্যাপার জানি না, সুতরাং তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়,' বলেছিলেন কারভ্রান।

ঠিক এই ধরনের কথা ধ্বনিত হয়েছিল নাস্তিকগুরু চার্বাকের একটি সভায়। জ্ঞানীগুণীদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ঈশ্বর অনস্তিত্ব। পণ্ডিতরা যখন মাথা হেঁট করে বসে, তখন একটি বালক উঠে দাঁড়িয়েছিল। চার্বাক সস্নেহে তার গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। নামটা বলেছিল বালক। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করেছিল—'আপনি চেনেন ?' চার্বাক বলেছিলেন—'বৎস, পৃথিবীতে অনেক গ্রাম আছে। সব কি চেনা সম্ভব ?' উজ্জ্বল মুখে ছেলেটি বলেছিল—'ঈশ্বরও তেমনি আছেন, জানেন না।' চার্বাক স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন।

কারভ্রান বলেছিলেন, রুডলফ্ স্টাইনার যে মহাজাগতিক আকাশিক শক্তি-সমূহের উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয় তার অস্তিত্ব আছে। তা না হলে কিছু উদ্ভিদ

কেবল বসন্তকালেই অংকুরিত হয় কেন ? বছরের অন্য সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে জলও তাপ দিলেও তাদের অংকুরোদ্গম ঘটে না। কয়েক ধরনের গম অংকুরিত হয় যখন দিন বড় হয়ে যায়—দিনগুলোকে কৃত্রিম আলো দিয়ে বড় করলেও অংকুরিত হয় না।

বস্তু আসলে কী আমরা তা জানি না। প্রোটিন অথবা ইলেকট্রন কি দিয়ে নির্মিত, আমরা জানি না। এই শব্দগুলো কেবল আমাদের অজ্ঞতাকে ঢেকে রেখেছে। পারমাণবিক কেন্দ্রনের মধ্যে নিশ্চয় এমন শক্তিসমূহ এবং তেজঃপুঞ্জ আছে যাদের প্রকৃতি এবং ধর্ম একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নিম্ন শক্তিশালী মৌলদের রূপান্তর প্রাপ্তির ব্যাখ্যা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের শক্তিশালী পারস্পরিক বিক্রিয়া মাধ্যমে করা যাবে না—এর কারণ অন্বেষণ করতে হবে অতি-দুর্বল পারস্পরিক বিক্রিয়া ক্ষেত্রে—যে ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন খাটে না। কথাগুলো পদার্থ-বিজ্ঞানী কারভ্র্যানের।

উত্তাপের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি, তড়িৎশক্তি প্রভৃতি যে-সব বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় তার নিয়ম ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় গাণিতিক বিজ্ঞানের নাম থার্মোডাইনামিক্স। এই বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে কোনো স্ব-নির্ভর নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শীতল দেহ থেকে উত্তপ্ত দেহে উত্তাপ চালান হতে পারে না। কিন্তু এই নিয়ম নস্যাৎ করে দিয়ে-ছিলেন উইলহেল্‌ম্‌ রাইক। অ্যাকুমুলেটরে এনার্জি (যাকে তিনি বলতেন 'অরগন') সংগ্রহ করার পর দেখা গিয়েছিল অ্যাকুমুলেটরের শীর্ষদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও দেখেছিলেন এক্সপেরিমেণ্টটা। কিন্তু ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেন নি। রাইককে উন্মাদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

রাইক কিন্তু অটল ছিলেন নিজের বিশ্বাসে। অরগন এনার্জি থেকেই বস্তু সৃষ্ট হচ্ছে, এ বিশ্বাসে চিড় খায় নি। আণবিক সংযোগ সাধনের সময়ে তাপ শক্তির উৎপাদন ঘটে। অ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার পরমাণু বিভাজন অথবা পরমাণুর একত্র মিলনের সময়ে প্রলয়ংকর শক্তির কথা কে না জানে। কিন্তু জৈবিক রূপান্তরকরণের সময়ে ফ্যানট্যাসটিক এনার্জি কেন নির্গত হয় না, আজও তা অব্যাখ্যাত।

'সায়েন্স এট ভাই' পত্রিকায় লেখা হয় যদি প্লাজমা-ধরনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বোমায়, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে এবং নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হত, রিঅ্যাকশনটা হত একেবারে অন্য ধরনের—ঠিক যে ধরনের রিঅ্যাকশনের ব্যবহার করে প্রাণ অদ্ভুতরকম চুপচাপ অবস্থায়। ধরা যাক একটা সিন্দুকের ডালা খুলতে হবে। ডিনামাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে, অথবা, নম্বরীতালা ঘুরিয়ে খোলা যেতে পারে। পারমাণবিক কেন্দ্রন যেন একটা তালা। অন্ধশক্তি প্রয়োগের

সময়ে গোঁয়ারগোবিন্দ—কিন্তু কুশলী কারিগরের হাতে সহজেই খুলে যায়! প্রাণের শক্তি ও তালা কারিগরের হাতে সহজেই ধরা দেয়। মানুষ যেখানে ডিনামাইট প্রয়োগ করে, উদ্ভিদ এবং জীব নম্বরীতালা খোলার গুপ্তরহস্য দিয়ে শক্তিকে নিঃশব্দে বার করে নেয়।

কারভ্র্যানের কৌতূহল আছে আরও একটি ব্যাপারে। অতি-ক্ষুদ্র জীবরা বালি গ্রহণ করে তাকে উর্বরা করতে প্যারে কী? জৈব বস্তু থেকে পচা সারের উদ্ভব। কিন্তু এক সময়ে তো পৃথিবীতে জৈব বস্তু ছিল না।

এই ধারণা থেকেই প্রশ্ন উঠেছে ডক্টর উইলহেল্‌ম্‌ রাইক সঠিক আবিষ্কারের পথে চলেছিলেন কিনা। উনি লক্ষ্য করেছিলেন আণুবীক্ষণিক শক্তিসমন্বিত কোষ (বায়ন) সজীব নয়, কিন্তু 'জৈবিক শক্তি বহন' করে। যথেষ্ট উষ্ণতাপ-মাত্রায় রাখলে এবং ফুলে উঠতে দিলে, সব বস্তুই, এমন কি বালিও, কোষগত ভাঃ চোরের মধ্যে গিয়ে পড়ে— পরিণামে পাওয়া কোষগুলো ব্যাকটেরিয়া আকারে জন্মাতে পারে।

ফ্রান্সের নামী অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নিয়ে এখন সংকল্পদৃঢ় অ্যালকেমিস্টের কর্মজীবন বেছে নিয়েছেন কারভ্র্যান। ওঁর মতে, একটা নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটা অক্সিজেন পরমাণুর মিলনের মত বিশুদ্ধ রাসায়নিক বিক্রিয়া কেবল টেস্ট-টিউবেই অনুষ্ঠিত হবে কেন বিপুল চাপ আর তাপের মধ্যে? সজীব প্রাণীরা সেই একই কাজ করতে পারে সাধারণ তাপমাত্রায়। হয়ত এনজাইমরা আছে এর মূলে।

'অ্যালকেমি ঃ স্বপ্ন না বাস্তব?' নামক বর্ষপঞ্জীটা প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সে। কারভ্র্যান তাতে লেখেন, অতি-ক্ষুদ্র জীবরা আসলে ঘনীভূত এনজাইম। মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রনে তার মূলগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

পিরিয়ডিক টেব্‌লের প্রথম কুড়িটি মৌলের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ রূপান্তরকরণ দেখা গেছে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনকেও যেন দলে টেনেছে। একটা হাইড্রোজেন প্রোটিন লাগিয়ে পটাশিয়ামকে ক্যালসিয়াম করা যায়।

কারভ্র্যান আশা করেন সজীব দেহে পরমাণুর গঠন রদবদল করতে পারে এনজাইম এবং এই ব্যাপার ঘটে পারমাণবিক কেন্দ্রনের মধ্যে। রসায়ন-বিজ্ঞানের আওতার বাইরে নতুন বিজ্ঞানের সূচনা ঘটতে পারে এই কারণেই।

জৈবিক প্রাণেই এই পরমাণু বিভাজন হয়ে চলেছে বলে মাটির ভারসাম্য রক্ষার মূলে রয়েছে অতি-ক্ষুদ্র জীব জগৎ।

কারভ্র্যানের মতে কিছু রূপান্তরকরণ জৈবিকভাবে উপকারী, কিছু বিপজ্জনক। ঢালাও কৃত্রিম সার প্রয়োগে উদ্ভিদের পক্ষে যে মৌল প্রয়োজন, তার হেরফের ঘটে যায়।

পটাসিয়াম সার যদি না ও পাওয়া যায়, অতি-ক্ষুদ্র জীবাণু দিয়ে ক্যালসিয়াম থেকে পটাসিয়াম বানিয়ে নেওয়া যাবে। খমিজ এবং পেনিসিলিনের ছত্রাক যদি ব্যাপকভাবে কারখানায় উৎপাদিত হয়, মৌলিক পদার্থ রূপান্তরকরণের জন্য অতি-ক্ষুদ্র জীবজগৎকে কারখানায় উৎপাদন করা যাবে না কেন? ১৯৬০ সালের শেষের দিকে ডক্টর হাওরার্ড ওর্নে নিউজার্সিতে 'এনজাইম ইনকরপোরেটেড' কারখানা চালু করেছিলেন। স্ট্রনসিয়াম-৯০ দিয়ে অতি-ক্ষুদ্র জীবজগৎকে বম্বার্ড করে বিকৃত (মিউটেশন) করেছিলেন এবং এনজাইম উৎপাদন করে বাজে কার্বন থেকে কাজের কার্বন বানিয়ে নিয়েছিলেন—অতি-ক্ষুদ্র জীবগণ শুধু একটা মৌলিক পদার্থ হজম করে আর একটা মৌলিক পদার্থ বার করে দিয়েছিল পুরীষের সাথে।

বৃটিশ মাটি সমিতির কয়েকটি বুলেটিন পড়ে কারভ্র্যান দেখেছেন, তাঁর জৈবিক রূপান্তরকরণ তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছে। একটা জমিতে ফরফরাসবিহীন কম্পোস্ট সার দেওয়া হয়েছিল। আর একটায় ফসফরাসসমৃদ্ধ খামার বাড়ীর সার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম জমির নমুনায় একবছর পরে পাওয়া গেছিল ৩১৪ মিলিগ্রাম ফসফরাস, দ্বিতীয়টায় ২০৫ মিলিগ্রাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাইরে থেকে ফসফরাস না দিয়েও প্রথম জমিতে বেশী ফসফরাস উৎপাদিত হয়েছে। একেই বলে জ্যান্ত মাটির অলৌকিক কাহিনী!

কারভ্র্যানের তৃতীয় গ্রন্থ 'লা এনার্জি ট্র্যান্সমিউটেশন' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। সমালোচনা করতে গিয়ে প্যারিস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ফুরোন লিখেছিলেন, প্রকৃতি যে ক্যালসিয়াম থেকে ম্যাগনেসিয়াম (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বিপরীত-ও), সোডিয়াম থেকে পটাসিয়াম সৃষ্টি করতে পারে এবং কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস গ্রহণ না করে কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হতে পারে—এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীরা প্রথম গুরুত্ব দেন কারভ্র্যানের গবেষণায়। তাঁর বই 'জৈবিক রূপান্তরপ্রাপ্তি'র জাপানী অনুবাদ পড়ে বিজ্ঞানের প্রফেসর হিসাতোকি কোমাকাই আঁচ করেছিলেন প্রাচ্যদেশের ব্রহ্মান্ডবাদের সঙ্গে কারভ্র্যানের গবেষণালব্ধ ফলাফলের যোগসূত্র আছে। চিঠি লিখে কারভ্র্যানকে বলেছিলেন, সোডিয়ামের (yang মৌল) পটাসিয়াম (yin মৌল) হয়ে যাওয়ার মধ্যে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে জাপানে পটাশ কম আছে, কিন্তু সামুদ্রিক লবণ আছে অঢেল।

শিক্ষকতা ত্যাগ করলেন কোমাকাই, একটা ইলেকট্রিক কোম্পানীর ডিরেক্টর হয়ে বসলেন। বিবিধ অতি-ক্ষুদ্র জীব, জীবাণু, দু-ধরনের খমিজ আর ছত্রাক নিয়ে সোডিয়াম থেকে তিনি পটাসিয়াম বানিয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। বাজারে

বিক্রীও করেছিলেন।

কারভ্র্যানের কাজ সোভিয়েত দেশেও প্রেরণা জোগাচ্ছে। ১৯৭১ সালে প্রফেসর ডুপ্রভ চিঠি লেখেন তাঁকে। বলেন যে জৈবিক রূপান্তরকরণে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র বড় ভূমিকা নিতে পারে।

১৯৭১ সালে 'প্রকৃতির মধ্যে রূপান্তরকরণের সমস্যা' শীর্ষক একটা বই ছাপা হয় আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্রের রাজধানীতে। এই বইতে লেনিনের একটা উদ্ধৃতি ছিল—'ভারহীন ইথার ভারযুক্ত বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে, সহজাত বুদ্ধিতে তা যতই অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, বিষয়টা ডায়ালেকটিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম-য়ের আরও একটা সমর্থন'।

বইটতে কোরোলকোভ লিখিত প্রবন্ধে জানা গেছিল লেখক কিভাবে সিলিকনকে অ্যালুমুনিয়ামে রূপান্তর করেছেন।

ইথারও উৎপাদন করা সম্ভব, লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে সোভিয়েতবিজ্ঞানীদের কৌতূহল জাগ্রত করার প্রচেষ্টা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

কারভ্র্যানের বইয়ের আমেরিকান সংস্করণের সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিজ্ঞানী ওয়ালজাক বলেছিলেন, কয়েক-শ বছর ধরে 'সোনা'র জন্যে হন্যে হয়েছেন অ্যালকেমিস্টরা, সীসাকে সোনা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন সেই গুপ্তরহস্যই শেষ পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ-জীবন লাভের গুপ্তরহস্য হয়ে দাঁড়াবে।

উদ্ভিদের প্রাণঃজ্যোতি

ইংরেজ Y অক্ষরের মত লাঠি বা শিকের সাহায্যে মাটির তলায় খনিজসম্পদ, জল, হারিয়ে যাওয়া বস্তু বা ভবিষ্যৎ জানবার প্রাচীন বিদ্যেকে বলে ডোউজিং। পেণ্ডুলামও ব্যবহার করা হয়। চীন, হিন্দু, মিশরীয়, পারসিক, মিডিজ, ইট্রাসকান্স, গ্রীক এবং রোমানরা এই বিদ্যে জানতেন।

আদ্রে সিমেনোটন নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই পদ্ধতি দিয়ে কোন খাবার খারাপ আর কোনটা ভাল, তা নির্ণয় করতে শিখেছেন।

ডোউজিংকে বিজ্ঞান-স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি আমেরিকায়। ফ্রান্সে ডোউজিংকে আর ডাকিনী-বিদ্যা বলে তাচ্ছিল্য না করলেও এক ফ্রেঞ্চ ডোউজারকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এই বিদ্যে রপ্ত করার সাজা স্বরূপ। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে চ্যাটেলেট নামে এক সম্ভ্রান্ত পুরুষ সস্ত্রীক জেলখানায় মারা গেছিলেন ডোউজিংয়ের অপরাধে। অথচ ইনি কয়েক-শ লাভজনক খনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ফ্রান্সে খনি-অধ্যক্ষের আশ্বাস শুনে। এই মোকদ্দমায় বহু ডাক্তারকেও কাঠগড়ায় টেনে আনা হয়েছিল। তাঁরা নাকি বহু দুরারোগ্য রোগ ডোউজিং দ্বারা নিরাময় করতেন।

পাদরীদের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে ডোউজিং কিন্তু আর ডাকিনী বিদ্যা নয়— নিষিদ্ধও নয়।

বিজ্ঞান-মহলও ডোউজিংকে একটু একটু করে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ফ্রান্সের নামকরা পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর রোকার্ড নিজে ডোউজার হিসেবে প্রশংসাধন্য হয়েছেন। তাঁর ডোউজিং-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থটি ইংরেজিতে আজও অনূদিত না হলেও রাশিয়ায় হয়েছে এবং সেখানকার ভূতত্ত্ববিদ্‌রা সম্প্রতি ডোউজিংয়ের দৌলতে হেলিকপ্টার আর এরোপ্লেন থেকে ভূগর্ভস্থ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং খনিজ সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

'রেডিয়েসথেসি' শব্দটা ডোউজিংয়ের আদি নাম। গ্রীকভাষায় যার মানে 'সংবেদনশীলতা', ল্যাটিন ভাষায় 'বিকিরণ'। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বর্ণালীর পরপারস্থিত বিকিরণ সন্ধানই ডোউজিংয়ের মূল লক্ষ্য। প্যারিসের একটা গলিতে 'মেসন দ্য রেডিয়েসথেসি' নামে একটা কিউরিয়সিটির দোকান এখন ডোউজিং বিদ্যার্থীদের মক্কা বলা যেতে পারে।

এই দোকানে ধূলিধূসরিত তাকে পাওয়া যাবে ডোউজিং সংক্রান্ত যাবতীয় বই। জলের জন্য, বস্তুর জন্য, এমন কি স্বাস্থ্যের জন্যও ডোউজিং যে ব্যক্তি করতে চায়, এই গ্রন্থখানি তার কাছে স্বর্গসম। এ সব বই লিখেছেন শ্রদ্ধেয় যাজক, সম্ভ্রান্ত কাউণ্ট এবং বিখ্যাত চিকিৎসকরা।

তামা আর আবলুষকাঠ নির্মিত দেরাজে সারি সারি সাজানো আছে পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে সংগৃহীত বিবিধ ডোউজিং যন্ত্র। কোনোটার উদ্দেশ্য বিকিরণকে আটকে দেওয়া, কোনোটার উদ্দেশ্য বাড়িয়ে দেওয়া। কোন্ বিকিরণ বিষাক্ত, কোন্ বিকিরণ স্বাস্থ্যকর—এই সব যন্ত্রপাতিই তা বলে দেবে। আকারে তারা বিভিন্ন—কিন্তু মূল সূত্রটা সর্বত্রই এক—সহজ সরল একটা পেণ্ডুলাম। হাতীর দাঁত, জেড পাথর, আটকোনা কোয়ার্জ বা ক্রস্ট্যাল—বিবিধ বস্তু দিয়ে নির্মিত হলেও বলা হয় যে কোনো সুতো বা চেনে যে কোনো ওজন ঝোলালেও কাজ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক উপদেষ্টা ডক্টর হার্ভালিক নিজে পেশাদার পদার্থবিদ্ হয়েও চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এখন ডোউজিং তত্ত্বকে পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা ভাবছেন। আমেরিকার ডোউজার্স সোসাইটির গবেষণা কমিটির প্রধান তিনি। তাঁর লক্ষ্য ডোউজিং যে হাতুরে বিদ্যা, পঞ্চাশ বছরের এই ভ্রান্ত ধারণা নস্যাৎ করা।

ভার্জিনিয়ার নিজের বাড়ীতে অনেক নিখুঁত পরীক্ষা করে হারভালিক দেখিয়েছেন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়শনের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে ডোউজারদের। যেমন আছে এ-সি এবং ডি-সি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রতি—

সেকেণ্ডে এক থেকে দশলক্ষ সাইক্‌ল্‌ ফ্রিকোয়েন্সিতে।

ডোউজিং যে কেবলমাত্র জল বা চৌম্বকক্ষেত্রের ক্রমোচ্চতার সন্ধান দেয়, তা ঠিক নয়। ডোউজিং 'সব কিছু'ই খুঁজে দেয়। আমেরিকান ডোউজার্স সমিতির প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট একবার একটা বিরাট দোতলা বাড়ীর মধ্যে লুকানো বেতনের একটা চেক খুঁজে বার করেছিলেন ডোউজিং মারফৎ।

পোর্টল্যাণ্ডের রিসার্চ কেমিস্ট ম্যাকলিয়ন তাঁর ডোইজিং রড মারফৎ ঠিক জানতে পারেন কখন দিগন্তে আবির্ভূত হচ্ছে তেলভর্তি জাহাজ—টুরিস্টকে ঠিক সেই সময়ে নিয়ে যান লাইটহাউসে।

সম্ভবতঃ আমেরিকার সবচেয়ে খ্যাতনামা ডোউজার হলেন হেনরী গ্রস, যাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে তিনখানা বই লিখেছিলেন আমেরিকার ঐতিহাসিক উপন্যাসকার কেনেথ রবার্ট্‌স্‌ ১৯৫০ সালে।

ফরাসী পাদরীদের মত গ্রসও মানচিত্রের ওপর ডোইজিং রড বুলিয়ে বলে দিতেন কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে জল পাওয়া যাবে। বৃটিশ শাসিত বার্মুডা দ্বীপে যে-অঞ্চলে কখনো জল পাওয়া যায়নি, সেখানেও জলের সন্ধান বাতলে দিয়েছিলেন গ্রস সামনে ম্যাপ খুলে ধরে।

পদার্থবিদ্‌ হারভেলিক এবং পদার্থবিজ্ঞানীরা ম্যাপ-ডোউজিংয়ের রহস্য ধরতে পারেন নি। ম্যাপে তো আর ম্যাগনেটিক ক্রমোচ্চতা নেই—সেটা সম্ভব ফিল্ড ডোউজিংয়ে।

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-য়ের র‍্যাক্সফোর্ড ড্যানিয়েল্‌স্‌-য়ের দৃঢ় ধারণা ব্রহ্মাণ্ডে এমন সব শক্তি আছে যা ধীমান, এবং জবাব জুগিয়ে দেয়। যে ফ্রিকোয়েন্সিতে এই সব শক্তি সক্রিয়, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের সঙ্গে তার সংযোগ নেই। মন দিয়ে সংযোগস্থাপন করতে পারে কেবল মানুষ। ডোউজিং একটা অতীব প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। যদিও তার সংজ্ঞা সঠিকভাবে আজও নির্ণীত হয়নি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক নির্গমন সংক্রান্ত পঁচিশ বছর গবেষণার পর ড্যানিয়েল্‌স্‌ এই কথা বলেন।

তরতাজা প্রাণশক্তিসম্পন্ন খাদ্য-বাছাইয়ের বিশেষ পদ্ধতিটা ইঞ্জিনীয়ার সিমোনেটন শিখেছিলেন ফরাসী আঁদ্রে বোভিসের কাছে। পিরামিড গবেষণায় নাম করেছিলেন বোভিস। মৃত পশু পিরামিডের মধ্যে রহস্যজনকভাবে শুষ্ক এবং ম্যমী হয়ে যায়, তিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন—বিশেষ করে তলা থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত উচ্চতার এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় যদি রাখা যায়—যেখানে থাকে রাজকক্ষ।

বোভিসের মূল থিওরী হল এই ঃ পৃথিবীর পজিটিভ ম্যাগনেটিক কারেণ্ট প্রবাহিত রয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে ; পূব থেকে পশ্চিমে প্রবহমান নেগেটিভ

ম্যাগনেটিক কারেণ্ট। ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তুদেহ এই কারেণ্ট গ্রহণ করতে পারে এবং উত্তর-দক্ষিণে যে কোনো বস্তু রাখলেই তা মোটামুটি মেরুপ্রবণ হবে— কিছুটা নির্ভর করবে আকার এবং ঘনত্বর ওপর। নরদেহে এই কারেণ্ট এক পা দিয়ে ঢুকে বিপরীত দিকের হাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেই সাথে পৃথিবীর উপরস্থ কসমিক কারেণ্ট মাথা দিয়ে ঢুকে অন্য হাত আর পা দিয়ে বেরিয়ে যায়। খোলা চোখ দিয়েও বেরিয়ে যায় এই সব কারেণ্ট।

বোভিস বলেন, সব বস্তুদেহই এই কারেণ্ট সঞ্চয় করতে পারে এবং ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে পারে। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বস্তুগত অন্যান্য ম্যাগনেটিক ফোর্সের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে ডোউজারের হস্তধৃত পেণ্ডুলামকে দুলিয়ে দিয়ে যায়। এইভাবেই নরদেহ কনডেনসারের ধর্ম নিয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-সমূহকে বাছাই, নির্ণয় এবং বিবর্ধিত করতে পারে। গ্যালভানির এনিম্যাল ইলেকট্রিসিটির মধ্যাবস্থা এই ডোউজিং প্রক্রিয়া।

প্রাচীন মিশরীয়দের অনুকরণে লাল এবং বেগুনী সিল্ক-সুতোয় ঝুলন্ত ধাতুর সূচ্যগ্র বিন্দু সমন্বিত কৃস্ট্যাল পেণ্ডুলাম বানিয়েছিলেন বোভিস। এর নাম দিয়েছিলেন 'প্যারাডায়াম্যাগনেটিক'। লাল আর বেগুনি সুতো পেণ্ডু-লামের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিত। কেন না, লাল আলোর কম্পন লোহার পারমাণবিক কম্পনের সমান (লোহাকে তিনি বলতেন প্যারাম্যাগনেটিক—যা চুম্বকে আকৃষ্ট হয়)—বেগুনি আলোর কম্পন কিন্তু তামার পারমাণবিক কম্পনের সমান (তামাকে বলতেন ডায়াম্যাগনেটিক—চুম্বক যাকে ঠেলে দেয়)।

এই পেণ্ডুলাম দিয়েই বোভিস বিভিন্ন খাদ্যের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি এবং সমানুপাতিক তাজা অবস্থা বলে দিতে পারতেন কেবল মাত্র খাদ্যের খোসার মধ্যে নিহিত বিকিরণ ক্ষমতা বিচার করে। বিভিন্ন খাদ্যের প্রাণঃপুঞ্জের বিকিরণ ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপের জন্য একটা 'বায়োমিটার'ও বানিয়েছিলেন বোভিস। জিনিসটা একটা স্কেল—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত—শূন্য থেকে দশ হাজার অ্যাঙ্গস্ট্রম পর্যন্ত। অ্যাঙ্গস্ট্রম একটা দৈর্ঘ্য একক, যা দিয়ে আগে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং আন্তঃআণবিক দূরত্ব মাপা হত।

ফল, সব্জী বা যে কোনো খাবার এই স্কেলের এক প্রান্তে রেখে বোভিস দেখতেন পেণ্ডুলাম কতদূর পর্যন্ত দুলে এল। সেই মাপটাই খাদ্যের প্রাণশক্তির মাত্রা বলে বোঝা যেত।

মাংস, পাস্তুরাইজড্ দুধ আর অতি-রন্ধিত সব্জীতে ২০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রমের বেশী বিকিরণ পাওয়া যায়নি—পেণ্ডুলামকে বেশী দোলাতে পারেনি। এনার্জির অপ্রতুলতার জন্যই তা হয়েছে।

তড়িৎ এবং বেতার-বিজ্ঞান ভালভাই জানতেন সিমোনেটন। তাই বোভিসের

কথাগুলো উড়িয়ে দিতে পারেননি। বোভিসের পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখলেন, টাটকা দুধের অ্যাঙ্গস্ট্রম হ'ল ৬.৫ হাজার। কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে হারায় শতকরা চল্লিশভাগ বিকিরণ, চব্বিশঘণ্টা পরে শতকরা নব্বইভাগ। পাস্তুরাইজ করলে মারা যায় সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। পাস্তুরাইজ করা ফল এবং সব্জীর ক্ষেত্রেও দেখেছেন একই ব্যাপার।

শুষ্ক ফলের প্রাণশক্তি কিন্তু অব্যয় থাকে। চব্বিশঘণ্টা ভিজোনোর পর টাটকা ফলের মত প্রাণঃজ্যোতি বিকিরণ করে। টিনের খাবার থাকে একেবারে মৃত অবস্থায়। জল নিজে সাধারণ বিকিরণ নির্গমনে অক্ষম; কিন্তু মাধ্যম হিসেবে বিচিত্র ক্ষমতাসম্পন্ন। খনিজ, উদ্ভিদ বা মানুষের সংস্পর্শে এলেই প্রাণশক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিছু জল ১৪,০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রম পর্যন্ত বিকিরণ করে। জাঁ মার্তা একজন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি। জন্ম চেকোস্লোভাকিয়ায়। ওঁর বিশ্বাস আপেল এবং অন্যান্য ফল বা সব্জীর শাঁস সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখলে স্বাস্থ্যকর কম্পন জলে চলে যায় এবং সেই জল পান করলে শাঁস খাওয়ার চাইতে বেশী উপকার হয়।

সিমোনেটন এই সম্পর্কে Radiations des Aliments গ্রন্থে লিখেছিলেন, খাদ্যকে চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে থাকছে সেইসব খাদ্য যাদের বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬.৫ অ্যাঙ্গস্ট্রম থেকে শুরু করে দশ হাজার কি তারও বেশী। এই শ্রেণীতে পড়ে বেশীর ভাগ ফল—পক্কাবস্থায় যারা থাকে আট থেকে দশ হাজারের মধ্যে। অধিকাংশ টাটকা সব্জীও এই শ্রেণীতে পড়ে—কিন্তু বাজারে যখন পৌঁছোয়, এক তৃতীয়াংশ গুণবত্তা বিনষ্ট হয়, বাকী একতৃতীয়াংশ নষ্ট হয় রান্না করার সময়ে।

সিমোনেটন বলেন, অতি-বেগুনি এবং অতি-লোহিত মধ্যবর্তী সৌরবিকিরণে ভরপুর থাকে ফল। পাকলে প্রাণঃজ্যোতি তুঙ্গে পৌঁছোয়—পচনের সময়ে শূন্য অবস্থায় আসে। কলা গাছ থেকে পাড়বার পর চব্বিশ দিন পরে পচে যায়—কিন্তু খাদ্য হিসেবে স্বাস্থ্যকর থাকে মোটে আটদিন। হলদে অবস্থায় সবচেয়ে বেশী কম্পন নির্গত হয়, কাঁচা অবস্থায় কম, কালো হয়ে গেল সবচেয়ে কম। কাঁচা অবস্থায় সব্জী খাওয়া উচিত—প্রাণঃজ্যোতি তখন থাকে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ঠিক বিপরীত ঘটে আলুর বেলা। কাঁচা অবস্থায় থাকে দু হাজার অ্যাঙ্গস্ট্রম, সেদ্ধ করলে সাত হাজার। সেঁকলে ন হাজার। কন্দ, ওল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাই। মটরশুঁটি জাতীয়দের টাটকা অবস্থায় থাকে সাত থেকে আট হাজার, শুকোলে অনেক কমে যায় প্রাণঃজ্যোতি। গুরুভার এবং দুষ্পাচ্য হয়ে গিয়ে যকৃতে চাপ সৃষ্টি করে। গমের অ্যাঙ্গস্ট্রম ৮.৫ হাজার, রান্না করলে ন হাজার। অলিভ অয়েলের উৎকৃষ্ট প্রাণঃজ্যোতি ৮.৫ হাজার এবং

অতিশয় স্থায়ী। ছ-বছর পরেও ৭˙৫ হাজার অ্যাঙ্গস্ট্রম পাওয়া যায়। মাখনে আট হাজার, কিন্তু দশ দিন পর থেকে বিকিরণ কমে, নিম্নমাত্রায় পেঁছোয় বিশ দিন পরে। সামুদ্রিক মাছ আর শামুক অত্যন্ত ভাল খাদ্য—উজ্জ্বল প্রাণঃজ্যোতির পরিমাণ সাড়ে আট থেকে ন'অ্যাঙ্গস্ট্রম—বিশেষ করে টাটকা যদি খাওয়া যায়; এর মধ্যে কাঁকড়াও পড়ে। মিষ্টি জলের মাছের প্রাণঃজ্যোতি অনেক কম।

সিমোনেটনের দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যতালিকায় পড়ে তিন থেকে সাড়ে ছ-হাজার অ্যাঙ্গস্ট্রম বিকিরিত খাদ্য। এর মধ্যে আছে ডিম, বাদাম তেল, সুরা, সিদ্ধ সব্জী, আখের চিনি এবং রান্না করা মাছ। কফি, চকোলেট, স্পিরিট এবং পাস্তুরাইজ করা ফলের রসে কোনো প্রাণঃজ্যোতিই নেই বলা চলে—সেদিক দিয়ে সুরা (ওয়াইন) অনেক ভাল—যার অ্যাঙ্গস্ট্রম চার থেকে পাঁচ হাজার। রিফাইন করলে টাটকা সুগার-বীটের অ্যাঙ্গস্ট্রম সাড়ে আট হাজার থেকে এক হাজারে পেঁছোয়।

মাংসের ক্ষেত্রে একমাত্র টাটকা সেঁকা শূকর মাংসই খাদ্য হিসেবে উত্তম। অন্যান্য মাংসে পাকস্থলীর ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই হয় না—একেবারেই অপদার্থ। রান্না করা মাংস, সসেজ আসে সিমোনেটনের তৃতীয় শ্রেণীতে। কফি, চা, চকোলেট, চীজ, সাদা রুটিও পড়ছে এই শ্রেণীতে। চতুর্থ শ্রেণীতে আসছে মারগারিন, টিনের খাবার, স্পিরিট, রিফাইন্‌ড্‌ চিনি এবং সাদা ময়দা।

মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যারা স্বাস্থ্যবান তাদের প্রাণঃজ্যোতি সাড়ে ছ-হাজার কি একটু বেশী। কিন্তু ধূমপায়ী, সুরাপায়ী, আর মাংসাশী-দের প্রাণঃজ্যোতি অনেক কম। ক্যানসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪,৮৭৫; রোগের লক্ষণ বাইরে প্রকট হওয়ার অনেক আগেই যদি প্রাণঃ-জ্যোতি এই ভাবে কমতে থাকে তাহলে সময় থাকতে রোগ নির্ণয় সম্ভব এবং সুচিকিৎসাও সম্ভব—কোষের মধ্যে ক্যানসারের ঘাঁটি গেড়ে বসার আগেই রোগ নিরাময় করা যাবে।

সিমোনেটনের অনুমিতি অনুসারে মানুষের যা প্রাণঃজ্যোতি, তার চাইতে বেশী প্রাণঃজ্যোতিসম্পন্ন খাদ্য, যেমন মাংস আর সাদা রুটি খেলে প্রাণশক্তি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়—বাড়তি যোগান তো আসেই না। এই ধারণা থেকেই সিমোনেটনের মাথায় আসে যে চিকিৎসার জন্যে পুরাকাল থেকেই লতাপাতা ফুল, শেকড় এবং গাছের ছালের ওপর এত নজর দেওয়ার কারণ এদের রাসায়নিক উপাদান নয়—স্বাস্থ্যকর প্রাণঃজ্যোতির বিকিরণ।

প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছ থেকে প্যারাসিলসান গাছপালার

উপকারিতা জানতে পারেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের মূল উৎস ছিল প্রকৃতি স্বয়ং। ওঁর সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসকের উচিত মাঠের মাঝে চুপচাপ বসে থাকা। তাহলেই লক্ষ্য করবেন গ্রহের গতি অনুসরণ করে কিভাবে ফুল ফুটছে, চন্দ্রকলা অনুযায়ী পাপড়ি মেলে ধরছে, সূর্যের প্রদক্ষিণ এবং বহুদূরের নক্ষত্রদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে।

প্যারাসেলসাসের একজন আধুনিক ভক্ত ডক্টর এডোয়ার্ড বাক লণ্ডনের পশার ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক পন্থায় রোগ নিরাময় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এঁর বিশ্বাস আধুনিক ওষুধ অযথা রুগীকে যন্ত্রণা দেয়—ভালর চাইতে খারাপ বেশী করে।

উদ্ভিদের শক্তিকে চিনে নিতে ইনি উপদেশ দিয়েছিলেন চিকিৎসকদের। গ্রামে গ্রামে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বুনো ফুল দেখে মানুষের আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক ব্যাধির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন অসুখের কারণ দেহ নয়, অসুস্থ মেজাজ বা অশান্ত মন।

প্যারাসেলসাসের মত উনিও বিশ্বাস করতেন, যা সজীব তা আলো বিকিরণ করে। সিমোনেটনের মত বিশ্বাস করতেন, উচ্চ কম্পন সম্পন্ন উদ্ভিদ নিম্ন কম্পন বাড়িয়ে দিতে পারে। তাঁর পদ্ধতি ছিল রোগকে আক্রমণ করা নয়, সুন্দর স্বাস্থ্যকর কম্পন দিয়ে রুগীর দেহ ভরপুর করে দেওয়া। ফলে, সূর্যালোকে তুষার যেমন গলে যায়, রোগও দেহ ছেড়ে পালায়।

'জরা এবং মানসিক স্বাস্থ্য' নামক বইটার যুগ্ম লেখিকা মায়ারনা লুই-কে সোভিয়েত দেশে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয়েছিল কিভাবে সেখানে বড়ি খেয়ে দৈহিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থ রুগীদের গ্রীনহাউসে গাছপালার সান্নিধ্যে বসিয়ে রেখে কেবল গান শোনানো হয় এবং টেপে-ধরা সমুদ্র গর্জন শোনানো হয়—কোনো ওষুধ খাওয়ানো হয় না।

বাক বারবার বলেন, রুগীর নিজেরই উচিত রোগ সম্বন্ধে তার মনোভাব পালটানো। স্বর্গীয় কম্পন তাকে সুস্থ হতে সাহায্য করে। দীর্ঘ ভয় বা উদ্বেগ শরীরের রোগ ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়—সংক্রমণ বা ব্যাধি সহজেই দেহ আক্রমণ করে জাঁকিয়ে বসে। বুনো ফুলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে নিজেই খুব চনমনে অনুভব করতেন বাক। উদ্ভিদ হাতে নিলে বা জিভে ঠেকালে প্রতিক্রিয়াটা নিজের ভেতরে উপলব্ধি করতেন—ফুল বা উদ্ভিদের ভেতরকার শক্তি যেন তাঁর মধ্যেও সাড়া জাগাতো। কিছু শক্তি প্রাণশক্তি জোগাতো, কিছু শক্তি যন্ত্রণা, বমি, জ্বর বা চামড়ায় ঘায়ের কারণ হত। দিন যখন দীর্ঘতম, সূর্য যখন সবচেয়ে বেশী কিরণ বিতরণ করে, সেরা উদ্ভিদ তখনই পাওয়া যায়।

প্যারাসেলসাস লিখেছিলেন, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে তিনি

শিশির সংগ্রহ করেছিলেন যাতে গ্রহমিলনের এনার্জি শিশিরের মধ্যে সঞ্জাত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই পড়েই অথবা স্বইচ্ছায় বাক বিভিন্ন উদ্ভিদের ওপর জমে থাকা শিশির সংগ্রহ করেছিলেন বোতলের মধ্যে। ওঁর থিয়োরী অনুসারে যে উদ্ভিদে শিশির জমা হচ্ছে, তার গুণাগুণ শিশিরে তো ঢুকছেই উপরন্তু সূর্যালোকে প্রতিটা বিন্দু এনার্জি দ্বারা ম্যাগনেটাইজড হচ্ছে। ফুল থেকে শিশির সংগ্রহ করেছিলেন রোগ সারানোর উদ্দেশ্যেই। যদিও সব ফুলের রোগ সারানোর ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু প্রতিটা ফুল থেকে সংগৃহীত শিশিরের কিছু না কিছু ক্ষমতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—যে ক্ষমতা উদ্ভিদে ছিল প্রবলতর সূর্যকিরণে স্নাত অবস্থায়।

শিশির সংগ্রহ বড় মেহনতী ব্যাপার বলে বাছাই করা উদ্ভিদের ফুল পরিষ্কার নদীর জলে রেখে সূর্যালোকে রেখে দিয়েছিলেন বাক। কয়েক ঘণ্টা পরে লক্ষ্য করেছিলেন উদ্ভিদের কম্পন এবং শক্তি জলেও সঞ্জাত হয়েছে। প্রথম এই এক্সপেরিমেণ্ট থেকে আটত্রিশটা ওষুধ বানিয়েছিলেন বাক। ইংলণ্ড এবং বিশ্বের বহু মানুষ উপকার পেয়েছিলেন। আজও দুরারোগ্য ব্যাধির খপ্পরে পড়লে হাজার হাজার মানুষ পুষ্প-নিষ্কর্ষ চিকিৎসার ওপর নির্ভর করছে।

স্কটল্যাণ্ডের মানুষ অ্যালিক ম্যাক্ইন্স-ও ফুলের বিকিরণ অনুভব করতে পারতেন। চোখবাঁধা অবস্থায় যে-কোনো ফুলের ওপর হাত বুলিয়ে বলে দিতে পারতেন ফুলটার বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত, কোন্ উদ্ভিদের ফুল এবং তার কি-কি ভেষজ গুণাবলী থাকতে পারে। তিরিশ বছর ভারতে ছিলেন ইনি এবং কলকাতার বোস ইন্সটিটিউটেই সর্বপ্রথম সচেতন হন যে উদ্ভিদরা কেবল অনুভব-যোগ্য বিকিরণ নির্গমনই করে না—মানুষের বিকিরণও অনুভব করতে পারে। এ অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল বোস ইন্সটিটিউটের প্রবেশ পথেই।

ম্যাক্ইন্স বলেন, সব বস্তুকণাই নির্গমনে সক্ষম। বর্ণ, শব্দ, আকৃতি, সঞ্চার, সুগন্ধ, তাপমাত্রা এবং বুদ্ধিমত্তার মত এইসব থেকেও ঠিক সনাক্ত করা সম্ভব সঠিক ফুলটাকে।

ফুলের বিকিরণ জলে চালান করা সম্ভব বলে মনে করেন ম্যাক্ইন্স। অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী হয় এই বিকিরণ। বিশ বছর পরেও কয়েকটা শিশির বিকিরণ যথাপূর্বম্ থেকেছে। এক-এক সময়ে এক-এক জাতের ফুলের বিকিরণ নিষ্কাষণ সব চাইতে ভাল হয়—সব চাইতে ভাল হয় পূর্ণচন্দ্রের সময়ে। সাধারণতঃ এই সময়েই সম্পূর্ণতা লাভ করে ফুল। সঠিক পরিবেশে বিকিরণ চালান চক্ষের নিমেষে ঘটে যায় এবং জলটা যে পালটে যাচ্ছে তা দেখা যায়। লোমহর্ষক সেই অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। প্রাণশক্তিপূর্ণ এই জল সর্বরোগহর নয়, কিন্তু দেহের প্রাণশক্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় বলে রোগ আর সুবিধে করে

উঠতে পারে না। সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই প্রাণশক্তির পরিমাপ হয় না বলে শিশির লেবেলে লিখে দিতে হয়—শতকরা একশ ভাগ জল, কোনো বনৌষধি বা রাসায়নিক উপাদান নেই। উনি বলেন, ম্যাগনেটাইজ্‌ড্‌ লোহা এবং সাধারণ লোহার রাসায়নিক উপাদান একই—তবুও কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস। ওঁর আশা আছে, বিকিরণ পরিমাপের পদ্ধতি একদিন আবিষ্কৃত হবেই।

রেডিওনিক কীটনাশক

সিমোনেটন স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একদিন আসবে যেদিন ডাক্তাররা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে রুগীর অসুস্থ দেহযন্ত্রের ফ্রিকোয়েন্সি শুনে বুঝতে পারবেন ব্যাধিটা কি ধরনের এবং স্বাস্থ্যকর কম্পন বেতার মারফৎ পাঠিয়ে ব্যাধি নিরাময় করবেন। এ স্বপ্ন আর সায়ান্স-ফিকশনের পর্যায়ে নেই—ঘটনাভিত্তিক হতে চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সানফ্রান্সিসকোর ধনকুবের বণিকপুত্র ডক্টর অ্যালবার্ট অ্যাব্রাম্‌ হাইডেলবার্গে গেছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা অধ্যয়নের জন্য। নেপল্‌স্‌-য়ে প্রখ্যাত সুরকার এনরিকো ক্যারুসো তাঁর সামনে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখিয়েছিলেন। সুরাপাত্রে আঙুলের টোকা দিয়ে একটা শব্দ সৃষ্টি করে পাছু হটে গিয়ে সেই সুরটাই কণ্ঠে সৃষ্টি করে সুরাপাত্র চুরমার করে দিয়েছিলেন। রোগ নিদান এবং ব্যাধি নিরাময়ে মূল সূত্রটার প্রয়োগসম্পর্কে তখন থেকেই ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হয় ডক্টর অ্যাব্রামের।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর সইয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ডক্টর অ্যাব্রামের। উদ্ভিদ নিয়ে বিচিত্র এক্সপেরিমেণ্ট করছিলেন ইনি—গারউইটস্‌চ্‌-য়ের 'মাইটোজেনিক রেডিয়েশন' আবিষ্কারের বহুপূর্বে। কিছু পিঁয়াজ চারা তিনি একঘরে রোপণ করেছিলেন, ভুলবশতঃ কিছু পড়ে ছিল অন্য একটা ঘরে। কিছুদিন পরে দেখলেন, মৃত্তিকা প্রোথিত পিঁয়াজ চারাগুলির যেগুলো মুমূর্ষু পিঁয়াজ চারাদের দিকে রয়েছে, সেগুলোর চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। রহস্যটা প্রফেসর সইয়ার ধরতে পারেন নি। ডক্টর অ্যাব্রাম কিন্তু আঁচ করেছিলেন পেঁয়াজের শেকড় থেকে নিশ্চয় অদ্ভুত কোনো বিকিরণ-নির্গমন ঘটছে যার সঙ্গে ক্যারুসোর কাঁচ-ভাঙা অনুকম্পনের সাদৃশ্য আছে।

আমেরিকায় ফিরে এসে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন ইনি। পরে ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। রোগ নিদানের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। রুগীর গায়ে টোকা মেরে অনুকম্পন শুনে রোগের সূত্র ধরতে পারতেন। একদিন এক্স-রে মেশিন চালু ছিল। রুগীর অনুকম্পন স্তিমিত হয়ে গেল কেন

বুঝতে না পেরে রুগীকে উত্তর-দক্ষিণে ফেরাতেই অনুকম্পন আবার তীব্র হ'ল—পূবপশ্চিমে ফেরাতে হ্রাস পেল। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সম্পর্কটা এইভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন।

ক্যানসার আক্রান্ত কোষ থেকেও কম্পন-নির্গমন ঘটে এবং সুস্থ দেহের কলা-তন্তুতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, এক ঘর ছাত্রের সামনে তা এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়েছিলেন অ্যাব্রাম। কলাতন্তুর চরিত্রটা পালটে দেয় কিভাবে তা কিন্তু উনি বুঝতে পারেন নি।

যক্ষ্মা আক্রান্ত এবং ক্যানসার আক্রান্ত টিশু নিয়ে কয়েক মাস পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর অ্যাব্রাম এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে রোগের উৎস কোষের মধ্যে, দীর্ঘদিনের এই ধারণা সঠিক নয়। কোষের আণবিক গঠন পালটে যায়, ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং সাজানোর মধ্যে একটা হেরফের ঘটে বলেই ব্যাধির উৎপত্তি। পরে তা প্রকট হলে অনুবীক্ষণে ধরা পড়ে। কিন্তু এই ইলেকট্রনিক অসামঞ্জস্যটা যে আসলে কি ধরনের, তা অ্যাব্রাম জানতেন না, আজও কেউ জানে না। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস এমন একদিন আসবে যেদিন আন্তঃআণবিক অসামঞ্জস্য ধরা পড়বে—রোগ নিরাময় এবং নিবারণ দুটোই সম্ভব হবে।

এর পরেই অ্যাব্রাম আবিষ্কার করলেন যে তড়িৎ প্রবাহের মত তারের মধ্যে দিয়ে অসুস্থ নমুনার বিকিরণ ছ-ফুট দূরে পাঠানো যায়। একজন অবিশ্বাসী ডাক্তারের ফুসফুসের যক্ষ্মা এইভাবে ধরে দিয়েছিলেন অ্যাব্রাম।

বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্ত টিশুর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিমাপের একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেন অ্যাব্রাম। নাম দেন, রিফ্লেক্সোফোন। বিভিন্ন গ্রামের শব্দ নির্গমনে সক্ষম এই যন্ত্রটির গঠনপ্রণালী কারেণ্ট রেগুলেটরের মত। ফলে শরীরে বিশেষ বিশেষ জায়গায় টোকা মারার আর দরকার হয় না।

ডায়াল থেকেই বিভিন্ন অসুখ ধরা যায়। সিফিলিস হলে পঞ্চান্ন, টিউমারের ক্ষেত্রে আটান্ন, ইত্যাদি। রকমারি টিশু মিশিয়ে অ্যাব্রামের সামনে রাখলে যন্ত্র মারফৎ সঠিক বলে দেন কোনটা কোন ব্যাধির কবলে পড়েছে।

অ্যাব্রামের আরও ফ্যানট্যাসটিক আবিষ্কারের কথা এবার বলা যাক। এক ফোঁটা রক্ত থেকে যন্ত্রের দৌলতে তিনি নরদেহের রোগ নিদান করতে পারেন। রোগ কতদূর এগিয়েছে, তাও নির্ণয় করতে পারেন।

এমন কি, কোন স্তনে ক্যানসার হয়েছে, তা দেহের এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করেও বলে দিতে পারেন অ্যাব্রাম। একইভাবে বলতে পারেন, শরীরের কোথায় যক্ষ্মা বাসা বেঁধেছে।

বৈজ্ঞানিক কারণটা নিজেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। এক ফোঁটা রক্তে কুইনাইন সালফেট দিতেই ম্যালেরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর ম্যালেরিয়া

পদ্ধতিমাফিক এক্সপেরিমেন্ট করেন হ্যানিম্যান। যা থেকে যে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক তাই দিয়েই অলৌকিকভাবে নিরাময় পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বিষ দিয়ে বিষ-চিকিৎসা বলা যায়। উনি দেখলেন এইভাবে স্কারলেট ফিভার সারে বেলেডোনায়, হাম সারে পালসেটিলায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা সারে জেলসেমিয়ামে। আরও দেখলেন, ওষুধটাকে যত তরল করা যায়, ততই তার শক্তিবৃদ্ধি পায়। রুডল্ফ্ হউস্চকা এই পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, বস্তু যদি মহাজাগতিক শক্তিসমূহের ঘনীভূত বা কৃস্ট্যালীকৃত অবস্থা হয়, তাহলে বোতল ভূত যেমন ছিপি খোলা পেয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি বস্তু-আধার থেকেও সেই সব শক্তির নির্গমন ঘটে।

শরীরের খপ্পর থেকে আত্মাকে একটু একটু করে মুক্তি দেয় ছন্দিত মাত্রায় তরলীকৃত বস্তু—এইভাবেই হ্যানিম্যানের গুপ্তরহস্যর আংশিক ব্যাখ্যা করেছিলেন হউস্চকা।

কিন্তু ওষুধবিক্রেতারা খাপ্পা হলেন তাঁদের ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে দেখে। ডাক্তাররা তো আগেই খেপেছিলেন রক্তক্ষরণ একটা অপরাধ—হ্যানিম্যানের এই উক্তিতে। তারপর যখন তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হল গ্যেটের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পত্রিকায়, ওষুধবিক্রেতারা উঠে পড়ে লাগলেন, আদালতে মামলা রুজু করলেন, তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন, তাঁর ওষুধ বিক্রী বন্ধ করে দিলেন এবং দেশ-ছাড়া করলেন। অত কম মাত্রায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ অসুখ নিরাময় হলে তাঁদের লাখ-লাখ বড়ি কে কিনবে?

১৯৫৯ সালে আপটন এবং তাঁর বন্ধু যখন বিধ্বংসী কীটপতঙ্গ শায়েস্তা করার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলেন, তখন কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকও তাঁদের সমর্থন করেননি। কিন্তু দমবার পাত্র নন দুই ইঞ্জিনীয়ার। অ্যারিজোনায় সবচেয়ে বড় তুলাক্ষেতে আকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্র মাধ্যমে পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন। বারো ধরনের কীট মারতে এই ক্ষেতে বছরে খরচ হত তিরিশ হাজার ডলার। ক্ষেতে উৎপন্ন তুলার দাম দশলক্ষ ডলার। সরলতম এই পন্থা মারফৎ কীটনিবারণ করা মানেই তো তিরিশ হাজার ডলারের সাশ্রয়।

মরশুমের শেষে টাকসন উইক-এন্ড রিপোর্টারে বেরোলো ফলাফল। 'বাক রজার্স টাইপ ইলেকট্রনিক পেস্ট কন্ট্রোল' দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়েছে। ক্ষেতের উৎপাদন শতকরা পঁচিশভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কীট পতঙ্গর উৎপাত আর নেই—মধুমক্ষিকারা কিন্তু রেহাই পেয়েছে—রেডিওনিক পদ্ধতি তাদের ওপর কার্যকর নয়। আরও আশ্চর্য, অতবড় তুলাক্ষেতে সাপের উৎপাতও আর নেই—সাপ দেখাই যাচ্ছে না।

আপটনের আর এক বন্ধু হাওয়ার্ড আর্মস্ট্রং পেনসিলভানিয়ায় প্রবর্তন করলেন রেডিওনিক কীটনাশক। ইনি কেমিস্ট। বহু আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করেছেন। একটা ভুট্টা ক্ষেতের ছবি তুললেন আকাশ থেকে। জাপানী গুবরে পোকার বড় উৎপাত সেই ক্ষেতে! ফটোগ্রাফের একটা কোণ কেটে নিয়ে রোটেনোন নামে একটা গুবরে পোকানাশক বিষের সঙ্গে কালেক্টর প্লেটে রাখলেন। বার কয়েক পাঁচ থেকে দশ মিনিট পদ্ধতিটা চালু রাখার পর ক্ষেতের গুবরে পোকার হিসেব নিলেন। যে অঞ্চলের ছবি রোটেনন-নিষিক্ত হয়েছিল, সেখানে শতকরা আশি থেকে নব্বইটা গুবরে পোকা অক্কা পেয়েছে—বাকী ক্ষেতে শতকরা একশটাই বেঁচে আছে।

ফলাফল দেখে পেনসিলভানিয়ার একটি কৃষিসংস্থার ডিরেক্টর রকওয়েল লিখেছিলেন, পদ্ধতিটা মনে হয় অবাস্তব, অসম্ভব, ফ্যানট্যাসটিক এবং উন্মত্ততা। কিন্তু সত্য।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃষকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সর্তে এই পদ্ধতির প্রয়োগে ক্ষেতে কীটনিবারণ আন্দোলন শুরু করেন রকওয়েল। ফল না পেলে টাকা দিতে হবে না—এই ছিল চুক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে মেরীল্যাণ্ডস্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের টনক নড়ল শেষকালে। সেখানকার একজন অফিসার, জেনারেল গ্রস, আরও দুজন পি-এইচ-ডি সতীর্থকে সঙ্গে করে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পদ্ধতিটার মূল সূত্র কী? বলা হয়েছিল অনেকটা রেডিও-ব্রডকাস্টিংয়ের মত ব্যাপারটা। কিন্তু কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্রডকাস্টিং হচ্ছে, তা জানা নেই।

১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে আর্মস্ট্রং এতদূর সফল হলেন যে কীটনাশক সেল্‌স্‌ম্যানদের হাঁকিয়ে দেওয়া হল ক্ষেতখামার থেকে। টনক নড়ল কীটনাশক ব্যবসায়ী সংস্থার। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে সংস্থার পত্রিকায় লেখা হল, রেডিওনিক পদ্ধতি একটা জোচ্চুরি।

আর্মস্ট্রং নিজেও কখনো দাবী করেন নি যে সব সময়েই তাঁর পদ্ধতিতে কীট নিবারণ হবে। জল দেওয়ার পাইপ, হাই-টেনশন ইলেকট্রিক তার, ছিদ্রযুক্ত ট্রান্সফর্মার, তারের বেড়া, রাডার, উদ্ভিদের টব এবং বিবিধ মাটির অবস্থার জন্যে তাঁর অনেক টেস্ট ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু কীটনাশক ব্যবসায়ীরা সমূহ বিপদ উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে রেডিওনিক পদ্ধতির নতুন খদ্দের পাওয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল।

পদ্ধতিটার পেটেন্ট নেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করলেন আপটন। কিন্তু তা খারিজ হল উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে। আপটন তখন ফিজিক্সে নোবেল

পদ্ধতিমাফিক এক্সপেরিমেন্ট করেন হ্যানিম্যান। যা থেকে যে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক তাই দিয়েই অলৌকিকভাবে নিরাময় পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বিষ দিয়ে বিষ-চিকিৎসা বলা যায়। উনি দেখলেন এইভাবে স্কারলেট ফিভার সারে বেলেডোনায়, হাম সারে পালসেটিলায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা সারে জেলসেমিয়ামে। আরও দেখলেন, ওষুধটাকে যত তরল করা যায়, ততই তার শক্তিবৃদ্ধি পায়। রুডলফ্ হউস্চকা এই পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, বস্তু যদি মহাজাগতিক শক্তিসমূহের ঘনীভূত বা কৃস্ট্যালীকৃত অবস্থা হয়, তাহলে বোতল ভূত যেমন ছিপি খোলা পেয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি বস্তু-আধার থেকেও সেই সব শক্তির নির্গমন ঘটে।

শরীরের খপ্পর থেকে আত্মাকে একটু একটু করে মুক্তি দেয় ছন্দিত মাত্রায় তরলীকৃত বস্তু—এইভাবেই হ্যানিম্যানের গুপ্তরহস্যর আংশিক ব্যাখ্যা করেছিলেন হউস্চকা।

কিন্তু ওষুধবিক্রেতারা খাপ্পা হলেন তাঁদের ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে দেখে। ডাক্তাররা তো আগেই খেপেছিলেন রক্তক্ষরণ একটা অপরাধ—হ্যানিম্যানের এই উক্তিতে। তারপর যখন তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হল গ্যেটের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পত্রিকায়, ওষুধবিক্রেতারা উঠে পড়ে লাগলেন, আদালতে মামলা রুজু করলেন, তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন, তাঁর ওষুধ বিক্রী বন্ধ করে দিলেন এবং দেশছাড়া করলেন। অত কম মাত্রায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ অসুখ নিরাময় হলে তাঁদের লাখ-লাখ বড়ি কে কিনবে?

১৯৫৯ সালে আপটন এবং তাঁর বন্ধু যখন বিধ্বংসী কীটপতঙ্গ শায়েস্তা করার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলেন, তখন কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকও তাঁদের সমর্থন করেননি। কিন্তু দমবার পাত্র নন দুই ইঞ্জিনীয়ার। অ্যারিজোনায় সবচেয়ে বড় তুলাক্ষেতে আকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্র মাধ্যমে পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন। বারো ধরনের কীট মারতে এই ক্ষেতে বছরে খরচ হত তিরিশ হাজার ডলার। ক্ষেতে উৎপন্ন তুলার দাম দশলক্ষ ডলার। সরলতম এই পন্থা মারফৎ কীটনিবারণ করা মানেই তো তিরিশ হাজার ডলারের সাশ্রয়।

মরশুমের শেষে টাকসন উইক-এণ্ড রিপোর্টারে বেরোলো ফলাফল। 'বাক রজার্স টাইপ ইলেকট্রনিক পেস্ট কণ্ট্রোল' দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়েছে। ক্ষেতের উৎপাদন শতকরা পঁচিশভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কীট পতঙ্গর উৎপাত আর নেই—মধুমক্ষিকারা কিন্তু রেহাই পেয়েছে—রেডিওনিক পদ্ধতি তাদের ওপর কার্যকর নয়। আরও আশ্চর্য, অতবড় তুলাক্ষেতে সাপের উৎপাতও আর নেই—সাপ দেখাই যাচ্ছে না।

আপটনের আর এক বন্ধু হাওয়ার্ড আর্মস্ট্রং পেনসিলভানিয়ায় প্রবর্তন করলেন রেডিওনিক কীটনাশক। ইনি কেমিস্ট। বহু আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করেছেন। একটা ভুট্টা ক্ষেতের ছবি তুললেন আকাশ থেকে। জাপানী গুবরে পোকার বড় উৎপাত সেই ক্ষেতে! ফটোগ্রাফের একটা কোণ কেটে নিয়ে রোটেনোন নামে একটা গুবরে পোকানাশক বিষের সঙ্গে কালেক্টর প্লেটে রাখলেন। বার কয়েক পাঁচ থেকে দশ মিনিট পদ্ধতিটা চালু রাখার পর ক্ষেতের গুবরে পোকার হিসেব নিলেন। যে অঞ্চলের ছবি রোটেনন-নিষিক্ত হয়েছিল, সেখানে শতকরা আশি থেকে নব্বইটা গুবরে পোকা অক্কা পেয়েছে—বাকী ক্ষেতে শতকরা একশটাই বেঁচে আছে।

ফলাফল দেখে পেনসিলভানিয়ার একটি কৃষিসংস্থার ডিরেক্টর রকওয়েল লিখেছিলেন, পদ্ধতিটা মনে হয় অবাস্তব, অসম্ভব, ফ্যানট্যাসটিক এবং উন্মত্ততা। কিন্তু সত্য।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃষকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সর্তে এই পদ্ধতির প্রয়োগে ক্ষেতে কীটনিবারণ আন্দোলন শুরু করেন রকওয়েল। ফল না পেলে টাকা দিতে হবে না—এই ছিল চুক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে মেরীল্যান্ডস্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের টনক নড়ল শেষকালে। সেখানকার একজন অফিসার, জেনারেল গ্রস, আরও দুজন পি-এইচ-ডি সতীর্থকে সঙ্গে করে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পদ্ধতিটার মূল সূত্র কী? বলা হয়েছিল অনেকটা রেডিও-ব্রডকাস্টিংয়ের মত ব্যাপারটা। কিন্তু কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্রডকাস্টিং হচ্ছে, তা জানা নেই।

১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে আর্মস্ট্রং এতদূর সফল হলেন যে কীটনাশক সেল্‌স্‌ম্যানদের হাঁকিয়ে দেওয়া হল ক্ষেতখামার থেকে। টনক নড়ল কীটনাশক ব্যবসায়ী সংস্থার। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে সংস্থার পত্রিকায় লেখা হল, রেডিওনিক পদ্ধতি একটা জোচ্চুরি।

আর্মস্ট্রং নিজেও কখনো দাবী করেন নি যে সব সময়েই তাঁর পদ্ধতিতে কীট নিবারণ হবে। জল দেওয়ার পাইপ, হাই-টেনশন ইলেকট্রিক তার, ছিদ্রযুক্ত ট্রান্সফর্মার, তারের বেড়া, রাডার, উদ্ভিদের টব এবং বিবিধ মাটির অবস্থার জন্যে তাঁর অনেক টেস্ট ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু কীটনাশক ব্যবসায়ীরা সমূহ বিপদ উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে রেডিওনিক পদ্ধতির নতুন খদ্দের পাওয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল।

পদ্ধতিটার পেটেন্ট নেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করলেন আপটন। কিন্তু তা খারিজ হল উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে। আপটন তখন ফিজিক্সে নোবেল

প্রাইজ পুরস্কৃত ডক্টক ফেলিক্সের উদ্ধৃতি তুলে আবার চেস্টা করলেন। ডক্টর 'ব্লচ সায়েন্স নিউজ লেটারে' লিখেছিলেন, ম্যাগনেটিক ফিল্ডে মৌলের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ অনুকম্পন পরমাণুকে অতি-ক্ষুদ্র রেডিও ট্রান্সমিটারে পরিণত করতে পারে এবং সেই ব্রডকাস্ট্র বিবর্ধিত করে লাউডস্পীকারে শোনানো যেতে পারে।

জেনারেল গ্রস নিজেও বহু বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হলেন। এঁদের একজন ছিলেন প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। এমন কাণ্ড যে সম্ভব হতে পারে, তা কেউ মানতে চাইলেন না।

নোবেলপ্রাইজ পুরস্কৃত এবং কার্বন-14 পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ডক্টর লিবি জেনারেল গ্রসকে বলেছিলেন, 'অ্যাব্রাম বাক্স' নিয়ে গবেষণা করতে গেলে দশ লক্ষ ডলারের প্রয়োজন হবে।

সরকার বোধকরি ভয় পেয়েছিলেন রেডিওনিক পদ্ধতির অন্য একটা প্রয়োগ-সম্ভাবনা ভেবে। রেডিওনিক কীটনাশক তো একদিন সামরিক ক্ষেত্রে মারণ অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তাই সরকারী প্রচেষ্টা এবং কীটনাশক জাঁদরেল ব্যবসাদারদের যৌথ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রেডিওনিক পদ্ধতি কোম্পানী লাটে উঠল।

লস এঞ্জেলসের তরুণ ডাক্তার রুথ ব্রাউন পা, পায়ের নখ, কড়া ইত্যাদির চিকিৎসা করতেন। অ্যাব্রাম পদ্ধতির ইনি উন্নতিসাধন করে বিস্ময়কর ক্যামেরা নির্মাণ করেন যা দিয়ে কয়েক হাজার মাইল দূরে রুগীকে রেখে তার একফোঁটা রক্তের সাহায্যে তার দেহযন্ত্র এবং কলাতন্তুর ছবি তোলা যায়। একবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রটার বৃটিশ পেটেণ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার ভেষজনিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাজেয়াপ্ত করেন তাঁর যন্ত্র। যা ছিল সায়েন্স-ফিকশন, তা সম্ভবপর করেও যখন এই অবমাননার সম্মুখীন হলেন ডক্টর ব্রাউন এবং ফলাও করে যখন খবরটা ছাপা হল 'লাইফ' ম্যাগাজিনে, তখন বুক ভেঙে গেল তাঁর। অকালে মৃত্যু ঘটল একটি প্রতিভার—স্বীকৃতি আর পেল না।

শিকাগোর ডাক্তার উইগেলস্‌ওয়ার্থ কিন্তু অ্যাব্রাম অনুরাগী ছিলেন। তাঁর এক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার ভাই কিন্তু অ্যাব্রামকে জোচ্চোর বলতেন। পরে এই দুই ভাই 'প্যাথোক্লাস্ট' নামে একটা যন্ত্র নির্মাণ করেন বাংলায় যার মানে দাঁড়ায়—ব্যাধি ভাঙার মেশিন।

ফিফার লক্ষ্য করেছিলেন, উদ্ভিদের ওপর চাঁদের প্রভাব আছে। সমর্থন পাওয়া গেল হিরোনিমাসের একটি এক্সপেরিমেণ্টে। ইনি দেখেছিলেন কেবল মাত্র অসুস্থ বা সুস্থ বা কলাতন্তু থেকেই অদ্ভুত শক্তির নির্গমন ঘটে না—ধাতুর থেকেও ঘটে। মাটির তলায় ধাতুর জিনিস লুকিয়ে রাখলেও ঠিক খুঁজে বার করতেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন মাঝে মাঝে রুপোর নির্গমন টের

পাওয়া যায় না—পরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখলেন চন্দ্রকলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্যে রূপোর নির্গমন মাটির ভেতর দিকে ছুটে যায়—অন্য সময়ে আসে বাইরের দিকে। মেসমার এবং রাইকেলবাকের খনিজ-ম্যাগনেটিজম ও জৈবম্যাগনেটিজম-য়ের মধ্যেকার সম্পর্ক সমর্থিত হল এইভাবে।

ক্লোরোফিল উৎপাদন যে নিছক সূর্যালোকে ঘটছে না—সূর্যরশ্মি মধ্যস্থ অন্য কোনো বিচিত্র শক্তির জন্যে ঘটছে, বিপ্লবাত্মক এই ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন ইনি। ভূগর্ভ কক্ষে বীজের সঙ্গে জলের পাইপ ঠেকিয়ে রেখে সেই পাইপের সঙ্গে তামার তার লাগিয়ে রেখে মেলে ধরেছিলেন সূর্যালোকে। বীজ রোদ্দুর পায়নি—কিন্তু তারের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত শক্তিপ্রবাহ এসে সবুজ চারায় পরিণত করেছিল বীজটাকে। পাশে রাখা অন্য বীজে তার লাগাননি বলে সেটা সবুজ হয়নি—নেতিয়ে পড়েছিল।

বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন হিরোনিমাস। বিচিত্র এই নির্গমনের সঙ্গে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-য়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা আলোকবিজ্ঞানের কিছু নিয়ম মেনে চলে এবং প্রতিসরিত হয়।

রেডিয়েশনটার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'এ রেডিয়েশন এমন একটা এনার্জি যা ইলেকট্রিসিটির কিছু নিয়ম মানে—কিন্তু সব নিয়ম মানে না; অপটিক্সের কিছু নিয়ম মানে—কিন্তু সব নিয়ম মানে না!' পুনরুক্তি এড়োনোর জন্যে বিচিত্র এনার্জির নাম দেন—'ইলোপটিক এনার্জি'।

বলেছিলেন, এই এনার্জি স্বাধীন হলেও যে কোনোভাবেই হোক ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক এনার্জির সঙ্গে একটা সম্পর্ক রেখে চলেছে। তাদের ফ্রিকোয়েন্সি-স্পেকট্রাম পরস্পর সম্পর্কিত। ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার এবং পদার্থবিদরা যাকে ইথার বলতেন, ইলোপটিক এনার্জি সেই রকমই এক ধরনের অতি মিহি মাধ্যম হতে পারে—তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিচারে।

জীবাণুবিদ অটোরান সজীব বস্তু নির্গত রেডিয়েশন সম্পর্কে গ্রন্থ লিখে দশ বছর আগে সতীর্থদের হতভম্ব করে দিয়েছিলেন। হিরোনিমাসের পদ্ধতি এবং পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণ পড়ে আবিষ্কারককে পত্র-মারফৎ জানিয়েছিলেন, 'যেহেতু এই রেডিয়েশনের মধ্যে প্রাণের গুপ্তরহস্য বিধৃত, সুতরাং তার মরণের গুপ্তরহস্যও বিধৃত। বর্তমানে খুব কম লোকই জানে এর সম্ভাবনা কতদূর যেতে পারে, তারও কম লোক জানে প্রকৃত ঘটনা কী। তাই এই অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরা বাধ্য হয়েছেন গুপ্ত রহস্যটা নিজেদের মধ্যেই ধরে রাখার ব্যাপারে এবং প্রকাশ করেন শুধু সেইটুকুই যেটুকু দরকার ব্যাধি নিরাময়ের জন্য। পার-মাণবিক বোমা আবিষ্কারের মতই এই আবিষ্কার মানবকল্যাণে এবং মানবং

অকল্যাণে প্রয়োগ করা হতে পারে।'

১৯৪৯ সালে 'বস্তু থেকে নির্গমন নির্ণয় এবং তার পরিমাপের জন্য' যুক্তরাষ্ট্রীয় পেটেণ্ট নম্বর ২,৪৮২,৭৭৩ পেয়ে পুরস্কৃত হন হিরোনিমাস। পরে অনেক পেটেণ্ট হয় বৃটেন এবং কানাডায়।

হির্জাল খামারবাড়ীতে রেডিওনিক কীটনাশক কোম্পানী (U. K. A. C. O.) প্রতিনিধির সঙ্গে মিলেমিশে আর একটা ভয়ংকর এক্সপেরিমেণ্ট করেন হিরোনিমাস।

একটা ভুট্টার তিনটে খোসার ওপর তিনটে পোকা মনের আনন্দে পাতা চিবোচ্ছিল। পাতা তিনটেকে আলাদা করে আনেন হিরোনিমাস যাতে পোকারা পালাতে না পারে। তারপর তাদের ওপর প্রয়োগ করেন রেডিওনিক ব্রডকাস্ট। তিন দিন প্রতি ঘণ্টায় চলে ব্রডকাস্টিং। দুটো পোকা মণ্ডে পরিণত হয়। তৃতীয় পোকাটা তখন টলছে। আরও চব্বিশ ঘণ্টা ব্রডকাস্টিংয়ের পর নাছোড়বান্দা পোকাটিও মণ্ডে পরিণত হয় এবং আগেই মণ্ডে পরিণত অন্য দুটি পোকা যেখানে ছিল সেখানে খোসার ওপর একটু ভিজে-ভিজে ভাব ছাড়া আর কিছু দেখা যায় নি।

টিউন্‌ড্ রেডিয়েশনের মারাত্মক এই ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান হিরোনিমাস। পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার 'পুরোপুরি'টা কাউকে জানাবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেন। দৃঢ় চরিত্রের সৎ কোনো গবেষক যতদিন না গুরুত্বসহকারে নতুন গবেষণায় প্রয়াসী হচ্ছেন এবং তাঁর আবিষ্কারের প্রচণ্ড শক্তিকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে প্রয়াসী হচ্ছেন, ততদিন এই প্রতিজ্ঞা তিনি রাখবেন।

বস্তুর ওপর মনের প্রভাব

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সারভিসের তরফে একটা পুরো জেলার চিকিৎসার ভার হাতে নিয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ইংরেজ শল্য-চিকিৎসক গাইঅন রিচার্ড্‌স্। ১৯৩৪ সালে বৃটেনে তিনি একখানা বই প্রকাশ করেন। বইটার নাম 'চেন অফ লাইফ'। এর দু-যুগ পরে পেনসিলভানিয়ায় কৃষকদের সাহায্য করতে গিয়ে রেডিওনিক কীটনাশক কোম্পানী লালবাতি জ্বালে।

উদ্ভিদ এবং মানুষের ব্যাধির গ্যালভ্যানোমেট্রিক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন রিচার্ড্‌স্। নিজেকে বলতেন 'বৈদ্যুতিক মনোভাবাপন্ন'। অ্যাব্রাম সম্পর্কে তিনি বলতেন, অজিলোকাস্ট যন্ত্রটার রোগনিরাময় ধর্ম যথাযথ ব্যাখ্যাত হয় নি বলেই চিকিৎসকদের কাছে তা অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে। অথচ আবিষ্কারটা গুরুত্বপূর্ণ।

রিচার্ডসের গ্রন্থ পাঠ করে রেডিওনিক্‌স্ পদ্ধতি সম্বন্ধে নতুন আগ্রহ জাগ্রত

হয় কতিপয় চিকিৎসকের মধ্যে। অদ্ভুত নতুন যন্ত্র নির্মাণের জন্য একজন ইঞ্জি-
নীয়ারের অন্বেষণ করলেন তাঁরা। পেলেন জর্জ ডি লা ওয়ার'কে। ভদ্রলোক
সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন। 'ইংরেজ হিরোনিমাস'
বলা চলে।

হিরোনিমাস সম্পর্কে কিন্তু জর্জ ওয়ার বিন্দুমাত্র খবরাখবর রাখতেন না।
অথচ বছরখানেক পরে কালো চামড়া দিয়ে নির্মিত 'কৃষ্ণ বাক্স' নামক যন্ত্রটি বানিয়ে
সস্ত্রীক ভদ্রলোক আবিষ্কার করলেন হিরোনিমাসেরই পর্যবেক্ষণকে। লেন্স
পদ্ধতি দ্বারা রেডিওনিক এনার্জিকে সরাসরি উদ্ভিদ এবং মানুষের ওপর কেন্দ্রীভূত
করে তাদের পুষ্টিহীনতার নিরাময় এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার এই অভিনব
ব্যবস্থায় হিরোনিমাসেরই একটা দাবী সমর্থিত হল। শেষোক্ত আবিষ্কারক
বারংবার বলেছিলেন, রেডিওনিক এনার্জি আলোক-বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে
এবং প্রতিসরিত হয়।

রেডিওনিক এনার্জির সরাসরি প্রয়োগ ছাড়াও উদ্ভিদের একটি পাতা বা তার
ফটোগ্রাফের মাধ্যমেও U. K. A. C. O. কোম্পানীর মত সাফল্য লাভ করে-
ছিলেন জর্জ ওয়ার। কিন্তু কেন যে এমন হয়, সে রহস্য অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে।
আলোর বিকিরণের জন্যে, না, অন্য কোনো কিছুর বিকিরণের জন্যে এ কাণ্ড ঘটে
তা জানা যায়নি তবে মানুষ এবং তার রক্তবিন্দুর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই ধরনের
সম্পর্কই যে আছে উদ্ভিদ এবং তার ছিন্নপত্রের রসের মধ্যে—এ প্রমাণ পাওয়া
গিয়েছিল।

উনি লিখেছিলেন, মনে হয় বস্তু মাত্রেরই প্রতিটি অণু যেন অতি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক
ভোল্টেজ উৎপাদনে সক্ষম—যা তার একেবারেই নিজস্ব। রেডিও ট্রান্সিমিটার
রিসিভারের মত অণুরাও এই ভোল্টেজ ট্রান্সমিট করতে পারে। একগুচ্ছ অণু
তাই যেন তাদের জাতিগত প্যাটার্ন ট্রান্সমিশনে সক্ষম। এর মানে, উদ্ভিদ বা
মানুষের প্রতিটি সংকেত তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ফটোগ্রাফের ভূমিকা এই-
খানেই, যেন নেগেটিভের ইমালসনে বিধৃত রয়েছে যে-বস্তুর ফটো তোলা হয়েছে,
সেই বস্তুর জাতিগত প্যাটার্ন। বাহক হিসেবে এই ইমালসন থেকে সেই জাতিগত
প্যাটার্ন বিকিরণ সম্ভব। তাই দূর থেকে একটি উদ্ভিদের ওপর প্রতিক্রিয়া
সৃষ্টি করা যায় উদ্ভিদের ফটোগ্রাফ মারফৎ।

তত্ত্বটা অবশ্যই সর্বদিক দিয়ে ছিদ্রহীন নয়। কিন্তু রেডিওনিক্স মারফৎ
লব্ধ ফলাফল নিঃসন্দেহে ফ্যানট্যাসটিক। মাটির মধ্যে সজীব প্রাণীরা উদ্ভিদ
বৃদ্ধির সহায়ক। দৃঢ়মূল এই ধারণা নিয়ে জর্জ ওয়ার ঠিক করলেন উদ্ভিদের
পুষ্টির সমতুল্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে এনার্জি বিকিরণ করে মাটি-মধ্যস্থ কোষদের
প্রভাবিত করবেন। বাগানের মাটির ফটো তোলা হল এবং রেডিওনিক্স পদ্ধতি

মারফৎ সেই ফটোর ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে দেখা হল বাগানের উদ্ভিদরা বাড়ে কিনা।

কাজ শুরু হয়েছিল বাঁধা কপি নিয়ে। বাগানের একদিকের মাটির ওপর রেডিওনিক এনার্জি বর্ষিত হয়েছিল—আর একদিকের মাটি প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ২৭শে মার্চ থেকে অন্ধকার ঘরে নির্বাচিত মাটির ফটোগ্রাফে রেডিওনিক এনার্জি বর্ষিত হয় পুরো একটি মাস। তারপর সেই মাটিতে রোপণ করা হয় চারটে কচি বাঁধাকপি। দু-হপ্তা কাটল বিষম উদ্বেগে। তারপরেই আচম্বিতে লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত বাড়তে লাগল কপি চারটে। জুন মাসের শেষে দেখা গেল প্রকৃতি-লালিত মাটিতে বর্ধিত কপির চেয়ে ঠিক তিনগুণ বেশী বেড়েছে রেডিওনিক এনার্জি-পুষ্ট মাটির কপি চারটে।

উৎসাহিত হয়ে এবার ব্যাপকভাবে পরীক্ষা শুরু করলেন জর্জ ওয়ার। মটর ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়ালেন ৮১ শতাংশ। হিসাবটা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগের অধিকর্তা ডক্টর রাসেলের। এক্সপেরিমেণ্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দেখেছিলেন।

একই সাফল্য অর্জন করলেন বরবটি ক্ষেতেও। রেডিওনিক এনার্জি পুষ্ট মাটিতে বর্ধিত বরবটি সাড়ে ন-ইঞ্চি বেশী বৃদ্ধি পেল প্রকৃতি-লালিত বরবটির চেয়ে। স্কটল্যান্ড থেকে মাটির পুষ্টিসাধন করেও পেলেন একই ফলাফল।

১৯৫৬ সালে জর্জ ওয়ার নতুন পর্যবেক্ষণ নিয়ে তন্ময় হলেন। কোনো নিষ্ক্রিয় বস্তুর ওপর রেডিওনিক এনার্জি সম্পাত করে তাকে মাটির নিজস্ব পুষ্টির সহায়ক করা যায় কিনা, এই গবেষণায় হাত দিলেন। ভারমিকিউলাইট একজাতীয় সিলিকা যা নিজে তো নিষ্ক্রিয়ই, জলেও দ্রবণীয় নয়। এনার্জি সম্পাতের পর এই ভারমিকিউলাইট মিশ্রিত মাটিতে অত্যাশ্চর্য ফলাফল পাওয়া গেল। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেল ১৮৬ শতাংশ, প্রোটিন ২৭০ শতাংশ। হিসেবটা শীর্ষ-স্থানীয় একটি কৃষি সংস্থার। জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন একটি কৃষি সংস্থা নিজেদের ক্ষেতে নিজেদের লোকজন দিয়ে একই এক্সপেরিমেণ্টে কিন্তু ব্যর্থ হল। দমলেন না জর্জ ওয়ার। তিনি বললেন, নিশ্চয় এনার্জি সম্পাতের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব আছে। একই এক্সপেরিমেণ্ট নিজের মাটিতে করে পেলেন অত্যাশ্চর্য ফলাফল। এক্সপেরিমেণ্ট করলেন আবার—এবার এনার্জি সম্পাত পুষ্ট ভারমিকিউলাইট না মিশিয়ে, নিষ্ক্রিয় ভারমিকিউলাইট মেশালেন মাটিতে। ক্ষেতের যত্ন যারা নিত, তাদের কিন্তু জানতে দিলেন না। যথা সময়ে দেখা গেল দ্রুত বাড়ছে শস্য। প্রমাণিত হয়ে গেল উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে পুষ্টির জোগান দিচ্ছে মানুষের বিশ্বাস। হতবাক হয়ে গেলেন কৃষি গবেষকরা।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই এক্সপেরিমেণ্টের পর জর্জ ওয়ার উপলব্ধি করলেন চাঞ্চল্যকর মহাসত্য—কোষ সৃষ্টিতে মানুষের মন সাহায্য করে! এই উপলব্ধির সম্ভাবনা যে সুদূরপ্রসারী, তাও বুঝলেন।

গ্রেটব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় এক পদার্থবিদের কাছে কিন্তু দাবড়ানি খেয়েছিলেন জর্জ ওয়ার। ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ করলে সঠিক শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব, ওয়ারের এই ধারণার জবাবে তিনি বলেছিলেন, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। নিছক চিন্তা দিয়ে উদ্ভিদের একাধিক পরমাণুকে যদি প্রভাবিত করতে পারেন, তাহলে বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় ধারণা পাল্টানো দরকার।

মুষড়ে পড়ার পাত্র নন জর্জ ওয়ার। নিজের পত্রিকা 'মন এবং বস্তু'তে পাঠকদের কাছ থেকে তাঁর বিশ্বাসের সমর্থন আহ্বান করলেন—যে সমর্থন হবে প্রচলিত বস্তুনির্ভর পারমাণবিক তত্ত্বের বিরোধী। সাধারণ পাঠকরা উল্লসিত হলেও চটে গেলেন কিন্তু যাজক সম্প্রদায়। পনেরোটা পর্বের উল্লেখ ছিল জর্জ ওয়ারের প্রবন্ধে; কি ভাবে বরবটির বীজ হাতে নিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে খুঁটিয়ে লিখেছিলেন, যাজক সম্প্রদায় খাপ্পা হলেন তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করায়। যেন ব্রাহ্মণেরই একমাত্র অধিকার মন্ত্রপাঠের—আশীর্বাদ করবেন শুধু যাজকরা—সাধারণ মানুষের এতবড় স্পর্ধা!

যাজকদের ঠাণ্ডা করার জন্যে এক্সপেরিমেণ্টটার নতুন নামকরণ করলেন জর্জ ওয়ার—'অব্যাখ্যাত শক্তির মানসিক প্রক্ষেপণে উদ্ভিদ বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিতকরণ'।

লস এঞ্জেলসের পাদরী ফ্রাঙ্কলিন লোহার অদ্ভুত ফল পেলেন। 'উদ্ভিদের ওপর প্রার্থনার শক্তি' গ্রন্থে লিখলেন তাঁর সাতশ এক্সপেরিমেণ্টের বৃত্তান্ত। অনেক পাঠকও জানালেন, তাঁরা সুফল পেয়েছেন।

লোহার দেখিয়েছিলেন, একজন বা বহুজন যদি আদর্শ পরিবেশে উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধি কল্পনা করে, তাহলে বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে আমল দেন নি—কেন না তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ছিল না।

কিন্তু ডক্টর রবার্ট মিলার ছিলেন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সায়েণ্টিস্ট এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। ১৯৬৭ সালে তিনি রোগ-নিরাময় ক্ষমতাসম্পন্ন ওঝা অ্যামব্রোজ এবং ওলগা ওরেল-কে নিয়ে পর পর কয়েকটা এক্সপেরিমেণ্ট করলেন। যুক্তরাষ্ট্রে সবাই জানত এই দুজনের সুনাম। ছ-শ মাইল দূরে আটলাণ্টার জর্জিয়ায় দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন মিলার। বাল্টিমোরে গম আর যবের চারা রোপণ করলেন। ওরেলদের বলে দিলেন, ছ-শ মাইল দূর থেকে তাদের শুভ-চিন্তা প্রক্ষেপ করতে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের

ডক্টর ক্লুটারের সহযোগিতায় উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার মাপবার এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন যা দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধিও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

ওরেলদের বলেছিলেন, রাত ঠিক নটায় চিন্তা প্রক্ষেপণ শুরু করতে। যে চারার বৃদ্ধির হার ছিল ঘণ্টায়, ০,০০৬২৫ ইঞ্চি, রাত নটার পরই গ্রাফপেপারে দেখা গেল বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বগতি হয়েছে। পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে ৮৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সময়টুকুর মধ্যে এক ইঞ্চির ষোলভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা স্বাভাবিক অবস্থায়—কিন্তু চিন্তা প্রক্ষেপণের ফলে বেড়েছে আধ ইঞ্চিরও বেশী। নাটকীয় এই এক্সপেরিমেণ্টের প্রতিবেদনে মিলার লিখেছিলেন, বস্তুর ওপর মনের প্রভাব নির্ণয়ের উপায় এবার পাওয়া গেল তাঁর এই সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্রের দৌলতে।

রেডিওনিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানব-মন সক্রিয় হয় কি করে, সে রহস্য এখনও ব্যাখ্যাত হয়নি। 'অ্যাস্টাউণ্ডিং সায়েন্স ফিকশন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জন ক্যাম্বেল পরে 'অ্যানালগ সায়েন্স ফিকশন অ্যাণ্ড ফ্যাক্ট' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। ইনি বিস্ময়কর একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন এবং ১৯৫০ সালে হিরোনিমাসকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে কালো কালিতে আঁকা তাঁর যন্ত্র আসল যন্ত্রের মত কাজ দেয়। লিখেছিলেন, বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য সেখানে গুরুত্বহীন এবং বাদ দেওয়া যেতে পারে।

রেডিওনিক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেল হেলিকপ্টারের আবিষ্কারক আর্থার ইয়ং। এঁর কাজকর্ম অনুধাবন করার পর ফ্রান্সিস ফ্যারেলী নামে এক মহিলা ডাক্তার রুগীদের স্পর্শ না করে শুধু দূর থেকে হাত বাড়িয়ে বলে দিতে পারতেন দেহের কোথায় ব্যাধি আশ্রয় নিয়েছে। যন্ত্রের দরকার হত না—মাথাটাই যেন যন্ত্র হয়ে যেত। ফ্যারেলীর নিজের কলেজ ছিল—যে কলেজে মেডিক্যাল ল্যাবোরেটরী টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ফ্যারেলী রেডিওনিক পদ্ধতি, রক্তের দাগ, ফটোগ্রাফ ছাড়াও রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এরপর থেকে। ইংল্যাণ্ডে এই ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছিলেন হার্লেস্ট্রীট ডাক্তারদের সামনে।

১৯৭৩য়ের গ্রীষ্মে ফ্যারেলীর ক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেল প্রাহা-তে। বস্তুর ওপর মানসিক শক্তির প্রভাব সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছিল সেখানে। চারতলা বাড়ীতে এক ব্যক্তির মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। মিনিট কয়েকের মধ্যে ফ্যারেলী বলে দিয়েছিলেন ঠিক কোনখানে রয়েছে মানিব্যাগটা।

পরের দিন চেকোশ্লোভাক অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের এক প্রফেসর এক চিলতে খনিজ প্রস্তর নিয়ে এলেন ফ্যারেলীর সামনে। এক ঘর লোকের সামনে জিজ্ঞেস

করলেন, পাথরটার বয়স আর উৎস কী। বারোটা প্রশ্ন করেছিলেন ফ্যারেলী। সামনের টেবিলে হাত ঘষেছিলেন বারকয়েক। তারপর বলে দিয়েছিলেন, পাথরটা একটা উল্কাখণ্ডের ভাঙা টুকরো—যার বয়স ৩,২০০,৩০০ বছর। চেক খনিজ-বিদ্‌রা ঠিক এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন বহু গবেষণার পর।

ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ফ্যারেলী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে উদ্ভিদের অবস্থান বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। হিরোনিমাস এবং ডি লা ওয়ার দুজনেই দেখেছিলেন সব সজীব উদ্ভিদের C R P অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল রোটেশন্যাল পজিসন আছে—যে পজিসনে থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধির হার দেখা যায়। ইংলণ্ডে ফ্যারেলী খুব মামুলি একটা ডোউজিং পেণ্ডুলাম নিয়ে উদ্ভিদের অবস্থান নির্ণয় করেছিলেন এবং উদ্ভিদের চারপাশে গম্বুজের মত জ্যামিতিক প্যাটার্ণের মধ্যে শক্তির বিন্দুমুখের সন্ধান পেয়েছিলেন যা এক্স-রে ফিল্মকে এক্সপোজ করে দেয়।

এই শক্তির সঙ্গে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের নিশ্চয় একটা সম্পর্ক আছে—যেহেতু শক্তিই ডোউজিং প্রক্রিয়ায় ধরা যায়। একটি বেস্টসেলারের (সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস) যুগ্ম লেখক আশ্চর্য সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভার্জিনিয়ায়। উইলহেল্ম বোর নামক এক জার্মান ডোউজার-গুরু চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেছিলেন। চৌম্বক ক্ষেত্র সুইচ টিপে বন্ধ করে দিতেই হাতের রডের দুলুনি বন্ধ হয়ে গেছিল। এই এক্সপেরিমেণ্ট করিয়েছিলেন ডক্টর জাবোজ হারভেলিক।

একই রড নিয়ে উদ্ভিদ এবং মানুষের দেহ বিচ্ছুরিত জ্যোতির পরিমাপ করতে পারতেন বোর। বিরাট একটা গাছের সামনে থেকে পিছু হটে আসতেন, তারপর সামনে এগিয়ে যেতেন। প্রায় বিশ ফুট তফাতে এলেই রডটা নিচের দিকে টোকা মারত। ছোট গাছের ক্ষেত্রে আরো কাছে এগোতে হত নইলে রডে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না।

বোর বলেছিলেন, বৃক্ষ নির্গত এই এনার্জি সাময়িকভাবে মানবদেহের জ্যোতির্বলয়কে অথবা প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। ডক্টর হারভেলিকের ক্ষেত্রে দেখা গেছিল মিনিট দুয়েক কোনো বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে থাকার পরে বক্ষদেশ থেকে এই শক্তিধারা আঠারো থেকে বিশফুট পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়—আলিঙ্গন না করলে বিচ্ছুরিত হয় মাত্র নয় থেকে দশ ফুট পর্যন্ত। বোর-ই বলেছিলেন জার্মানীতে 'লৌহ চ্যান্সেলর' বিসমার্ক যখনি কাজের চাপ ক্লান্তি অনুভব করতেন তাঁর গৃহ চিকিৎসকের নির্দেশে যে কোনো বৃক্ষকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে থাকতেন আধঘণ্টার মত ক্লান্তি অপনোদনের জন্য।

হারভেলিক বলেছিলেন, বোর যে জ্যোতির্বলয়ের পরিমাপ করেছিলেন, সেই জ্যোতির্বলয় আর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেহ-নির্গত জ্যোতির্বলয় এক

জিনিস না-ও হতে পারে। কেন না, মানবদেহ নির্গত জ্যোতি উদ্ভিদদেহের জ্যোতির চাইতে বেশীদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দুজন বৃটিশ ডক্টর ওয়াল্টার কিলনার এবং অসকার বাগনাল এই ব্যাপারে যথেষ্ট কাজকর্ম করেন। ডক্টর হারভেলিক বলেছিলেন, ছড়িয়ে পড়া এই জ্যোতি যে আসলে কি জিনিস, তা আমরা জানি না। জিনিসটাকে আজ পর্যন্ত ফিজিক্সের ল্যাবোরেটরীতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

ফ্যারেলী ফিল্মের ওপর শক্তিবিন্দু ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই জ্যোতি আর বোর যে-জ্যোতির পরিমাপ করেছিলেন, সেই জ্যোতি এক জিনিস কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। দেখা গেছে যে-বস্তুর সঙ্গে শক্তিক্ষেত্র সম্পর্কিত সেই বস্তু টুকরো টুকরো করে ফেললে প্রতিটি টুকরোর সঙ্গে শক্তিক্ষেত্র সম্পর্ক বজায় রাখে দূর থেকেও। ডি লা ওয়ার তখন ভেবে দেখলেন, মূল বস্তু থেকে কেটে আনা টুকরোকে মূলবস্তুটা বিকিরণ মারফৎ জিইয়ে রাখতে পারে কিনা। শেকড় সমেত মূল উদ্ভিদটাকে পুড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মাতৃহীন সন্তানগুলো বাঁচল না। অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু বেঁচেছিল—যে ক্ষেত্রে জননী-উদ্ভিদকে না পুড়িয়ে রেখে দিয়েছিলেন।

ডি লা ওয়ারের এক্সপেরিমেণ্ট আরেকভাবে অনুষ্ঠিত করে অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্তে এসেছিলেন জে আই রোডেল। সন্তানদের জিইয়ে রাখার জন্যে জননীকে কাছাকাছি থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। পাশের শহরে, পাশের দেশে, সমুদ্রপারে, পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে থেকেও মা তার সন্তানদের রক্ষাকারী বিকিরণ দিয়ে সুরক্ষিত রাখতে পারে। রোডেল বলেছেন, এই পর্যবেক্ষণ উদ্ভিদ কেন, সমস্ত সজীব বস্তু—এমন কি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদ্ভিদ প্রেমিক মানুষরাও তাদের প্রিয় উদ্ভিদকে রক্ষা করে চলে এইভাবে—আপাতঃদৃষ্টিতে যা প্রেম, আসলে তা বিকিরণ শক্তি।

যিশুখৃষ্ট দাবী করেছিলেন, রোগ নিরাময়কারী ওঝার শক্তি নির্গত হয় হাত থেকে। মণ্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মনোবিজ্ঞানী ডক্টর বার্নাড গ্র্যাড বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট মারফৎ এই তত্ত্ব প্রমাণ তো করেইছিলেন, সেই সঙ্গে প্রমাণ করেছিলেন, হস্তনির্গত এই শক্তি উদ্ভিদকেও বাড়তে সাহায্য করে। এক্সপেরিমেণ্টে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন হাঙ্গারীর অবসরপ্রাপ্ত আর্মি কর্ণেল অসকার এস্তেবানি—যিনি ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত অধিকারের বিরুদ্ধে হাঙ্গারীর বিদ্রোহের সময়ে প্রথম সচেতন হন নিজের রোগ নিরাময়কারী ক্ষমতা সম্পর্কে। গ্র্যাড তাঁর গবেষণা বৃত্তান্ত একটি অতীন্দ্রিয় গবেষণা সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

শুধু উদ্ভিদ নয়, ইঁদুরের গেঁটেবাতের বাড় বন্ধ করেছিলেন এস্তেবানি—

আরোগ্যও করেছিলেন। ইঁদুরের ক্ষত দ্রুততর হারে নিরাময় করেছিলেন এই এস্তেবানি—স্বাভাবিক পন্থায় যা সময় নিয়েছিল অনেক বেশী।

কেমিক্যালমিশ্রিত যে-জল উদ্ভিদে দেওয়া হবে, সেই সলিউশনের ছিপি আঁটা বোতল তিরিশ মিনিট হাতে নিয়ে বসেছিলেন এস্তেবানি। তারপর সেই শক্তিমিশ্রিত জল উদ্ভিদে সিঞ্চন করা হয়েছিল। বিচিত্র শক্তিপুষ্ট উদ্ভিদ বৃদ্ধি পেয়েছিল অনেক তাড়াতাড়ি শক্তিবঞ্চিত উদ্ভিদের চেয়ে।

এরপর আর একটা অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট করেন গ্র্যাড। একজন সুস্থ মানুষ, আর দুজন মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ল্যাবোরেটরীতে ডেকে আনেন। শেষোক্ত দুজনের একজন নিউরোটিক, অপরজন সাইকোটিক। তিনজনেরই হাতে দিলেন ছিপি আঁটা লবণ জলের তিনটে বোতল তিরিশ মিনিটের জন্য। তারপর সেই জলে তিনটে আলাদা উদ্ভিদের সেবা করেন—চতুর্থ উদ্ভিদটিকে দেন নিছক লবণ-জল। সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় সেই উদ্ভিদটি যে সুস্থব্যক্তির হাতে ধরা জল পেয়েছিল। সবচেয়ে কম বাড়ে সেই উদ্ভিদটি যে সাইকোটিক ব্যক্তির হাতে ধরা জল পেয়েছিল। কিন্তু নিছক লবণ-জল মিশোনো জলপ্রাপ্ত উদ্ভিদটির চেয়ে সামান্য বেশী বৃদ্ধি পায় নিউরোটিক ব্যক্তির হাতে ধরা জলপ্রাপ্ত উদ্ভিদটি।

গ্র্যাড লক্ষ্য করেছিলেন, ছিপি আঁটা বোতল হাতে নিয়ে সাইকোটিক বিষণ্ণ ব্যক্তিটি কোনো প্রশ্ন করেননি। কিন্তু নিউরোটিক খিটখিটে ভদ্রমহিলাটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন কারণটা। কারণ জানতে পেরে বোতলটাকে তিনি কোলে নিয়ে সন্তানস্নেহে আদর করেছিলেন। গ্র্যাড এই থেকেই সিদ্ধান্তে আসেন যে বোতল ধরার সময়ে মেজাজের ওপর নির্ভর করছে এক্সপেরিমেন্টের সাফল্য। সেই সময়ে যদি উদ্বেগ, বিষাদ বা বৈরীভাব মনে থাকে, উদ্ভিদের কোষবৃদ্ধিতে তা প্রতিকূল অবস্থায় সৃষ্টি করতে পারে। বিষয়টা আমেরিকান সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে তিনি রিপোর্ট করেছিলেন।

মেজাজ যদি লবণ জলকে এইভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে রাঁধুনি গিন্নীদের মেজাজ রান্না করা খাবারকে প্রভাবিত করবে না কেন? প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন গ্র্যাড। দেখলেন, অনেক দেশে চীজ তৈরীর জায়গায় ঋতুমতী মেয়েদের যেতে দেওয়া হয় না। কাটা ফুল শুকিয়ে যায় নাকি এই সব মেয়েদের হাতে, ডিম শক্ত হয়ে যায়। গ্র্যাড এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন, ঋতুমতী হওয়ার জন্যে নয়, বিষণ্ণ হওয়ার ফলেই এই কান্ড ঘটে। এই আবিষ্কারের ফলে 'অপরিচ্ছন্ন' মেয়েদের সম্বন্ধে বাইবেলের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কুসংস্কার বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের দেশেও এই কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কাসুন্দী তৈরীর সময়ে অথবা হেঁসেলে ঋতুমতী মেয়েদের কেন ঢুকতে দেওয়া হয় না, খাদ্য রসিকরা এবার নিশ্চয় তা উপলব্ধি করবেন।

রেডিওনিক সম্পর্কিত পুরো বিষয়টা এবং এ ব্যাপারে মানব-মনের ভূমিকা আজও রয়েছে পদার্থবিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যার মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলে—কোনো এখ্‌তিয়ারেই যা পড়ে না।

হিরোনিমাস নিজেই বলেছেন, শক্তিমান অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা, যেমন, ফ্যারেলি, রেডিওনিক পদ্ধতি ব্যতিরেকেই ফল প্রদর্শন করতে পারেন। আবার ডি লা ওয়ারের মত অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের রেডিওনিক যন্ত্রপাতি সাহায্য করে। তাহলে কি করে বলব যে এই শক্তি আর তার রাজত্ব পুরোপুরি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবানদের দখলেই রয়েছে?

প্রফেসর উইলিয়াম টিলার ছিলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তু-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান। ইংলণ্ডে ডি লা ওয়ার গবেষণা মন্দিরে এক বছর রেডিওনিক চর্চা করেছিলেন ইনি। একটি প্রবন্ধে এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ

রেডিওনিক বিষয়টার মূল ধারণা সম্পর্কে বলা যেতে পারে প্রত্যেক প্রাণী, ব্যক্তি এবং বস্তু বিশেষ এক তরঙ্গক্ষেত্র মারফৎ শক্তি বিকিরণ করছে এবং শোষণ করছে। জীব অথবা অজীব—সব বস্তুকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়ছে এই শক্তিক্ষেত্র। তুলনা করা যেতে পারে যে কোনো বস্তুর পরমাণুর সঙ্গে—যা থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছে তরঙ্গাকারে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তিধারা। বস্তু যত জটিল হবে, তার তরঙ্গ প্যাটার্নও তত জটিল হবে। মানুষের মত সজীব বস্তুরা অত্যন্ত জটিল তরঙ্গ বর্ণালীর নির্গমন ঘটায় যার অংশ বিশেষ বিভিন্ন দেহযন্ত্র এবং দেহতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে।

টিলারের বিশ্বাস আমাদের দেহে লক্ষকোটি কোষ নতুন করে তৈরী হচ্ছে প্রতি দিন। রেডিওনিক প্রক্রিয়ার আওতায় যদি এদের আনা যায় তাহলে তারা স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির দিকে ঝুঁকবে, অসুস্থ বা অস্বাভাবিক গঠনের মূল ক্ষেত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। নিয়মিত চিকিৎসা করলে দেহযন্ত্রের সুস্থতা ফিরে আসবে শেষ পর্যন্ত এবং রোগের নিরাময় ঘটবে।

ডক্টর অ্যানড্রিজা পুহারিক নিউরোলজিস্ট এবং মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞ হয়েও বিজ্ঞানীদের কাছে আমল পান নি মনের শক্তিতে তাঁর বিশ্বাসের জন্যে। 'বিয়ণ্ড টেলিপ্যাথি' বইখানা লিখে কুড়িয়েছিলেন 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' অপবাদ। অসাধারণ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন উরি গেলার যে বুজরুক নন, পুহারিক তা বিশ্বাস করায় ক্ষেপে গিয়েছিল বিজ্ঞানীমহল। উরি গেলার মনের শক্তি দিয়ে চামচ ইত্যাদি বেঁকিয়ে দিতে পারতেন। কীন বেস্ট গেলার সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়েছিলেন—যে মানুষ বিজ্ঞানকে বেঁকিয়ে দিতে পারে। পুহারিক বলেছিলেন কীন বেস্টকে ঃ

পরমাণুদের আলাদা করে রাখার একটা মডেল ব্যাখ্যা হাজির করার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পরমাণু ধ্বংসের ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি, কিন্তু পরমাণুদের ঠেসেঠুসে ক্ষুদ্রতম অবস্থায় এনে অদৃশ্য করে দেওয়া অথবা তাদের আলাদা করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দেওয়া এবং দরকার মত ফের সম্মিলিত করার কোনো তত্ত্ব কি আজও আছে বিশ্বে ?

গেলার কেবলমাত্র অজীব বস্তুর ওপরেই মনের শক্তি দেখাননি। সজীব জগতেও তাঁর মানসিক প্রভাবের নিদর্শন রেখে গেছেন। বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদের সামনে গোলাপের কুঁড়ির ওপর হাত মেলে ধরেছিলেন পনেরো সেকেন্ড। হাত সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা গিয়েছিল কুঁড়ি ফুটে উঠেছে, ফুল দেখা দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কনি বেস্ট মন্তব্য করেছিলেন—পদার্থবিজ্ঞান অনমনীয়, দৃঢ়। বিজ্ঞানের ছিদ্র দিয়ে গোলাপ বার করে নিচ্ছেন উরি গেলার। বিজ্ঞানকে বেঁকিয়ে দিচ্ছেন উরি গেলার যাতে মানব মনের তথাকথিত 'প্যারানরম্যাল' শক্তির স্বীকৃতিলাভ ঘটে।

প্রতিভাধর আমেরিকান আবিষ্কারক নিকোলা তেসলা বলেছিলেন, মারা যাওয়ার আগে—বিজ্ঞান যেদিন থেকে অ-পদার্থ ঘটিত কান্ড কারখানা নিয়ে চর্চা করবে, সেইদিন থেকে যে প্রগতি ঘটবে তা বিগত বহু শতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞান-অস্তিত্বেও ঘটে নি।

সে সময় বোধ হয় এবার এসেছে।

ফাইণ্ডহর্ন এবং স্বর্গোদ্যান

মানবমনের প্রভাবে যে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়, এ সম্পর্কে সর্বাধুনিক এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে উত্তর স্কটল্যান্ডের নিরালা এক প্রান্তে—বালুকাময় অনুর্বর এই অঞ্চলের নাম ফাইন্ডহর্ন।

পিটার ক্যাডি একসময়ে দুহাজার মাইল হেঁটেছেন হিমালয়ে, কাশ্মীর থেকে তিব্বতে গেছিলেন। সত্যদ্রষ্টাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই সংকল্প করেছিলেন বিস্ময় এবং সৌন্দর্য নিয়ে আসবেন এই পৃথিবীতে। এঁর স্ত্রী আইলীন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্না মহিলা। ডরোথি ম্যাকলীনও তাই। এই দুজনকে নিয়ে তিনি ফাইন্ডহর্ন নামক ভাঙা টিনের কৌটো, জঞ্জাল, ভাঙা বোতল আর ঝোপভর্তি অঞ্চলে এলেন ১৯৬২ সালের তুষারছাওয়া নভেম্বরে।

ক্যাডি একসময়ে রয়াল এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রন লীডার ছিলেন। ফাইন্ডহর্নে এলেন হোটেল ব্যবসা করবেন বলে। এলেন কিন্তু এক রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির তাড়নায়। সঙ্গে এল তিন ছেলে।

দীক্ষা গুরুর শেখানো একটা নীতিবাক্যই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন

ক্যাডি, এই পণ নিয়ে তিনি এলেন আবর্জনাপূর্ণ কংকরাকীর্ণ এই অঞ্চলে। জীবনের মূল নিয়ম হওয়া উচিত—'যেখানে থাকবে, ভালোবাসো সেই জায়গাটাকে ; যার সঙ্গে থাকবে, ভালোবাসো তাকে ; যে কাজ করবে, ভালোবাসো সেই কাজকে।'

ক্যাডির স্ত্রী ১৯৫৩ সালে তিনি একটা আধ্যাত্মিকবার্তা অনুভব করেছিলেন নিজের কপালে—এলিক্সার। মানে, ধাতুকে সোনায় পরিণত করার দ্রব্য বা আয়ু বাড়ানোর ওষুধ। তারপর থেকেই আইলিন নিজের নাম রাখেন এলিক্সার।

বিজন উষর অঞ্চলটিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্য নিলেন এলিক্সার। রোজ মাঝরাতে উঠে কয়েক ঘণ্টা ধরে ধ্যান করতেন। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন সিডারউড কাঠের সাতটা বাংলোবাড়ী গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাড়ী ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশ ঘিরে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর একটা বাগান। ধ্যানে দেখা এই দৃশ্য এ হেন বিজন নোংরা অঞ্চলে সম্ভব হবে কি করে তা কিন্তু একটা রহস্যই হয়ে রইল। কেন না, পুরো অঞ্চলটাই তো বালি আর কাঁকরে ছাওয়া যেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ শক্ত ঘাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।

ক্যাডি কিন্তু দিনরাত খাটলেন। ওঁর বিশ্বাস ছিল, বিশুদ্ধ বাতাস রৌদ্রালোক, সমুদ্র স্নান এবং প্রচুর পরিমাণ ঠাণ্ডায় খাঁটি জল শরীরকে নির্মল করে তুলবে, মহাজাগতিক শক্তিসমূহ আকর্ষণ করবে—শক্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজন কমবে। শক্তি বাড়লেই তা সম্ভব হবে।

যথা সময়ে দেখা গেল সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য। বিবিধ সব্জীতে ছেয়ে গেছে ক্যাডির ক্ষেত—যা এ অঞ্চলে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে সব্জী এখানে বাঁচে নি—তাও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ক্যাডির ক্ষেতে।

এ অসম্ভব সম্ভব হল কি করে? এলিক্সার কিন্তু যা করতেন, ভালবাসা দিয়ে করতেন। সব্জী তোলা থেকে আরম্ভ করে, মাটিতে সার দেওয়া এমন কি রান্না করা পর্যন্ত—ভালবাসা মিশিয়ে দিয়ে করতেন। আবর্জনা ফেলতেন না, সবই সারে পরিণত হত. সজীব কম্পন-তরঙ্গ বৃদ্ধি পেত।

১৯৬৪ সালের মে মাসে ৬৫ রকম সব্জী, ২১ রকম ফল এবং ৪০ রকম লতাপাতায় ভরে উঠল ক্যাডির বাগান। জুন মাসে আঞ্চলিক উদ্যান-উপদেষ্টা এলেন মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে। এসেই প্রথম উপদেশ দিলেন, মাটিতে রাসায়নিক সার দেওয়া দরকার। সাফ জবাব দিলেন ক্যাডি—তাঁর বিশ্বাস নেই রাসায়নিক সারে। কমপোস্ট আর কাঠের ছাই যথেষ্ট। মাটি বিশ্লেষণ করার পর উপদেষ্টা মশাইয়ের চোখ কপালে উঠে গেছিল। মাটিতে কোনো উপাদানেরই অভাব নেই—দুষ্প্রাপ্য মৌল পর্যন্ত যা যা দরকার, সব আছে। এক রাসায়নিক সার বিশেষ-

জ্ঞের সঙ্গে ক্যাডিকে বেতার আলোচনায় টেনে এনেছিলেন তিনি। ক্যাডি বুঝেছিলেন রহস্যজনক এই সাফল্যের পেছনে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সক্রিয়, সে তত্ত্ব ভাঙবার সময় এখনো হয়নি। তাই সে প্রসঙ্গ একেবারে চেপে গিয়েছিলেন। ফাইণ্ডহর্ন এক্সপেরিমেণ্টের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তির একটা উদ্দেশ্য আছে. তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন। সব প্রাণই যে এক, এই সত্য উপলব্ধির বৃহত্তর এক্সপেরিমেণ্টের গোড়াপত্তন বলা যায় ফাইণ্ডহর্ন এক্সপেরিমেণ্টকে।

ডরোথি ম্যাকলিনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। নাম নিয়েছিলেন ডিভাইনা। ক্যাডির বাগানে কিছুদিন ধরেই সুগন্ধি উদ্ভিদের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, এই সব উদ্ভিদদের নিজস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য নরদেহের বিভিন্ন অংশের ওপর যেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেমনি মানব মনকেও প্রভাবিত করতে পারে। কেউ নিরাময় করে ক্ষত, কেউ দৃষ্টিশক্তি, কেউ ভাবাবেগ। ডিভাইনা আরও দেখলেন নিজের ভাইব্রেশন বৃদ্ধি করে উদ্ভিদ-জীবনের আধ্যাত্মিক সত্তার নতুন দ্বার তিনি উন্মোচন করতে পারেন। স্পষ্ট বুঝলেন, মানুষের চিন্তা আর ভাবাবেগের প্রতি উদ্ভিদরা বেশী সংবেদনশীল এবং তাদের এনার্জির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। বিষাক্ত, বিষণ্ণ এবং বদমেজাজের প্রতিক্রিয়া আছে উদ্ভিদের ওপর—আবার সুখী কম্পন-তরঙ্গও চাঙা করে তুলতে পারে তাদের। শুধু তাই নয়। বদ্ প্রতিক্রিয়া মানুষের কাছে ফিরেও আসতে পারে। অসুস্থ কম্পন-তরঙ্গে সংক্রামিত উদ্ভিদ আহার করলে তা টের পাওয়া যায়। তাই সুস্থ কম্পন-তরঙ্গ দিয়ে মানুষ যেমন আখেরে উপকৃত হতে পারে, অসুস্থ কম্পন-তরঙ্গের পরিণামে শেষে নিজেই ভুগতে পারে। বাগানে তাই নিছক জল আর সার দেওয়ার চাইতেও সবচেয়ে বড় অবদান হওয়া উচিত শক্তি, ভালবাসা আর আনন্দের বিকিরণ। এ ছাড়াও কিন্তু আছে অন্যান্য বিকিরণ যা আসছে স্বয়ং পৃথিবী এবং মহাশূন্য থেকে। এই বিকিরণই রয়েছে উর্বরতার মূলে এবং এরা না থাকলে উদ্ভিদরা হবে বন্ধ্যা।

১৯৬৭ সালের বসন্তে এলিক্সারের স্বপ্নদর্শন সত্য হতে চলল। বাগান আরো বড় করা হল। পরের পর বাংলো ঘিরে ঝলমল করতে লাগল অভূতপূর্ব পুষ্পকানন। ঠিক এই দৃশ্যই ধ্যানের চোখে দেখেছিলেন এলিক্সার।

১৯৬৮ সালে বাগান পরিদর্শনে এলেন স্যার জর্জ ট্রেভেলিয়ান—মৃত্তিকা সমিতির সদস্য। বাগান দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন তিনি। ফুল, গাছ, সব্জী —সবই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আকারেও বড়। নিছক কমপোস্ট আর খড়ের দৌলতে কখনোই এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে পারে না বালি আর কাঁকরের মধ্যে—অজ্ঞাত কোনো কারণ (ফ্যাক্টর এক্স) নিশ্চয় আছে। সমিতির সম্পাদককে লিখে জানলেন, এত স্বল্প সময়ে ফাইণ্ডহর্নে যদি এতখানি সাফল্য সম্ভব হয়, তাহলে

তো সাহারাকেও ফলে ফুলে ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব।

অবশেষে ক্যাডি রহস্য ভাংলেন স্যার জর্জের কাছে। বললেন, ডরোথি বিদেহী গুরুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই অসাধ্যসাধন করেছে। বিদেহী শুভ শক্তিরা সদাসর্বদাই উদ্ভিদদের সেবাশুশ্রূষা করে চলেছে। বিশ্বের বহু অতীন্দ্রিয়বাদী এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। স্যার জর্জ নিজেও গুপ্ত রহস্যের চর্চা করতেন এবং নিরুদ্ধ বায়ুবিজ্ঞানের (হার্মেটিক সায়েন্স) ওপর আস্থা রাখতেন। রুডলফ্ স্টাইনার যে তাঁর বায়োডায়নামিক পদ্ধতি এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাও জানতেন। তাই ক্যাডির গুপ্তকথা শুনে হাস্য করলেন না—বরং তত্ত্বটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। বললেন, উদ্ভিদ-জীবনের গুপ্ত রহস্য বুঝতে হলে এ বিষয়ে তদন্ত দরকার।

ক্যাডি এরপর অনেকগুলি ইস্তাহার প্রকাশ করে জানালেন, তাঁর বাগানের প্রতিটি ফুল, সব্জী, ফলের সমৃদ্ধির জন্যে কৃতিত্ব প্রাপ্য বিদেহী শুভশক্তিদের।

খুব শীগগিরই সাধুসন্তদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল ফাইন্ডহর্ন। নবযুগ নিয়ে বাণী প্রচার শুরু হল। একটা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হল। পৃথিবীর নানান মহাদেশ থেকে প্রতি বছর দর্শনার্থী আসতে লাগল দেবালোকে সমৃদ্ধ এই ভূস্বর্গ দেখতে।

পদার্থবিজ্ঞানের বস্তু-স্থূল চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না। অতীন্দ্রিয়বাদীরা তা প্রত্যক্ষ করেন তাঁদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বর্ণালীর ওপারে অন্য জগৎ, অন্য কম্পন-তরঙ্গের এই হদিশ রাখেন কেবল তাঁরাই। তাঁরাই দেখেন আকাশিক এবং ইথিরীয় দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ জগতের বিপুল জীবন ধারা এবং মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, পৃথিবী এবং মহাশূন্যের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা। পারসেলসাস যা বলেছিলেন, তা সত্যি। বীজ এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে চন্দ্রের, গ্রহদের, সূর্যের এবং আকাশের অন্যান্য নক্ষত্রদের অবস্থানের ওপর।

উদ্ভিদ এবং মানবদেহের শক্তি সম্পর্কে থিয়সফিস্ট ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির কথাগুলিও প্রণিধান যোগ্য। প্রত্যেকটা কোষের সঙ্গে পুরো মহাবিশ্ব যে সম্পর্কিত, এখন সে বিষয়ে নতুন আলোকপাত ঘটছে।

উদ্ভিদের গুপ্ত জীবন সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান হতচকিত। সত্যদ্রষ্টরা কিন্তু নন। তাঁরা দেখেছেন এক জগতের মধ্যে আরেক জগৎ—অতি সংবেদনশীল জগৎ। প্রাণের অভিন্নতা সম্পর্কে দার্শনিক প্রতীতি তাঁরাই উপস্থাপিত করেছেন। উদ্ভিদ এবং মানবের অতি-সংবেদনশীল এই জগৎ সম্বন্ধে আরো কিছু লেখার ইচ্ছে রইল পরবর্তী গ্রন্থে—যার নাম হওয়া উচিত—উদ্ভিদের মহা জাগতিক জীবন। □